পানপাতিয়ার ডায়ার্নাল

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

পানপাতিয়ার ডায়ার্নাল

পানপাতিয়ার ডায়ার্নাল

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

অভিযান পাবলিশার্স

Panpatiar Diurnal
A Travelogue
by Soumeetra Chattopadhyay

প্রকাশ : জানুয়ারি ২০১৬

অভিযান পাবলিশার্সের পক্ষে গোপা ঘোষ কর্তৃক বনমালিপুর বারাসাত কলকাতা-১২৪
থেকে প্রকাশিত ও প্রিয়া প্রিন্টার্স, উলটোডাঙা থেকে মুদ্রিত।
দূরভাষ : ০৩৩-২২৫৭ ৩১৮৭, +৯১৮০১৭০৯০৬৫৫
E-mail : abhijan_publishers@rediffmail.com

অক্ষর বিন্যাস : সুভাষ ঘোষ, রূপালি কম্পিউটার
প্রুফ সংশোধন : তাপসকুমার রায়, প্রবীর চক্রবর্তী
ল্যামিনেশন : ইউনাইটেড ইলেকট্রনিক্স
বই বাঁধাই : প্রিয়া বাইন্ডার্স

অভিযান পাবলিশার্সের বিক্রয়কেন্দ্র
৬৪/১ কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩
১০৫/১৩বি দমদম রোড, শীল কলোনি, কলকাতা-৭৪
Online available on : www.dokandar.in

ISBN: 978-93-80197-79-1

আলোকচিত্রী : লেখক ও সুমন কুণ্ডু
কার্টুনিস্ট : অভীক রায়
প্রচ্ছদ : পার্থপ্রতিম দাস

২০০ টাকা

ওই হিমালয়ের মতো
মানুষটাকে

আমার কথা ৯
গর্ভসঞ্চার ১৮
যাত্রা ২৬
প্রথম দিন ৩৮
দ্বিতীয় দিন ৫১
তৃতীয় দিন ৬৪
চতুর্থ দিন ৭৭
পঞ্চম দিন ৮৮
ষষ্ঠ দিন ৯৯
সপ্তম দিন ১১৭
অষ্টম দিন ১৩৭
নবম দিন ১৫৮
দশম দিন ১৭৮
ফেরা ১৯৭
Route Map ২০৬
Route Chart ২০৭

আমার কথা ৯
গর্ভসঞ্চার ১৮
যাত্রা ২৬
প্রথম দিন ৩৮
দ্বিতীয় দিন ৫১
তৃতীয় দিন ৬৪
চতুর্থ দিন ৭৭
পঞ্চম দিন ৮৮
ষষ্ঠ দিন ৯৯
সপ্তম দিন ১১৭
অষ্টম দিন ১৩৭
নবম দিন ১৫৮
দশম দিন ১৭৮
ফেরা ১৯৭
Route Map ২০৬
Route Chart ২০৭

আমার কথা

কয়েক বছর আগের কথা। কঠিন দুরারোগ্য লিউকেমিয়ায় আক্রান্ত নিউজার্সির বাসিন্দা পয়ষট্টি বছরের উইলিয়াম লুডউইগ যখন দেখলেন কেমোথেরাপিতেও কিছু হচ্ছে না, তখন একপ্রকার নিরূপায় হয়েই নিজেকে সঁপে দিলেন পেনসিলভিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. কার্ল জুনের তত্ত্বাবধানে একটি বিশেষ গবেষণায়। জুন ও তার তিন সঙ্গী জিন থেরাপির সাহায্যে লুডউইগের শরীর থেকে প্রায় এক বিলিয়ন টি-কোশ (ভাইরাস ও টিউমারের সঙ্গে লড়াই করতে সক্ষম এক ধরনের যোদ্ধা শ্বেতকণিকা) বের করে অপসারিত কোশে ক্যান্সারের সঙ্গে লড়াই করার জন্য নতুন জিন ঢুকিয়ে পুনরায় সেই পরিবর্তিত কোশগুলো লুডউইগের শরীরে ফিরিয়ে দিলেন। এতে প্রথম দিকে কিছু না হলেও দিন দশেক বাদে প্রবল কাঁপুনিতে ওঁর শরীরের তাপমাত্রা খুব বেড়ে যায়, ব্লাড প্রেসার-ও ফল্ করে অনেকটা। কিন্তু হপ্তাখানেক পরে ধীরে ধীরে শরীর থেকে জ্বর উধাও হয়, সেই সঙ্গে পালায় লিউকেমিয়াও। ডাক্তার-রা হিসেব করে দেখেন প্রায় দুই পাউন্ড ক্যান্সার সেল বধ হয়েছে ওঁর শরীরে। এই গবেষণায় উইলিয়ামসাহেব দিব্যি সুস্থ হয়ে ওঠেন। লিউকেমিয়াকে অবশ্যই পুরোপুরি কাবু করা যায়নি, তবে জুন ও তাঁর সহকর্মীদের এই প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে ক্যান্সার নিরাময়ে এক নতুন স্বপ্নের জন্ম দেয়। একই সঙ্গে বৃহত্তর ভাবে দেয়, একটা সম্পূর্ণ পচে যাওয়া সিস্টেমে টাটকা অক্সিজেন সঞ্চারের এক অমোঘ ফর্মুলার খোঁজ।

এভাবেই হয়তো একদিন এইডস, কারসিনোমা, অ্যালজ্হাইমার-এর মতো দুরারোগ্য ব্যধির নির্বীজকরণ সম্ভব হবে। কিন্তু ঠিক বলতে পারব না, কত মুঠো ব্লিচিং বা কত বালতি ফিনাইল ছড়ালে একটা দেশ বিশুদ্ধ হবে! কিংবা কত বোতল ডেটল স্প্রে করলে একটা ক্ষয়ে যাওয়া সেপ্টিক সিস্টেম ক্রাচে ভর দিয়ে দাঁড়াবে।

পাহাড় নিয়ে লিখতে বসে চিকিৎসাবিজ্ঞান বা সমাজবিজ্ঞান নিয়ে বোর করার ইচ্ছে আমার নেই। কিন্তু হাস্যকর গণতান্ত্রিক পরিকাঠামো কিংবা ভার্চুয়াল জগতের আপাত মেলামেশার সমান্তরালে জাত-ধর্ম-শিক্ষা কিংবা রাজনীতির নামে দেশের ও দশের, মনের ও মননের, দিনের পর দিন জিগস পাজলের মতো ভেঙে তছনছ হওয়ার লাগাতার হিড়িকে আমাদের সাধের 'পাহাড়'-ও যে আক্রান্ত। এ যেন ওই লিউকেমিয়া আক্রান্তের এক একটা উপসর্গের মতোই, একটা গোটা সিস্টেমের অবক্ষয় বা পচনের বিবিধ বহিঃপ্রকাশ এর একটা প্রকাশ।

সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে টেকনোলজির উন্নতি অঙ্গাঙ্গীকভাবে জড়িত, কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু সভ্যতার অগ্রগতির দোহাই দিয়ে মাউন্ট এভারেস্টের তলা দিয়ে টানেল করে রাস্তা তৈরি করছি, কিংবা মানেভঞ্জন থেকে সান্দাকফু অবধি রাস্তাটা সুবিধাভোগীদের জন্য পিচ্ চকচকে করার কথা ভাবছি, অথবা প্রত্যন্ত পাহাড়ি গ্রামগুলোকে মূল জনস্রোতে সামিল করার হার্দিক (?) তাগিদে হিমালয়ের যুগান্তব্যপী গ্রানাইট-এ ডিনামাইটে বিষাক্ত কামড় বসাচ্ছি। যুগ যুগ ধরে নিজের নিয়মে পরিবর্তনশীল এক 'ইকো-সিস্টেম'-কে আর্থিক দিক থেকে সুবিধাভোগী কিছু মানুষ গায়ের জোরে এভাবেই 'সভ্যতা'-র অলিন্দে নিয়ে আসতে চাইছে। আর তাদের এই উলঙ্গ বাণিজ্যিক মনোবৃত্তিকে স্বাগত জানাচ্ছেন বেশ কিছু মানুষ, যাঁরা পাহাড়ের অন্দরমহলে প্রকৃতির 'কস্তুরী'-র ঘ্রাণ নিতে চান অথচ শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম-এর ঘাম ঝরাতে নিতান্তই অনিচ্ছুক।

প্রাণীকুলে নিম্ন কর্ডাটা (ইউরো কর্ডাটা) গোত্রে হার্ডম্যানিয়া বলে এক বিশেষ প্রজাতির প্রাণী রয়েছে। শৈশবে (লার্ভা) এদের শরীরে উন্নত শ্রেণির কর্ডাটা-র মতো নোটোকর্ড, পৃষ্ঠদেশীয় ফাঁপা স্নায়ুসূত্র, ফুলকাধার ইত্যাদি নানান পরিণত চারিত্রিক বিশেষত্ব লক্ষ করা যায়। কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে পরিণত বৈশিষ্ট্যগুলো একে একে লোপ পায়। বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় হার্ডম্যানিয়ার এই

অধোগামী বিবর্তনকে 'রেট্রোগ্রেসিভ মেটামরফোসিস' বলে।

গঙ্গোত্রী হিমবাহের অনেকদূর পেছিয়ে যাওয়া, কেদারতালের পথে ভুজ গাছের ক্রমশ অবলুপ্তি, ব্রহ্মকমলের অপর্যাপ্ততা, আগামী কয়েক দশকের মধ্যে সত্তর থেকে নব্বই ভাগ গ্লেসিয়ারের অবলুপ্তির গবেষণালব্ধ ভবিষ্যৎবাণী, এরকম প্রচুর উদাহরণ কি প্রাকৃতিক 'রেট্রোগ্রেসিভ মেটামরফোসিস'-এর উদাহরণ নয়?

সন্ধিযুগের নাগরিক আর্কিওপটেরিক্স-এর খোলস ছিঁড়ে বেরিয়ে এলে উপলব্ধি করি, পাখি নয়, আমাদের বিবর্তন বুঝি সরীসৃপমুখী।

তাই পিক্ সামিট করার মোহে, ট্রেকিং বন্ধুর পথে নিজেকে 'জারা হঠকে' দেখানোর লোভে, নির্দ্বিধায় গ্যালন গ্যালন বিষ ঢেলে আসছে কিছু 'সাক্ষর-অশিক্ষিত' বিষবৃক্ষ।

বিগত সময়ে এবং সাম্প্রতিককালে গুচ্ছ গুচ্ছ প্রাকৃতিক বিপর্যয়েও কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙেনি। উলটে বিপর্যয় ঘটে যাবার পর ফেসবুক বা টুইটারে 'কুম্ভীরাশ্রু' দেখানোর ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতা আরও স্পষ্ট করেছে তাদের বোধ-এর অশ্লীলতা, জ্ঞান-এর অজ্ঞানতা।

এভাবেই প্রকৃতির গোপন লালিত নিষ্কলুষ স্বর্গে 'সভ্যতা' এগোচ্ছে 'সেপটিসেমিয়া'-র মতো।

আমি জানি ছাপার অক্ষরে, এহেন 'আধুনিকতা'-র বিরুদ্ধে আমার সপাট প্রতিবাদ অনেকের কাছেই উপেক্ষিত হবে। তাতে আমার বিন্দুমাত্র খেদ নেই। কারণ —

"কর্ণের হত্যায় রুচি সে আমার নয়
মানুষকে তো উপেক্ষারও যোগ্য হতে হয়।"

জন লেনন বলেছিলেন, "যা প্রেম এবং শান্তির কথা বলে, তার আবেদন চিরকালীন।" তাই মা-এর মতো 'চিরকালীন', পাহাড় নামক গ্রানাইটের ফ্লোরা, ফনা, তুষার, নির্ঝরিণী, ক্রিভাস আর খেয়ালি হাওয়ার আদিম লাবণ্য প্রতিদিন নিশ্চুপে ধর্ষিত হতে দেখলে আমার কষ্ট হয়।

ভলতেয়ার রচিত 'কাঁদিদ'-এ, লিসবোঁয়া গমনকালে জাহাজে এনব্যাপটিস্ট ঝাক, কাঁদিদ-কে বলেছিলেন, "মানুষ কখনও নেকড়ে হয়ে জন্মায়নি, কিন্তু নেকড়ে হয়ে গিয়েছে। আর সেই কারণেই প্রকৃতিকে বিকৃত করছে। ঈশ্বর তাদের কামানও দেননি, যোদ্ধাও দেননি, মানুষ নিজেই নিজের ধ্বংসের স্বার্থে

যোদ্ধা ও কামান বানিয়েছে।" কাঁদিদের শিক্ষাগুরু সহযাত্রী প্রাজ্ঞ প্লাঁগস তখন খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা মন্তব্য করেছিলেন, "এ সব কিছুই অপরিহার্য ছিল।"

এই 'অপরিহার্যতা'-ই কি সভ্যতার নিয়তি? এই 'অপরিহার্যতা'-ই কি এসট্যাবলিস্ করে ডারউইনের "STRUGGLE FOR EXISTENCE"?

উত্তর সময় এবং আগামী-র হাতে।

তখন ক্লাস ফোর কী ফাইভ। চোখে মুখে একগাদা বিস্ময় নিয়ে দার্জিলিং-এ আমার প্রথম পাহাড় দেখা — কাঞ্চনজঙ্ঘা। যদিও প্রথম দিন দেখা মেলেনি। এক লোকাল ঘোড়াওয়ালা আমার গাল টিপে আদর করে এক বিশাল ধোঁয়া ধোঁয়া মেঘে ঢাকা অঞ্চলের দিকে তর্জনী নির্দেশ করে বলেছিল, "আভি ও শোনে গ্যায়া, কাল শুভ্‌হা দিখাই দেগা"। 'শুভ্‌হা' দেখা মিলেছিল। এবং নিঃসংশয়াতীত ভাবে এসেছিল প্রেম-ও। তবে 'কে প্রথম কাছে এসেছি, কে প্রথম ভালোবেসেছি'-র মতো তর্কবিতর্ক এখানে ছিল না। পাহাড় অনেক দুরেই ছিল, কাছে নয় আর আমি তাকে প্রেম নিবেদন করলেও সে আমাকে অ্যাকসেপ্ট করেছিল কিনা জানার সুযোগ হয়নি।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ের ব্যাপারে 'অপার্থিব' প্রেম-টা চলে গিয়ে আমার অবস্থা হয়েছে ওই মাতালটার মতোই। একবার এক পাঁড় মাতাল বলে ফেলেছে সে নাকি জীবনে একবার মাত্র মদ খেয়েছে। সেই শুনে সবাই তো আকাশ থেকে পড়েছে। সকাল থেকে সন্ধে অবধি যে লোকটা 'ট্যানিস' এর ওপর থাকে, সে কি না জীবনে মাত্র একবার! মাতালপ্রবর কিন্তু ধীরেসুস্থেই তার সুচিন্তিত মতামত পেশ করেছে। তার বক্তব্য জীবনে সে মদ খেয়েছে একবারই, তারপর থেকে এ অবধি শুধু তার খোঁয়ারিই ভাঙছে। পাহাড়ের ব্যাপারে আমার অবস্থাও হুবহু এক — এই বুড়ো বয়সেও শুধু খোঁয়ারিই ভেঙে চলেছি।

একটা ফার্সি প্রবাদ আছে না, "লায়লীরা বায়দ্ ব্ চশ্‌মে মজনুন দীদ!" অর্থাৎ লায়লীকে দেখতে হয় মজনুর চোখ দিয়েই। অনেকে পাহাড়কে এরকম 'মজনু'-র চোখ দিয়েই দেখেন। তাঁদের দেখার সেই চোখ, ভাবার মতো বোধ এবং মস্তিষ্কের সেই উর্বরতা আছে এবং সর্বোপরি তাঁরা প্রেমিক মানুষ। আমার কোনোটাই নেই আর 'মজনু' হিসাবে কোনোকালে আমার 'সুনাম'-ও নেই। খুব সত্যিকথা বলতে কী পাহাড়ে গেলে প্রত্যেকবারই নিয়ম করে আমার

ছোটোবেলার ওই অভ্যেসটা ফিরে আসে। অর্থাৎ 'হাঁ' করে থাকা। ছোটোবেলায় অকিঞ্চিৎকর কারণেই আমার ঠোঁটদুটো 'হিন্দুস্থান পাকিস্তান' রাজনৈতিক দূরত্ব মেইনটেইন করত। তার জন্য মাঝেমধ্যেই বাবার বকুনি মাসকাবারী ছিল। পাহাড়ের অনন্ত ঐশ্বর্যের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ওইসব বোধ মনন ইত্যাদি প্রভৃতি আমার মস্তিষ্কের কোন কুলুঙ্গী-তে যে আত্মগোপন করে তা আমার অজানা। ওখানে হাঁদার মতো হাঁ করে থাকাটাই আমার ভবিতব্য। পাহাড় হয়ে যায় নীরব বক্তা আর আমি তার তন্নিষ্ঠ শ্রোতা।

২০১৫'র ফেব্রুয়ারির এক শীতের রাতে পার্থ-র সঙ্গে কথা হচ্ছিল। পার্থসারথী সাহা, নিউ আলিপুর স্কুলের ইংরাজির হেড অব দি ডিপার্টমেন্ট। অসম্ভব পাহাড় পাগল মানুষ। এই বইটার প্রসঙ্গে দু-চার কথা বলার পর ওকে জানতে চেয়েছিলাম, "কেউ ছাপবে আমার লেখা? কেউ পড়বে?" ক্ষণিকের বিরতি ...। তারপরেই ফোনের ওপারে সোল্লাস গর্জন, "ছাপবে মানে! আলবাত ছাপবে।" দ্রুত পায়ে অভ্যস্ত ভঙ্গিতে পাহাড়ি পথে বোল্ডারিং করার মতো পার্থ বলে গেছে, "পাহাড়ি ঝর্ণার মতো লিখবে, স্বগোক্তির মতো। Accross the table শ্রোতা রয়েছে, অন্ধকারে। আলো তোমার ওপর। তুমি শ্রোতার ব্যাপারে কনসার্ন নও। তুমি আলো ফেলবে শ্রোতার ওপর, তোমার উপলব্ধি দিয়ে। তোমার আবেগ, কান্না, ভালোবাসা সব একাত্ম করে শুধু বলে যাও সাদা পাতায়। বিভিন্ন ট্রাভেল ম্যাগে তোমার লেখা পড়েছি, অসম্ভব একটা প্যাসন আছে ভাই তোমার পাহাড় নিয়ে। পারবে, নিশ্চিত পারবে।"

মন দিয়ে শুনছিলাম পার্থ-র কথাগুলো। বারে বারেই মনে হচ্ছিল, আরে আমি তো ঠিক এভাবেই ভেবেছি। নিজের কথা লিখব। নিজের মতো করে বলব আমার পাহাড় প্রেম। যে প্রেম শুধু সৌন্দর্যের মুগ্ধতা নয়। যে প্রেম, এক না বুঝিয়ে বলতে পারা বিস্ময়। দু-হাত বাড়িয়ে সজোরে আকড়ে ধরে অবদমিত অশ্রুর এক বাঁধভাঙা সুনামি। আমি পর্বতারোহী নই, পর্বত প্রেমিক কিনা তাও জানি না। তবে এটুকু জানি অন্নপূর্ণা বেসক্যাম্পের অ্যাম্পিথিয়েটারে দাঁড়িয়ে উষসীর প্রাকলগ্নে তিনশো ষাট ডিগ্রি ঘিরে থাকা অন্নপূর্ণা, হিউনচুলি, গঙ্গাপূর্ণা, মচ্ছপুছারে আমাকে ইশারায় ডাকে। হালকা কুয়াশা শিফন আদর বোলায় আমার সর্বাঙ্গে। অনির্বচনীয় স্তব্ধতায় হতবাক হয় এক তুচ্ছ শহুরে মানুষ। কিংবা কেদারতালের সামনে অভ্রভেদী থলয়সাগর তার শুভ্রকাঠিন্যের সন্মোহনী

আভিজাত্যে মুহূর্তে রিফ্রেশ করে এই নভিশ পাহাড়িকে। গোচালা থেকে দেখা কাঞ্চনজঙ্ঘার সমীহ জাগানো উপস্থিতি তৈরি করে এক নগ্ন আবেগ। চিলতে চিরকুটে ধরে রাখা সেই শৃঙ্গারকে জামাকাপড় চাপানোর পোশাকী ইচ্ছে বিন্দুমাত্র আমার নেই। তাই আমি লিখে গেছি আমার অনুভূতির কলমে, আমার নিজস্ব ভাবনার গাঢ় কালিতে চুবিয়ে।

বিভিন্ন সময়ে সন্ধে অথবা রাতের অন্ধকারে পাহাড়ের গা বেয়ে গড়িয়ে আসা অ্যাভেলাঞ্চের রুদ্রনিনাদ মনে পড়িয়েছে সলিল চৌধুরীর কম্পোজিশন্— "আহ্বান শোনো আহ্বান।" গানটায় এই লাইনটা প্রথমে বেস্ ভয়েস থেকে ক্রমশ যেমন উচ্চমাত্রায় গাওয়া হয়েছে, অ্যাভেলাঞ্চের ক্রাউন থেকে ট্র্যাক হয়ে রান আউট জোন্-এ গড়িয়ে আসার ক্রমবর্ধমান গতি এবং শব্দও যেন ঠিক তেমনই এক অভিঘাতী সুরমূর্ছনা। এভাবেই মিলেমিশে যায় প্রকৃতি ও মানুষের তৈরি সুর। যার সার্থক উপলব্ধি স্যার ইয়ং হ্যাজবান্ডের কথায়— "Man and Mountain have emerged from same original earth. Therefore have somthing is common between them."

প্রথম যখন পাহাড়ে যাওয়া শুরু করি তখনও সেভাবে রোজগার করি না। ফলতঃ ব্যয়সংকোচ অনিবার্য ছিল। অনেকটা অ্যালপাইন স্টাইলে নিজের কাঁধেই পাহাড়ি সাজ-সরঞ্জাম, পোষাক, খাদ্য, জ্বালানি, তাঁবু মজুত করে নেমে পড়তাম পথে। অ্যাডভেঞ্চারের প্রবল ইচ্ছের সঙ্গেই অন্তঃসলিলা ছিল বন্য আবেগ। বুঝতাম আমার এই আবেগটা একমাত্র এই বিশালত্বই চেনে। ইন্ডিয়ান টেকটোনিক প্লেট ও ইউরেশিয়ান প্লেটের সংঘর্ষে তৈরি হওয়া হিমালয় নামের এই বিশালত্বের পশ্চিমে প্রশস্তি ৪০০ কিমি ও পূর্বে ১৫০ কিমি। দৈর্ঘ্যে উত্তর পশ্চিম থেকে দক্ষিণ পূর্বে ২৪০০ কিমি. এর এক সুবিশাল বিস্তৃতি। যার মালায় গাঁথা আছে ভারত, পাকিস্তান, মায়ানমার, চিন, ভুটান ও নেপাল। বসবাস বিভিন্ন বর্ণের, বিভিন্ন ধর্মের, বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষের। নানা বর্ণময় উদ্ভিদ, প্রাণী, জলবায়ু, নদী-র এ এক বৈচিত্র্যময় অলংকার। তাই হিমালয়ের পথে হাঁটা শুধুমাত্র ম্যাগনোলিয়া, রডোডেনড্রন, পাইন, ফার, বার্চের ছায়াময় পথ ধরে, গর্জের ধার ঘেঁষে, স্রোতস্বিনীর হিমেল স্রোত বেয়ে, হিমবাহের বুকে ক্রিভাসের বিভীষিকা পেরিয়ে, শৃঙ্গ আরোহণের অপার্থিব রোমাঞ্চ নেওয়া নয়। এ হল ইতিহাস, সভ্যতা আর নিজস্ব উপলব্ধির পথ বেয়ে হাঁটা যেখানে—

"... the joy is in the journey and destination is to reach within yourself...".

আর এই উপলব্ধির কথাই বলে গেছেন বিশ্ববিখ্যাত অভিযাত্রীরা, তাঁদের নিজস্ব ভাষায় নিজস্ব বিশ্লেষণে।

উইলফ্রেড নয়েস-এর বক্তব্য, "... পর্বতারোহণে নিজেকে প্রতিদিনের অভিজ্ঞতার উর্দ্ধে তুলে ধরে একজন মানুষ নিজের চাইতে অনেক বড়ো অস্তিত্বের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে।"

রেইনহোল্ড মেসনারের অন্তর্দৃষ্টি, "নিজের সত্ত্বার গভীরে দৃষ্টিপাত করবার ইচ্ছাতেই আমি আরোহণ করি।"

লিংকন এর ভাষায়, "শুধু শীর্ষজয়ের আকাঙ্খাই আমায় হিমালয়ে টেনে আনে না। আমি যাই অস্তিত্বের মূল্য আর মাধুর্য বারবার নতুন করে বুঝতে। শুধু নিজের অস্তিত্বই নয়। পাহাড়ের, আকাশের, সহযাত্রীদের সঙ্গে সৌহার্দ্যের অস্তিত্ব ...।"

এডমন্ড হিলারির স্বীকারোক্তি, "এই যুদ্ধের পরিণামে যা-ই হোক না কেন, এ লড়াই ভয়, আনন্দ আর গভীর শ্রদ্ধার জন্ম দেয়।"

আমি চেষ্টা করেছি সেই উপলব্ধির কথাই লিখতে। পাহাড়ের কথা উঠলেই আমার আবেগের ফোড়নটা একটু বেশিই হয়ে যায়। তাই চেষ্টা করে গেছি সংযত থাকার। তবু যদি কখনও আবেগের সংযম হারিয়ে থাকি তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী। তবে অভিযানের তথ্যে টান পড়লেই যাঁরা সাহিত্যাশ্রয়ী হয়ে পড়েন, ফিলার হিসাবে গুঁজে দেন অলীক বর্ণনা তাঁদের রাস্তাটা স্বযত্নে পরিহার করেছি। চেষ্টা করেছি রুটের ডিটেইলস্, টিম মেম্বারদের মানসিক বিশ্লেষণ আর প্রকৃতির সান্নিধ্যের কিছু তথ্যনিষ্ঠ যথাযথ বর্ণনা দেবার। চেষ্টা করেছি অসীমের সঙ্গে খেলার এক অপার্থিব আনন্দ আর রোমাঞ্চের সাধ্যমতো পরিস্ফুটনের। জানি পিটার বোর্ডম্যানের 'শাইনিং মাউন্টেন' অথবা রস্‌কেলির 'লাস্ট ডেইজ'-এর মতো সাহিত্যধর্মী এক অভিযানের বর্ণনা দেওয়ার ক্ষমতা আমার মধ্যবিত্ত ব্রিলিয়ান্স রাখে না। তবু পাহাড়ের প্রতি বিশ্বাস আর ভালোবাসায় কোনো খাদ নেই এই ভরসাতেই এই পদক্ষেপ।

পর্বতারোহণের ইতিহাস অনেক পুরোনো। ১৮৪৪ সালের ৩১ অগাস্ট Melchior Bannholzer আর Hans Jaun এর WATERHORN শৃঙ্গ

জয়কেই পর্বতারোহণের ইতিহাসে শুরুয়াৎ বলা হয়। প্রথম স্বীকৃত মাউন্টেনিয়ারিং ক্লাবের জন্ম ১৮৫৭ সালে— The Alpine Club. কিন্তু সত্যি কি তাই? রিফেলহর্ন-এর ইতিহাসে অজ্ঞাত কোনো শিকারীর ফেলে যাওয়া বর্শার ফলা ব্রোঞ্জ যুগে পর্বতারোহণের সাক্ষী। কে জানে মানুষ কবে থেকে পাহাড়ে চড়ার কথা ভেবেছে? এগুলো তো নেহাতই তথ্য। হয়তো নিছকই খাদ্য কিংবা বাসস্থানের জন্যও মানুষ পায়ে পায়ে উঠে গেছে পাহাড়ে। তার ইতিহাস তো লিপিবদ্ধ নেই। যেটুকু লেখা হয় সেটুকুই আমাদের কাছে ইতিহাসের শুরু। কিন্তু তার আগেও যে একটা 'ইতিহাস' ধুলোচাপা পড়ে আছে তার খবর তো আমাদের অজানা।

আমার এই বইয়ের প্রতিটি শব্দের মালিকানা পিয়ালী ব্যানার্জীর। দিনগত রোজনামচায়, আমার ট্র্যাক্-এর বাইরে বেরোতে না চাওয়ার গেঁতোমিকে সজোরে ধাক্কা দিয়ে ও বারবার বলেছে, "লেখ না বাবু, তুই পারবি।" আমার বিরক্তি আর অসহিষ্ণুতা-কে তোয়াক্কা না করে ওর এই লেগে থাকার আন্তরিক প্রচেষ্টার কাছে আমি নতজানু।

আমাকে এই এক্সপিডিশান যোগ্য বলে নির্বাচনের জন্য আমি কৃতজ্ঞ আমার সঙ্গে এক রোপ-এ বাঁধা, তাঁবুতে জমিয়ে আড্ডা দেওয়া আমার টিম মেম্বারদের প্রতি।

কেরিয়ার এবং দৈনন্দিন ব্যস্ততা সরিয়ে রেখে টেলিফোনে বা হোয়াটস অ্যাপ্-এ আমার এই বইয়ের ম্যানুস্ক্রিপ্ট শোনা এবং মূল্যবান মতামত দেওয়ার জন্য অভিবেক বসু, পার্থসারথি সাহা, দেবশ্রী ঘোষ, মোনালিসা সরকার এবং সোমনাথ ঘোষাল ও আরও অনেকের কাছে আমার নিঃশব্দ ঋণ রয়ে গেল।

কার্টুন আঁকার দায়িত্ব নিয়েছে ছোট্ট অভীক রায় তার চওড়া কাঁধে। ওকে আমার আন্তরিক আদর।

পাহাড়ে যখন যাই তখন তো আমি দর্শক। দৃশ্যায়নের পর দৃশ্যায়নের পরিবহণ চলে মস্তিষ্ক থেকে হৃদয়ে। কিন্তু সেই দৃশ্যায়ন পাঠকের সামনে হাজির করার সময় আমি কোথাও পরিচালকের ভূমিকায়। বিভিন্ন মেধা, বিভিন্ন পেশা, বিভিন্ন মননের কাছে প্রাঞ্জল উপস্থাপনার একটা দায়বদ্ধতা থেকে যায়। প্রশ্নটা সেখানেই। আমি কতটা যোগ্য।

তবে আমি জানি না, মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ ছাড়া পাহাড়ের গল্প কজন

শুনতে চায়? পাহাড় এবং পাহাড়ি জায়গার সম্পর্কে নানা তথ্যের ব্যাপারে অনেকেই আগ্রহী। কিন্তু এক একটা পর্বতারোহণ জুড়ে যে উপন্যাসসম ঘটনার ঘনঘটা ছড়িয়ে থাকে তা শুনতে আগ্রহী কজন? কজন পড়বে আমার এই বই? আশঙ্কাটা যখন মনের কোণে ক্রমশ দানা বাঁধছে তখন কিছুটা ভরসা পেয়েছি সৈয়দ মুজতবা আলী-র কথায় — "আমি নিজে কী করি? আমি একাধারে producer এবং consumer — তামাকের মিক্সচার দিয়ে আমি নিজেই সিগারেট বানিয়ে producer এবং সেইটে খেয়ে নিজেই consumer: আরও বুঝিয়ে বলতে হবে? আমি একখানা বই produce করেছি — কেউ কেনে না বলে আমিই consumer অর্থাৎ নিজেই মাঝে মাঝে কিনি।"

আলী সাহেব পনেরোটা ভাষা জানতেন। ওনার মতো বিদগ্ধ পন্ডিতের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা শিক্ষিত আত্মবিশ্বাসীর রসিকতা আর আমার ক্ষেত্রে প্রকৃতই বাস্তবের কথকথা।

প্রথমে একটা ট্রাভেল ম্যাগ-এ অভিষেক চট্টোপাধ্যায়ের দয়ায় পেলিং নিয়ে একটা লেখা বেরিয়েছিল। সেটা পড়ে বরুণ চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায় এবং আরও কয়েকজন বলল — "খাসা হয়েছে"। লেখালেখির রোগটা আর একটু 'ক্রণিক' হতেই পিয়ালী ব্যানার্জী আরও একটু উসকেছে, "একটা বই বার কর না রে"। এভাবেই অনেকদিন ধরে অনেকের লাই পেয়ে আমার দুঃসাহস ক্রমেই বেড়েছে।

একবার এক চৈনিক জনৈক ইংরাজকে ভাঙা ভাঙা ইংরাজিতে বুঝিয়ে বলছিলেন, "সরোবরে জল বিস্তর কিন্তু আমার পাত্র ক্ষুদ্র। জল তাতে ওঠে অতি সামান্য। কিন্তু আমার শোক নাই — মাই কাপ্ ইজ স্মল— বাট আই ড্রিঙ্ক অফতেনার (My cup is small but I drink oftener)"।

আমার ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা হুবহু এক, my cup is samll but I drink oftener. শেষমেষ নানাজনের 'বার' খেয়ে অগত্যা লিখেই ফেললাম একখানা ম্যানুস্ক্রিপ্ট। আসলে কুঁজোর-ও তো চিৎ হয়ে শোওয়ার সাধ হয়।

তাই 'পানপাতিয়ার ডায়ার্নাল', যদি কারও ভালো লাগে সে দায় একান্ত তাঁর। আর ভালো না লাগার দায় নেবার জন্য তো কুঁজো চিৎ হয়েই শুয়ে আছে।

গর্ভসঞ্চার
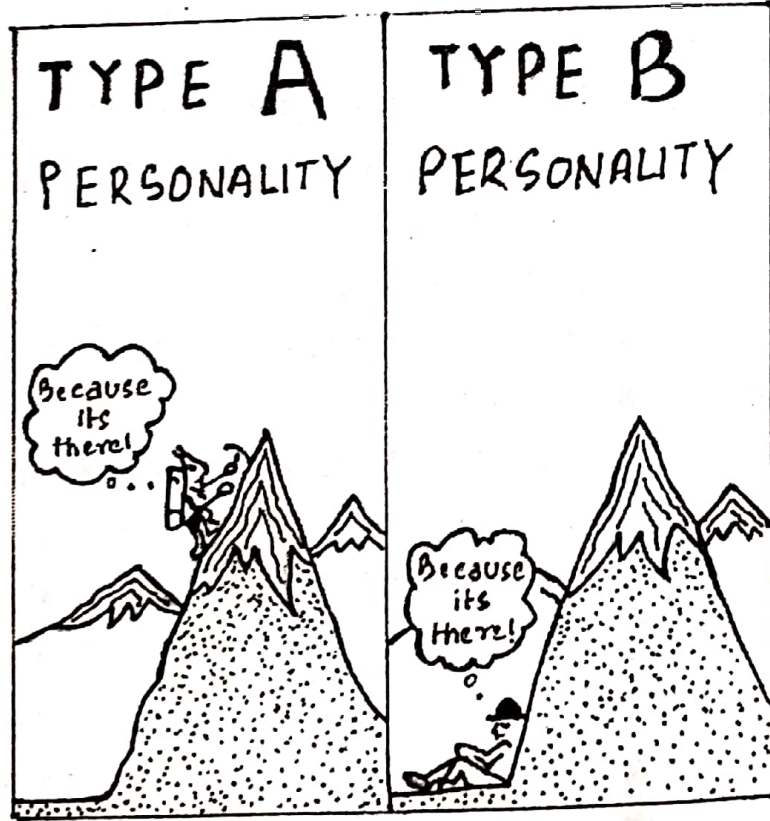
"Hello darkness, my old friend,
I ve come to talk with u again,
Because a vision softly creeping,
Left its seeds while I was sleeping,
And the vision that was plated in my brain.

Still remains
Without the sound of silence."

— "বেডসোরের জন্য যে মেডিসিনটা চলছে সকালে একটা করে ওটা দিনে দুটো করলে হয় না।"

বিখ্যাত এম. ডি. ডঃ নারায়ণ ব্যানার্জীর লম্বা ঈষৎ ভারী শরীরটা হালকা টার্ন নিল আমার দিকে। অপাঙ্গে একবার দেখে নিয়ে ধবধবে ফরসা হাতটা রাখলেন আমার ডান কাঁধে। অল্প হেসে বললেন, "বুঝতেই তো পারছ আর কিছু করার নেই, ডেজ আর জাস্ট নাম্বার্ড।" তবে তুমি মনে করলে দিতে পারো..."। নারায়ণদার শরীরটা ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে 'রিকভারি ওয়ার্ড'-এর ভিতরে। আমার পায়ের আঙুলগুলো জুতোর ভেতর কুঁকড়ে যাচ্ছে। হাত দুটো প্যান্টের পকেটে দৃঢ়মুষ্টিবদ্ধ। নিশ্চিত পরাজয়ের বেসরকারি ঘোষণাটা হয়েই গেল। এখন দিন গোনার পালা।

'আস্থা' নার্সিংহোমের ওষুধ, স্যালাইন, ডেটলের কড়া গন্ধটা পেরিয়ে বি.টি. রোডের ওপর এসে যখন দাঁড়ালাম, তখন রাত প্রায় দশটা বাজতে চলেছে। ডিভাইডারের এপার ওপার জুড়ে টানা হলদে ঝকঝকে স্ট্রিট ল্যাম্পের রেশনাই পড়েছে কালো পিচরাস্তার বুকে। পাবলিক ট্রান্সপোর্ট কমে রাতচরা লরির সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। হাঁটতে হাঁটতেই ফিরছিলাম বাড়ির পথে। জানি ফিরেই কী দৃশ্য দেখব। সিনেমা হলের লাইটম্যান যেমন রোজই একটাই ফিল্ম তিনটে শো-এ দেখেন, আমার-ও তো তাই। এইসময় নিশ্চিত ভাবেই আয়াবৌদি ওয়াটার ব্যাগের ওপর শুয়ে থাকা প্রায় নিস্পন্দ বাবা-কে অল্প অল্প করে সেমিলিকুইড্ ফুড ঢেলে দিচ্ছে অল্প ফাঁক করা ঠোঁটে। বাবার নিথর চোখদুটো সিলিং-এ আবদ্ধ। সারা ঘর জুড়ে একটা 'অন্য' গন্ধ যা নাকে এলেই যেকোনো সচেতন মানুষ বুঝবেন, পরিস্থিতি স্বাভাবিক নয়।

"ডেজ আর জাস্ট নাম্বার্ড ..."। পা চলার তালে তাল মেলাচ্ছিল শব্দগুলো। আর তিনদিন বাদেই দুর্গাপুজো। পথঘাট ঝলমল করছে বিভিন্ন পুজোমণ্ডপের আলোকসজ্জায়। শরতের সিগনেচার সমৃদ্ধ ঝিরঝিরে বাতাস মাঝেমধ্যেই তার উপস্থিতির জানান দিয়েছে আমারে গালে, মাথায়। ভাবছিলাম, এরপর ...? ২০০৯-এ মা-এর তিরোধান। ২০১১-র অক্টোবর-এ বাবা-ও শেষ শয্যায়।

... বাবা চলে গেলেন। ফাঁকা বাড়িটায় নিষ্প্রাণ দেয়াল, জানলা, দরজার সঙ্গে আর একজন সঙ্গী ছিল আমার— 'একাকীত্ব'। প্রফেশান্ আর একঘেঁয়ে দিনপঞ্জী-র ফাঁকে ফাঁকে এভাবেই বয়ে যেত 'সময়'। আর ক্রমে অসহ্য হয়ে ওঠা 'সময়'-টা যখন বোধ, মনন, ভাবনার গিঁটগুলোকে আরও আলগা করে দিচ্ছে, পাকে পাকে জড়িয়ে ধরছে 'নৈঃশব্দ্যের অহংকার', তখনই খাঁচার ভেতর আটকে থাকা ছটফটে মনটা খুঁজে পেয়েছিল মুক্তির আঘ্রাণ। মাথার ভেতর ভেসে উঠেছিল সেই আদিগন্ত বিস্তৃত হিমালয়। হিন্দুমতে, The Himalayas have been personified as the god Himabat, father of Ganga and Parbati. তবে চলো মন নিজ নিকেতনে। আবার সেই ফার, পাইনের ছায়াকীর্ণ আঁকাবাকা পথ, পাথরে ছিটকে ওঠা অবাধ্য নদীর দর্পিত চলন, সেই অবিন্যস্ত অসংখ্য ছড়িয়ে থাকা বোল্ডার বন্ধুর পথ, মোরেইন ঢেউ পেরিয়ে ক্রিভাসদীর্ণ তুষার প্রান্তর, আর সবশেষে কুয়াশার হালকা চাদরে ঢাকা অভ্রলেহী সব তুষার কিরীট। অবশ্য ভুল বললাম। আমার স্বল্প পাহাড়ি জ্ঞানে এটা বুঝেছি ওখানে 'সবশেষে' বলে কিছু নেই। রোজই নিত্যনতুন অভিজ্ঞতা, ভালোলাগা, অবোধ বিস্ময় আর না বোঝাতে পারা নানা উত্তেজনার রাজকোশ। ঘুটনার দম আর কলজের জোর থাকলে তুলে নাও সে রাজকোশ থেকে যত পার মণিমাণিক্য।

ফ্রান্সিস ইয়ংহ্যাজব্যান্ড-এর কথায়— "মানুষ আসলে নিজের সর্বোত্তম সত্তা দেখতে চায়। একমাত্র হিমালয়ের শীর্ষেরাই পারে মানুষের শ্রেষ্ঠতম সত্তা নিংড়ে বার করতে। হিমালয়ই পারে মানুষকে শারীরিক দিক থেকে সক্ষম, মানসিক দিক থেকে সবচেয়ে দৃঢ় আর আত্মিক দিক থেকে সবচেয়ে সহনশীল করে তুলতে।"

বুঝলাম নিজেকে গা ঝাড়া দিয়ে আবার সোজা করে তুলতে এহেন 'মেডিসিন'-এর জবাব নেই। বিশ্বের কোনো ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানির তাবড় সাইনটিস্ট-এর সাধ্য নেই আমার মন, শরীর আর আত্মাকে সঠিক পথে আনার। Gail Sheely যথার্থ বলেছেন— "The challenged life may be the best therapist". বুকের মধ্যে অবাধ্য দামাল নদীটার বোল্ডারে ছিটকে ওঠা জলের শব্দ আবার শুনতে পাচ্ছি। যে নদীটির বড্ড অপছন্দ আমাদের বিরক্তিকর একঘেঁয়ে রোজনামচা-কে। যে ধিক্কার জানায় টু প্লাস টু ইকোয়্যালস

ট্ জোর মানসিকতা-কে। নদীটা ডাকছে ...। চুম্বক-এর মতো টানছে ওই 'বিশালত্ব'-এর অন্দরমহল, যার পোশাকী নাম পর্বতারোহণ। যেখানে খেলোয়াড়ই দর্শক, আর প্রতিপক্ষ যদি বলতেই হয় সে হল ওই বিশাল প্রকৃতি। যদিও প্রতিপক্ষের ক্ষমতা খেলোয়াড়-এর তুলনায় এখানে একটাই অসীম যে 'প্রতিযোগিতা' শব্দটা নিতান্তই বেমানান।

২০১২ সাল। তারিখটা মনে নেই। সকাল নটা নাগাদ বিশুর ফোন— "ডাক্তার, কী করছিস? চা খাবি? চলে আয়।" এই চা খাবার আমন্ত্রণটা আমার কাছে বেশ চেনা ছবি। নিছক আড্ডা নয়, পিছনে কোনো গূঢ় কারণ আছে। দুজনের বাড়ির মধ্যে ব্যবধান হাঁটা পায়ে বড়োজোর মিনিট দেড়েক। চা খেতে খেতেই বিশুর প্রস্তাব — "চল ডাক্তার, পানপাতিয়া-টা মেরে আসি।" ও জানে প্রায় বছর তিনেক পাহাড়ে যাওয়া হয়নি আমার, মায়ের মৃত্যু আর বাবার অসুস্থতার কারণে।

মনে পড়ল ২০০৭-এ আনন্দবাজার পত্রিকায় পরপর দুটো রবিবাসরীয়-তে ধারাবাহিক ভাবে তপন পণ্ডিত, দেবব্রত মুখার্জী-র (দেবু দা) সাক্‌সেসফুল পানপাতিয়া অভিযান নিয়ে একটা লেখা বেরিয়েছিল। লেখাটা পড়ে গাড়োয়াল হিমালয়ের ওই অঞ্চলটা সম্পর্কে বেশ একটা ইন্টারেস্ট-ও জন্মেছিল। কথিত আছে একজন পুরোহিত একই দিনে কেদারনাথ ও বদ্রীনাথে যাতায়াত করে পুজো করতেন সারাবছর। এইভাবে অনেকদিন চলার পর পুরোহিতের কিছু পাপকার্যের ফলে দেবাদিদেব মহাদেব রুষ্ট হন এবং ওই নির্দিষ্ট পথের মধ্যে আকাশচুম্বী বাধা হয়ে দাড়ান যা আজকের নীলকণ্ঠ পর্বত। এই পথের সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ থাকলেও সন্দেহ নিরসনের উদ্দেশ্যে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য অভিযান হয় এই অঞ্চলে, বেশ কয়েক দশক ধরে। এরিক শিপটন, মার্টিন মোরেন, বিল টিলম্যান, ডানকান টাংস্টেন, কলকাতার অনিন্দ্য মুখার্জীর অভিযান এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। অবশেষে ২০০৭-এ গুগুল সার্চের মাধ্যমে দেবু-দা আবিষ্কার করেন একটি গালিপথ। আর তারপর তো ইতিহাস। জুন মাসে বদ্রীনাথ থেকে যাত্রা শুরু করে পানপাতিয়া কল ক্রশ করে মদমহেশ্বর পৌঁছয় তপন পণ্ডিত-এর টিম। ভারতবর্ষের বেশ কিছু লিডিং নিউজ পেপারে ছাপা হয়েছিল সেই অভিযানের সাফল্য।

— "How the bells tolled — A group of treckkers

from Bengal, led by Tapan Pandit has found a new route that connects Badrinath to Kedarneth."

— The Telegraph (22.07.2007)

—"যেখানে কোনোদিন মানুষের পা পড়েনি সেখানেই উড়লো ভারতের জাতীয় পতাকা! ওড়ালেন বাঙালীরাই।

— Ananda Bazar Patrika (13.01.2008)

হিমালয়ান জার্নালের সম্পাদক মুম্বাইয়ের প্রখ্যাত পর্বতাভিযাত্রী হরিশ কাপাডিয়া বলেছিলেন, "It is a superb route & is certainly a big achievement from the trekkers from Bengal who have opened it."

বাড়ি এসে ল্যাপটপ অন্ করে, "পানপাতিয়া হিমবাহ" লিখে গুগুল সার্চ দিলাম। স্ক্রিনে ফুটে উঠল নানা তথ্য, ম্যাপ আর ছবি। একটা সময় ক্লান্ত লাগছিল। শারীরিক নয়, মানসিক। কী করব কম্পিউটারের সামনে সময় কাটিয়ে? কবে পা দেব ওই ঐতিহাসিক তুষারের সীমাহীন বিস্তারে? কবে পেরোব ওই চিচিং ফাঁকের দরজা? প্রত্যেকবারেই পাহাড়ে যাবার আগে একটা উত্তেজনা থাকেই। আমার কেন সবারই থাকে। থাকাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এবার যেন পরিস্থিতিটা একটু অন্যরকম। প্রাণের সরোদে ঝালার প্রাবল্যটা একটু বেশিই।

কয়েকদিন কেটে গেল এভাবেই। কাজের ফাঁকে পানপাতিয়া, পানপাতিয়ার ফাঁকে কাজ। একদিন সন্ধেবেলা দেখা হল সুমনের সঙ্গে। সুমন কুণ্ডু। দলের আর এক সদস্য, ব্যারাকপুরে বাড়ি। কথায় কথায় জানতে পারলাম এক্সপেডিশান-এর প্ল্যানটা ওরই মস্তিষ্ক প্রসূত। সদাহাস্যময় কিছুটা শিশুসুলভ মানুষটা আমাদের চেয়ে বছর সাতেকের ছোটো। ওর যে গুণটা প্রাথমিকভাবে আমার নজর কেড়েছিল তাহল রুট নিয়ে রিসার্চওয়ার্ক। যেটা প্রত্যেক টিমের প্রত্যেক সদস্যেরই কমবেশি থাকা উচিত অথচ বাস্তবে তার প্রতিফলন বড্ড কম। আমি চিরকালই শুধুমাত্র পাহাড়ে হেঁটে চলা বা দড়ি বেয়ে ওঠায় বিশ্বাসী থাকতে চাইনি। মিশতে চেয়েছি পর্বাতোরোহণের অনেস্ট কালচারের সঙ্গে, পরিচিত হতে চেয়েছি উদার প্রান্তরের বৈচিত্র্যময় ফ্লোরা, ফনার আতিথ্যে, আলাপ করতে চেয়েছি নগর সভ্যতা থেকে কিছুটা পেছিয়ে থাকা ভারতবর্ষের এক অভিজাত অধিবাসীদের সঙ্গে। কতটা উচ্চতায় উঠলাম, কতটা রেকগনিশান পেলাম, মাথায় আসেনি

কখনও এসব কেরিয়ারিস্টিক ব্যাপার স্যাপার। হিমালয় আমার কাছে আবাল্যের সুখ, আজন্মের জানু পেতে মুক্তির আঘ্রাণ। সে পথে সুমন আমার বড়ো আত্মিক এক চরিত্র, যার সঙ্গে টেন্ট শেয়ার করতে আমি গর্ববোধ করি।

প্রত্যেক প্রস্তুতির-ই কিছু প্রাক প্রস্তুতি থাকে। প্রাক্-প্রস্তুতি পর্বটা জমিয়ে করলে প্রস্তুতি পর্বে কনফিডেন্স লেভেল টাও হাই থাকে। যথারীতি সুমনই অগতির গতি। আমি মাঝেমধ্যেই প্রফেশনের ফাঁকে বিভিন্ন রুট, তার ম্যাপ, পূর্ববর্তী টিমের লেখাপত্তর ইত্যাদি প্রভৃতি নাড়াঘাঁটা করি। কিন্তু এ ব্যাপারে সুমনের সঙ্গে তুলনায় আমি নেহাতই শিশু। ২০০৩-এ বিশ্বকাপ ক্রিকেটে অস্ট্রেলিয়া চ্যাম্পিয়ন হবার পরবর্তী সময়ে এক সাক্ষাৎকারে ক্যাপ্টেন রিকি পন্টিং বলেছিলেন — "আমরা একটা ওয়ার্ল্ড কাপ শেষ হলেই চারবছর পরের ওয়ার্ল্ড কাপ নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করে দি।" সুমন অন্য ব্যাপারগুলোতে ভেতো বাঙালি হলেও, এই পাহাড়ের ব্যাপার স্যাপারগুলোতে পুরোদস্তুর অস্ট্রেলিয়ান। অনেকসময় কোনো অভিযানের শেষের দিকে টেন্ট-এ বসেই পরবর্তী অভিযানের ছক কষা শুরু করে। এবারেও রুট, ওয়েদার, গাইড এসব ব্যাপারে পুঙ্খানুপুঙ্খ খোঁজ নেওয়ার পাশাপাশি হরিশ কাপাডিয়া, তপন পণ্ডিত-এর পানপাতিয়া সম্পর্কিত লেখা, গুগুল আর্থ থেকে পানপাতিয়া ও আশেপাশের অঞ্চলের ছবির প্রিন্ট আউট সবই ওর ফাইলে ঢুকে গেছে। একদিন বলল, "চলো দেবুদা (মাউন্টেনিয়ারিং গাইড দেবব্রত মুখার্জী)-র সঙ্গে দেখা করে আসি। প্রস্তাবটা যারপরনাই আমার মনে ধরল। আফটার অল্ ২০০৭-এর প্রথম সফল পানপাতিয়া কল ক্রশ করা টিমের ক্লাইম্বিং লিডার। স্বাভাবিক ভাবেই রুট এর প্রতি ইঞ্চি ওঁর নখদর্পণে থাকবে এটাই স্বাভাবিক। ফোনে আগে কথা হয়েছিল। খুব সম্ভবত একটা বুধবার বিকেলে উল্টোডাঙা মোড়ে চেম্বার করে দাঁড়িয়ে আছি। সুমন আর বিশু-ও যে যার কাজ সেরে এল। অটোয় সল্টলেক স্টেডিয়াম পৌঁছোলাম। দেবুদা তখন ওয়ার্ক আউটে ব্যস্ত। স্টেডিয়ামের মেন এন্ট্রান্স পেরিয়ে ঘাসজমি। তারপর যে সিঁড়িগুলো বেয়ে আমরা মূল স্টেডিয়ামে প্রবেশ করি, মূলত ওখানেই চলছিল ওনার শারীরিক কসরৎ। কখনও জোড়া পায়ে হপিং, কখনও টানা সিঁড়ি বেয়ে ওঠা নামা, কখনও অল্টারনেটিভ স্টেয়ার কেস টপকে দৌড়। হাতের ইশারায় আমাদের ওয়েট করতে বললেন। আমি নিবিষ্ট মনে লক্ষ করছিলাম, শারীরিক কসরৎ

ব্যাপারটার ওপর আমার চিরকালীন প্যাশন। শুধু তো শরীর নয়, মন-ও তরতাজা রাখে। বর্তমান গবেষণায় উঠে এসেছে শারীরিক কসরতের ফলে যে 'এন্ডরফিন' নামের হরমোন শরীরের ভেতর নিঃসরণ হয়, তা মনমেজাজকে দিব্যি ফুরফুরে রাখে। তাই এই হরমোনের আর এক নাম 'হ্যাপি হরমোন'।

পর্বতারোহণের জন্য প্রস্তুতিকে সাধারণত দু-ভাগে ভাগ করা হয়—শারীরিক ও মানসিক।

শারীরিক ভাগে পড়ে 'মাউন্টেনিয়ারিং রিলেটেড এক্সারসাইজ', 'ব্যালান্সড এক্সারসাইজ' ও 'ব্যালান্সড গেম'।

'মাউন্টেনিয়ারিং রিলেটেড এক্সারসাইজ'-এর মধ্যে হরাইজেন্টাল বার, আয়রণ শু, লঙ্ ডিস্টেন্স দৌড়, মেডিসিন বল নিয়ে ব্যালান্স প্র্যাকটিস, ওজন নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা, ব্রিদিং এক্সারসাইজ ইত্যাদি।

'ব্যালান্সড এক্সারসাইজ'-এর মধ্যে মূলত অ্যারোবিক এক্সারসাইজ, স্ট্রেন্থ ট্রেনিং এবং ফ্লেক্সিবিলিটি ট্রেনিং উল্লেখযোগ্য। অনেকেই লুৎজ মেইসনারের 'ব্যালান্সড এক্সারসাইজ প্রোগ্রাম' ফলো করেন।

আর 'ব্যালান্সড গেম'-এর মধ্যে টেনিস, হর্স রাইডিং, রোলার স্কেটিং, স্কিয়িং এইসব খেলার নাম করা যেতে পারে।

মানসিক ভাগের মধ্যে মূলত যোগ ও প্রাণায়াম। পাহাড় যেহেতু মূলত মানসিক শক্তির পরীক্ষা নেয় বা বলা ভালো একটা পর্যায়ের পর মানসিক শক্তি-ই 'এক্স ফ্যাক্টর' হয়ে দাঁড়ায় তাই যোগ, প্রাণায়াম এর অবদান অস্বীকার করা বাতুলতা।

দেবুদা একসময় আমাদেরও ডেকে নিলেন। বিশুর প্রিয় এক্সারসাইজ 'শবাসন'। বেচারী-র তখন লালমোহন বাবু-র উঠের পিঠে চড়ার মতো অবস্থা। সুমন অফ সিজনে সাঁতার কাটে। কিন্তু সেও একটু হতচকিত। শুরু হল আমাদেরও ট্রেনিং। আমি ভিতর থেকে নিজেকে ঝালিয়ে নেওয়ার জিদ-টা নিয়ে নিয়েছি। পাল্লা দিয়ে দৌড়েছি দেবুদার সঙ্গে। আজ-ও মনে হয় আগের থেকে বডি ওয়ার্ম থাকলে সেদিন দেবুদা-কে টপকে যেতাম হয়তো। এটা আমার অহংকার নয়, আত্মবিশ্বাস। আফটার অল নর্থ কল দিয়ে প্রথম সফল বাঙালী এভারেস্টার-এর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বেশ কিছুক্ষণ সফল ওয়ার্কআউট করতে পেরেছি এটাও তো ভরসা যোগায় নিজেকে।

একসময় আলোচনায় বসলাম। রুট নিয়ে আরও কিছু টেকনিক্যাল ডিটেইলস পেলাম। মূলত লোয়ার পানপাতিয়া আইসফিল্ড থেকে আপার পানপাতিয়া আইসফিল্ডে ক্লাইম্ব করাটাই এই রুটের মূল দুর্গমতা এটা মাথায় ঢুকিয়ে নিলাম। আমরা জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের প্রথমে বেরোচ্ছি শুনে দেবুদা একটু ভ্রু কুঁচকোলেও পরে বললেন — 'চলো, হয়ে যাবে।' বাকি আরও কিছু কথাবার্তার পর যখন ফিরছি, তখন পাখিরাও ক্লান্ত ডানা মেলেছে ঘরের দিকে। স্টেডিয়াম সংলগ্ন ফ্ল্যাট বাড়িগুলোতে একে একে জ্বলে উঠছে আলো। আমরা স্টেডিয়াম ছেড়ে তেরো নম্বর ট্যাঙ্কের সামনে পিচরাস্তায় উঠে এসেছি।

ভুল বললাম। পা-টা পিচরাস্তায় যন্ত্রের মতো চললেও, মনের পা আমাকে নিয়ে গেছে সেই ধ্যানগম্ভীর কর্ডিলেরা ঘেরা রহস্যময় তুষার রাজ্যে। যেখানে এখন হয়তো হিমেল হাওয়ায় বড়ো একান্তে রাতের আকাশে শুধু ভালোবাসার তারা-রা ফুটে আছে। আর 'ধূসর অন্ধকারে নিস্তব্ধ আবেগ ডানা ঝাড়ছে উড়ন্ত পাখীর মতো'। এখানেই আর কিছুদিন বাদেই টেথিস সাগরের স্মৃতি গ্র্যানাইট শরীরে এঁকে সারি সারি সব তুষার কিরীট-এর মাঝে হবে আমার স্বপ্নের উড়ান।

এই আমার এক চরিত্রদোষ। প্রফেশন্ এবং ব্যক্তি জীবনে, আমার মুখাপেক্ষী কিছু মানুষকে কলকাতায় ফেলে রেখে মন যে মাঝে মাঝেই ছুটে যায় ওই মেহেজবিন্-এর কাছে। অতএব চরৈবতিঃ।

যাত্রা
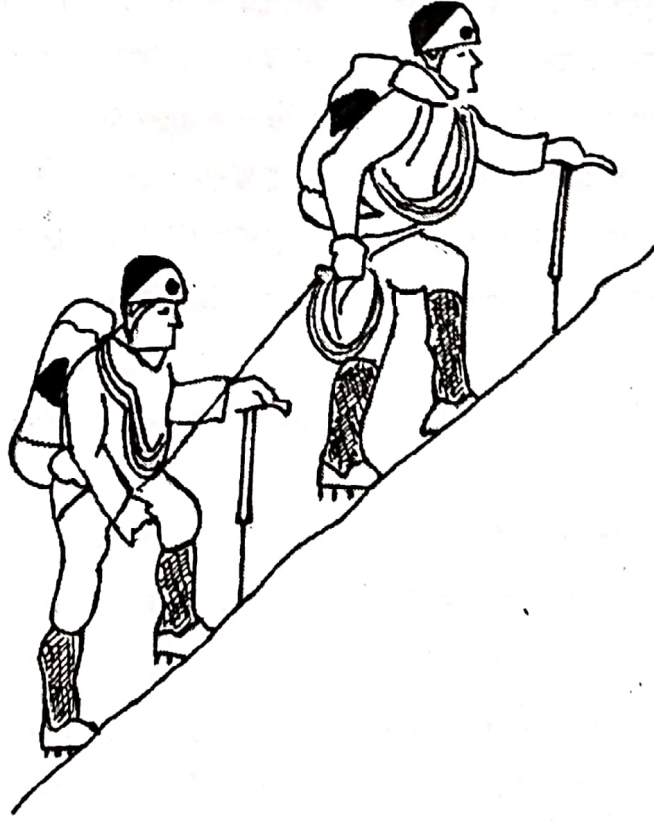
অজগর রাজপথ পাকে পাকে বেঁধেছে পাহাড়
সমাচ্ছন্ন কুসুম— নির্জন
নিটোলে স্বচ্ছতা ঘিরে বেজে উঠেছে গুন গুন বৃক্ষবদনা;

ডালে ডালে পল্লবিত কুয়াশার ফুল
পদতলে বেজে যায় জলের নূপুর।
পাথর-কাটানো পথ বেঁকে গেছে সমুদ্রের দিকে
ঐ দূরের থেকে কে পাঠালো আলোর সঙ্গীত
তাকে কেউ চেনো? যদি দেখা পাও
দেখা যদি হয়ে যায় বোলো—
সমতলে সে ভালো নেই ...

— অরুণকুমার চক্রবর্তী

সৈয়দ মুজতবা আলী-র 'দেশে বিদেশে' আমার খুব প্রিয়। ওখানেই পড়েছিলাম যে আরবী ভাষায় একটা প্রবাদ আছে 'ইয়োম্ উস্ সফর্, নিস্ফ্ উস্ সফ্র্'— অর্থাৎ কিনা 'যাত্রার দিনই অর্ধেক ভ্রমণ'। পূর্ব বাঙ্গলায়ও একই প্রবাদ প্রচলিত আছে। সেখানে বলা হয়, 'ডাঁটোন সমুদ্র পেরলেই অর্ধেক মুশকিল আসান'। ৮ই জুন ২০১২, শুক্রবার বাড়ি থেকে বেরিয়ে হাওড়া স্টেশন, এই পথটুকু-তে অর্ধেক ভ্রমণ হয়েছিল কিনা জানা নেই তবে অদ্ভুত এক মুক্তির আনন্দ ছিল।

৮ই জুন, এমনিতেই আমার জীবনে এক ভয়ানক 'দ্বিধাপূর্ণ' দিন। নানা বাধাবিঘ্ন পেরিয়ে, বাবা মা'র দাক্ষিণ্য আর ডাক্তারদের ছুরি কাঁচির কেরামতিতে এই দিন-ই আমি ল্যান্ড করেছিলাম উত্তর চব্বিশ পরগণার বরানগর নামক জনপদে। দুর্বৃত্তি, দুর্বোধ্যতামো আর রীতিহীনতায় ভরা পৃথিবী নামক এই পিকিউলিয়ার গ্রহটা সম্পর্কে তখনও আদপে আমার কোনো আইডিয়া ছিল না। এখনো নেই, তাই দিনটাও আমার কাছে বড্ড 'দ্বিধাপূর্ণ'। আর সেই দিনেই কিনা মুক্তির আনন্দ! কেয়াবাৎ!

ট্রেনের জানলা দিয়ে দেখেছি ক্রমে পিছনে সরে গেছে আমার চেনা শহর, চেনা মানুষ, চেনা বসতি, চেনা পাকস্থলী। আশৈশব দেখা আমার এই ব্যস্ত শহর ছেড়ে আমি চলেছি সেই আদিম পৃথিবীতে যেখানে সবটাই প্রকৃতির ইজারায়। মানুষ সেখানে অতিথি শিল্পী মাত্র। সেখানে আবার জানু পেতে দুদণ্ড শান্তিতে বসতে পারব, নিতে পারব ছয়াধন পাইনের নিষ্কলুষ আতিথ্য, দেখতে পারব অনন্ত অসীম কোবাল্ট নীল আকাশের বুকে দুধসাদা মেঘেদের প্রাকৃতিক মুভমেন্ট, আর উঁচু উঁচু সারি সারি মেঘের বুকেতে বাড়ির মতো জেগে থাকবে

নামী অনামী সব শৃঙ্গমালা।

দুপুর একটায় উপাসনা এক্সপ্রেস, হাওড়া থেকে। এবারের এক্সপেডিশানে টিমের কয়েকজন আমার অল্প চেনা। যেমন সলিলদা। রোগা, শ্যামবর্ণ, খাড়া মানুষটা অদ্ভুত শান্ত প্রকৃতির। কথাও বলেন কম। শরীরে রাগ বলে রিপুটি 'মিসিং লিংক'। কিন্তু পাহাড়ের বায়োডাটা রীতিমতো ঈর্শনীয়। ঈশ্বর পাটনী-কে যেমন লাঠি ধরার আগে চেনা যেত না, সলিলদার পারফরম্যান্স আর মানুষটাকে চিনতে গেলে পাহাড়-ই প্রকৃত মঞ্চ।

স্বর্ণেন্দু ব্যানার্জীর বাড়ি বাগুইহাটীতে। শক্তপোক্ত, শ্যামবর্ণ ছেলেটা আদ্যন্ত সরল আর হাসিখুশী। চাকরি করে ইন্ডিয়ান আর্মি-তে। ডাকনাম 'কোস্টাল'। স্বর্ণেন্দু অর্থাৎ সোনার চাঁদ-এর এহেন নামকরণের কারণ বেচারা কবে নাকি সবেধন নীলমণি একখান কোস্টাল ট্রেক করেছিল। এইচ. এম. আই. থেকে বেসিক এবং অ্যাডভান্স করা ছেলেটার পাহাড়ের রেকর্ড যথেষ্ট ভালো হওয়া স্বত্ত্বেও ভালোনাম ধুয়ে গেছে সাগরের জলে।

শঙ্খ দাশগুপ্ত স্টেট ট্রান্সপোর্টে কর্মরত। ফাটিয়ে ফরসা আর চুটিয়ে আড্ডাবাজ। বেঁটেখাটো আর সুস্বাস্থ্যের অধিকারী মানুষটার উপস্থিতি টিমের মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে যথেষ্ট পুষ্টিকর তা বুঝেছিলাম রুটে নেমে। শঙ্খদা-র একটা নিক্ নেম দিয়েছিলাম — হিলারী। অবশ্যই পারফরম্যান্স দেখে নয়, কারণটা নেহাতই গাত্রবর্ণ।

শঙ্খ-পত্নী বেদাতী দাশগুপ্ত আদতে ত্রিপুরার মেয়ে। সর্টহাইট তবে রীতিমতো জিম করার কারণে মোটামুটি ফিট রেখেছেন নিজেকে। পাহাড়ে বউদির পারফরম্যান্স-এর সঙ্গে আব্রাহাম লিংকন্-এর মন্তব্যটা-ও দিব্যি ফিট করে যায়— "I am a slow walker, but I never walk back."

মলয় দেবনাথ বর্ধমানের বাসিন্দা। ব্যবসায়ী মানুষ। মলয়দার পরিচয় দিতে গেলে গুন্টার গ্রাস-এর একটা বক্তব্যই যথেষ্ট— "মুখের পয়লা কাজ খাওয়া ও কথা বলা"। লিমিটলেস ক্ষ্যাপাটে আর ট্রিমেন্ডাস পেটুক মানুষটার উপস্থিতি এক্সপেডিশানে নিঃসন্দেহে নিয়ে আসে একমুঠো খোলা হাওয়া।

সুমন কুণ্ডু টিমের ম্যানেজার। পাহাড় পর্বতের ব্যাপারে অসম্ভব প্যাশনেট্। বিয়ের আগে ওর বউ মৌ-এর থেকে কথা চেয়ে নিয়েছিল যে বছরে একবার অন্তত ওকে এক্সপেডিশানে যেতে দিতে হবে। ব্যারাকপুরবাসী এক সন্তানের

পিতা সংসারের মতোই পাহাড়ি পথে সমান দায়িত্ববান।

বিশ্বজিৎ হাজরা দলনেতা। তবে এই পোশাকী নাম ভালো পোশাকের মতো তোলাই থাকে বেশিরভাগ সময়। দুনিয়ার প্রায় সবার কাছেই ও বিশু। ছেলেটার সারা বছরটা পাহাড়ে কাটলেই ভালো হয়। লোকজন সমস্যায় পড়লেই ওর একটাই প্রেসক্রিপশন্, ‘‘পাহাড়ে যা, সব ঠিক হয়ে যাবে, এ সব ‘লো অলটিটিয়ুড সিক্‌নেস’।’’ আমাদের টিমের লিডার-কে ‘‘তোর টাক-টা ক্রমশ বাড়ছে’’, কথাটা বলা যাবে না। বললেই গম্ভীর হয়ে উত্তর দেয়, ‘‘আমার টাক পড়েনি, আমি টাক রাখছি।’’

পরিচয় পর্বগুলো আরও নৈকট্য পেয়েছে ট্রেনযাত্রায়।

ট্রেন যখন ছেড়েছে আকাশ তখন অল্প মেঘলা। বিকেলের দিকে অল্প ঝিরঝিরে বৃষ্টিও হল। চা, মুচমুচে চানাচুর আর আড্ডায় একসময় নেমেছে সন্ধ্যা। স্লেট কালো আকাশের বুক চিরে ক্রমশ জমে উঠেছে তারাদের মেহেফিল। সেই মেহেফিলকে পাশে রেখে রাতের বুক চিরে ছুটে গেছে ট্রেন, উত্তর দিগন্ত বরাবর। ঘুটঘুটে অন্ধকারে মাঝে মধ্যেই নিকষ কালোর বুক চিরে দপ করে জ্বলে উঠেছে ট্রেনের জানলা দিয়ে ঠিকরে পড়া আলো। হালকা তন্দ্রায় কেটে গেছে রাত, বিশু আর শঙ্খদার নাসিকাগর্জনের লহরায়।

ট্রেনে ঘুম আমার সেভাবে হয় না। রাতটাও তাই এপাশ ওপাশ করে কেটেছে। ভোরের আলো ফুটতেই মেজাজ আবার দিব্য ফুরফুরে। আর কয়েক ঘণ্টা বাদেই হরিদ্বার। আবার সেই রিক্সা অটোর জ্যাম, কোলাহল, রাবড়ি, গরম গরম গুলাবজামুন আর জিলিপি। সঙ্গে সন্ধেবেলা গঙ্গায় প্রদীপ ভাসানোটাও আমার দারুণ লাগে। আশির দশকে বাবা মা-এর সঙ্গে প্রথম আসা হরিদ্বারে। তখন থেকেই দিনাবসানে হর কি পৌরির ঘাট আমায় ভীষণ টানে। অবশ্য এ যাত্রায় কোলাহল আর জ্যাম ছাড়া ওই সুখাদ্যগুলোর সুস্বাদ জুটবে না বা গঙ্গারতিও দেখা হবে না। স্টেশন লাগোয়া চত্বর থেকেই অটো নিয়ে সোজা যাব হৃষিকেশ। আজ ওখানেই রাত্রিবাস।

ট্রেনে প্রায় দেড়দিন সিগারেট খাওয়া যায়নি। স্টেশন থেকে বেরিয়েই বুক ভরে দমপান থুড়ি ধূমপান করেছি। সঙ্গে সঙ্গে পাশে চলে এসেছে শঙ্খদা। এই ধূমপান এর সময়ে শঙ্খদার সঙ্গে আমার ‘লাইফবয়’-এর মতো সম্পর্ক। মানে একসময় ওই যে টিভিতে অ্যাড-টা দেখাত না — ‘লাইফবয় যেখানে

স্বাস্থ্য সেখানে''। আমি ধরালে শঙ্খদা পাশে চলে আসে কাউন্টার প্রার্থী হয়ে আর শঙ্খদা ধরালে যথারীতি আমি সেঁটে যাই এনকাউন্টারে। একসময় দরদাম সেরে মালপত্র নিয়ে উঠে পড়েছি অটোয়। চলেছি হরিদ্বার থেকে অল্প উঁচুতে হৃষিকেশ এর পথে।

হরিদ্বার থেকে ২৫ কিমি উত্তরে সমুদ্রতল থেকে ১৭৪৫ ফিট উচ্চতায় অবস্থিত হৃষিকেশ। ঘণ্টাখানেকের দূরত্ব হরিদ্বার থেকে। গঙ্গা আর চিরসবুজ চন্দ্রভাগার তীরে অবস্থিত এই হৃষিকেশ তেহরি গাড়ওয়াল, পাওরি গাড়ওয়াল আর হরিদ্বার এই তিনজেলা দিয়ে ঘেরা। ১১.৫ কিমি: বিস্তৃত এই অঞ্চল প্রাচীন কেদারখণ্ড বা বর্তমানে গাড়ওয়াল-এর অন্তর্গত। বদ্রীনাথ, কেদারনাথ, গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রী এই চারধামে যাবার গেটওয়েটি একাধিক মন্দির ও আশ্রমে ঘেরা। কোপেনজেইগার-এর ক্লাইমেট ক্লাসিফিকেশন সিস্টেম অনুযায়ী এখানকার জলবায়ু ''হিউমিড সাবট্রপিক্যাল''।

স্টেট ট্রান্সপোর্টের বাসগুমটির পাশেই একটা হোটেলে স্যাক নামালাম। পরদিন ভোর চারটের বাস। একটু বেশি রাত অবধি যে আড্ডা দেব তার উপায় নেই। তবে বাসগুমটির পাশে হোটেল হওয়ায় বাস ধরার সুবিধেটুকু পুরোমাত্রায় পাওয়া যাবে।

ঠিক করলাম ভালো করে স্নানপর্বটা সারতে হবে। আবার বোধহয় ট্রেক শেষ করেই মাথায় জল ঢালতে পারব। বদ্রীনাথে স্নান-এর একটা চান্স নেওয়া যেতে পারে তবে সেক্ষেত্রে ঠাণ্ডা লেগে যাবার চান্সও যথেষ্ট। স্নান সেরে একটু চক্কর কাটতে বেরোলাম। পাহাড়ে ট্রেক-এর সুবাদে হৃষিকেশ বেশ পরিচিত জায়গা। গঙ্গার রূপ এখানে ভয়াল ভয়ংকর। বোল্ডারে ছিটকে ওঠা জলের বয়ে যাওয়া স্রোতে যেন এক অনন্ত 'রক্ মিউজিক্'। টানা শুনতে থাকলে আর চেয়ে চেয়ে ওই উন্মত্ততার সাক্ষী হলে সবকিছু কেমন যেন গুলিয়ে যায়, ঘিরে ধরে অবসাদ, বোধহীন হয়ে পড়ে 'সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম'। প্রাণের মাঝে বড়ো মূর্ত হয়ে ওঠে — ''খেলিছ এ বিশ্বলয়ে, বিরাট শিশু আনমনে ...''। একসময় ধীর পায়ে ধরেছি হোটেলের পথ। অভিঘাতী স্মৃতি ছলকে নেমেছে অবসাদ। তরঙ্গাভিঘাত ছায়া হয়ে হেঁটে গেছে পাশে পাশে।

রাতে হোটেলের উলটো দিকের সস্তা হোটেলে উদরপূর্তি করে যখন ফিরছি পথঘাট ততক্ষণে শুনশান হতে শুরু করেছে। ঘরে ফিরে স্যাক আর

ওয়েস্ট পাউচ-টা একবার চেক করে নিলাম। পাতলা একটা চাদর টেনে যখন বালিশে মাথা দিয়েছি তখন রাত সবে দশটা। ঘুমও আসছে না। অতএব আমার যা স্বভাব। মলয়দা আর স্বর্ণেন্দুর পিছনে লাগা শুরু করেছি। থেকে থেকেই স্বর্ণেন্দুর আর্তনাদ — "ও বিশুদা, এই দ্যাখো ডাক্তার কী করছে!" সবাই চুপচাপ শুয়ে থাকলেও ঘুম কারোরই তেমন আসছিল না। সুতরাং এই 'টাইম পাস'টা সকলের কাছেই বেশ উপভোগ্য হয়ে উঠল। একসময় আবার সব চুপচাপ। শুধুমাত্র রিস্ট ওয়াচের হালকা টিক্ টিক্ আওয়াজটা আমার অন্তরাত্মার কথা বলে যাচ্ছিল, "The mountains are calling and I must go."

প্রায় ভোর চারটেতেই বাস ছেড়েছে বদ্রীনাথের পথে। বাসের মাথায় খাবার দাবার-এর ড্রাম, টেন্টস আর স্যাকগুলো আগেই তুলে দেওয়া হয়েছে। শুধু আইস অ্যাক্সগুলো রেখেছি নিজেদের কাছে। ড্রাইভার যখন বাস স্টার্ট করেছে তখনও চারদিক ঘন অন্ধকারে ডুবে। যদি তারাদের আলো আবছা হয়ে জানান দিচ্ছে ভোরের আলো ফুটতে আর বেশি দেরি নেই।

বেশিরভাগ যাত্রীই লোকাল। দিনের ওটাই প্রথম বাস। বাসটার সিট্ কিন্তু একটাও ফাঁকা নেই। দু-একজন দাঁড়িয়েও আছে। একসময় খরস্রোতার বাঁদিক ঘেঁষা রাস্তা ধরল বাস। রিভারবেড কিছুটা নীচে। অল্প আলোয় কল্লোলিনীর আবছায়া মাখা মত্তরূপ দেখতে দেখতে কখন যে দুচোখ জুড়ে ঘুম নেমেছে টের পাইনি। ঘুমের অবশ্য দোষ নেই। ট্রেনে সেভাবে ঘুমোইনি। আর গতকাল রাতে তো উত্তেজনায় পুরো জেগে। মাঝরাতে বিশু উঠে আবার চা করেছে। চা খেয়ে আবার কিছুক্ষণ কজন মিলে বাইরেটা চক্কর দিয়েও এসেছি। সব মিলিয়ে এহেন অত্যাচার আমাদের স্নায়ুতন্ত্র সইতে পারেনি। যথারীতি বাগাবৎ করেছে। আর আমার সঙ্গে বাকিরাও সবাই চলে গেছে ঘুমের রাজ্যে।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম জানি না, আচমকা ঘুম ভেঙেছে প্রবল ধাক্কায়। দেখি আমার বাঁ দিকের সারিতে চিবুক অবধি ঘোমটা দেওয়া এক দেহাতী মহিলা আমার কাঁধ ধরে ঝাঁকাচ্ছেন আর বিচিত্র দেহাতী হিন্দিতে কী সব বলে যাচ্ছেন। মুখ না দেখলেও বুঝতে পারছি মাতৃসমার গলায় সস্নেহ ধমকের সুর স্পষ্ট। পাশের কমবয়সীটি সেই ধমকের তালে হেসে চলেছে প্রায় নিঃশব্দে। কেঁপে কেঁপে ওঠা শরীরে সেই নিঃশব্দ হাসির দমক সুস্পষ্ট। আমার হতবাক অবস্থাটা সে যে বেশ এনজয় করছে তা বোঝা যাচ্ছে। প্রথমে ঘুম জড়ানো

মস্তিষ্কে ব্যাপারটা কিচ্ছু ঢোকেনি — হলটা কী? সিলেট বা চট্টগ্রামের মানুষের মুখের বাংলা ভাষা যেমন আমার কাছে হিব্রু মনে হয় এক্ষেত্রেও কালো রঙের, হাতে অজস্র কাঁচের চুড়ি পরিহিত মহিলাটির ভাষাও আমার বুঝতে একটু দেরি হল। মোটামুটি তাঁর বক্তব্য বাংলায় তর্জমা করলে এটাই দাঁড়ায় যে আমি একটা মস্ত আহাম্মক। বাইরে চমৎকার সূর্যোদয় হচ্ছে, আদিগন্ত ভাসছে আলোর ঝর্ণায়, ডানদিকে চাইলে অনবদ্য নদীরূপ। আর আমি কিনা এসব ছেড়ে ঘুমোচ্ছি! দেখলাম বাসের অনেকের মতোই সুমন, স্বর্ণেন্দু, শঙ্খদারা হাসছে। আমিও স্মার্ট হবার একটা বোকা বোকা চেষ্টা করে বাইরের দিকে চেয়েছি।

শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু রবীন্দ্রনাথের 'নটীর পূজা'-র ফ্রেস্কো ছবি আঁকবার সময় লেখক কর্তৃক এক বান্ধবীকে এসে দেখবার জন্য নিমন্ত্রণ পত্রের এক জায়গায় লিখেছিলেন—

"সর্ব অঙ্গে জড়ায় যেন অলঙ্কারের জাল;—
তিলোত্তমা গড়েন নন্দলাল।
... ...
সাদামাটার রক্তবিহীন ঠোঁটে
লজ্জা সোহাগ ফোটে,
পাংশু দেওয়াল আনন্দে লাল নন্দলালের লালে
তুলির চুমো যেই না খেলো গালে।।"

বাইরে নন্দলাল বসুর মতোই কোনো এক মহান শিল্পী যেন মোটা মাঝারি নানা ব্রাশের তুলিতে আকাশের বুকে অনায়াসে ফুটিয়ে তুলছেন এক অনবদ্য ছবি। গোটা আকাশটাই যেন সেই শিল্পী-র ক্যানভাস। সিয়েনা, ক্রোম অরেঞ্জ-এ মাখামাখি সেই ক্যানভাসে নিউক্লিয়াস হয়ে বিরাজমান লাল টকটকে সূর্যদেব। পাশ দিয়ে প্রচণ্ডগতিতে বয়ে চলা খরস্রোতার জলে যেন ওই অকাল দোলোৎসবের প্রাণবন্ত মূর্চ্ছনা। জলের বুকে জোগে থাকা ফেনাময় রসসিক্ত বোল্ডার রাজ্য জুড়ে যেন সজীবতার আকণ্ঠ আবেগ। মাতাল করা সৌন্দর্য বলে না, এ যেন তাই। এক ক্ষুদ্র প্রাণের সাধ্যাতীত এই বর্ণনা। অবোধ শিশুর মতো অবোধ বিস্ময় নিয়ে চেয়ে থাকাই শ্রেয়। ইংরাজি প্রবাদ আছে না — "You do not paint a lily." ঠিক তাই।

আমার ঘুম ঘুম আবেগী চোখদুটো ছুঁয়েছে দেহাতী মাতৃসমার মুখ। ঘোমটার অল্প ফাঁক দিয়ে উনি হাসছেন আমার দিকে চেয়ে। আপন না হোক, সন্তানবৎ এক অপরিচিতকে প্রকৃতির এই আজব লীলাখেলা দেখাতে পেরে উনি যারপরনাই পরিতৃপ্ত। আমি কৃতজ্ঞতার হাসি ফেরত দিয়েছি। অসংখ্য বলিরেখা ভরা অনাবিল হাসিমুখটার দিকে চেয়ে মনে মনে বলেছি, তোমরাই আমাদের শতযন্ত্রণা ভোগ করে পৃথিবীতে নিয়ে আসো মা, তোমরাই পথ দেখাও। তোমাদের চোখ দিয়েই আমরা চিনতে শিখি অনিন্দ্য-কে। তোমাদের হাত ধরেই শেখা হাঁটি হাঁটি পা পা একদিন চেনে মরু, পাহাড়, জঙ্গল আর সাগরের সৌন্দর্য-কে। তোমাকে আমার আন্তরিক প্রণাম।

বাস থেমেছে। এসে গেছে হৃষিকেশ থেকে ৭৪ কিমি. দূরবর্তী দেবপ্রয়াগ।

পঞ্চকেদারের অন্যতম এই দেবপ্রয়াগের উচ্চতা ২৭২৩ ফুট। ভাগীরথী ও অলকানন্দার সঙ্গম স্থল। অবশ্য পুরাণ মতে বদ্রীনাথের কাছে মানা গ্রাম থেকে উৎপন্ন সরস্বতী নদীও এই দেবপ্রয়াগেই ভাগীরথী ও অলকানন্দার সঙ্গে মিশত। গিদ্ধাঞ্চল পর্বত, দশরথাঞ্চল পর্বত ও নরসিংহাঞ্চল পর্বত দিয়ে ঘেরা পঞ্চকেদারের অন্যতম এই প্রয়াগ হিন্দুদের এক পবিত্র তীর্থ। এখানে মাতা ভুবনেশ্বরীর মন্দির ও চন্দ্রবদনী মন্দির পূণ্যস্থান হিসেবেই পরিচিত।

বেশিক্ষণ অবশ্য বাস দাঁড়ায়নি এখানে। বদ্রীনাথ এখনও অনেক দুর। মোট রাস্তা ৩১০ কিমি:। ড্রাইভার ভদ্রলোক বেশ মেজাজি লোক। থেকে থেকেই দশাশই চেহারার সঙ্গে মানানসই হেঁড়ে গলায় কী সব অদ্ভুত গান ধরছেন। লিকলিকে হেল্পারটি আবার সোৎসাহে তালও দিচ্ছে বাসের বডিতে চাপড় দিয়ে। যেমনি সুর তার তেমনি তাল। এ বলে আমায় দ্যাখ তো ও বলে আমায়। অবশ্য সব মিলিয়ে সময় কেটে যাচ্ছে বেশ।

কিছুক্ষণের মধ্যে শ্রীনগর এসে গেল। দেবপ্রয়াগ থেকে দূরত্ব বেশি নয়। মাত্র ৩৪ কিমি.। বাস অবশ্য এখানেও বেশিক্ষণ দাঁড়ায়নি। সুমনের সঙ্গে জানলার ধারটা বদলে নিলাম। বাস গতি নিয়েছে। চলেছে রুদ্রপ্রয়াগের পথে।

বাস থেমেছে। হেল্পার ছেলেটি তেলবিহীন লালচে চুলে কায়দা করে হাত চালিয়ে বাস থেকে নামার আগে জানিয়ে গেল রুদ্রপ্রয়াগ এসে গেছে। শঙ্খদা আলমোড়া ভেঙে বলে উঠল— "ডাক্তার চল নীচে নামি।" সবাই নেমেছি। একটু হাত-পা ছাড়িয়ে নেওয়াও হবে আবার চা পানও হয়ে যাবে।

বিরক্তি প্রকাশ করেছে — "ধ্যুস বাঙালি যেখানেই যাবে, জ্যাম সঙ্গে নিয়েই যাবে।"

এই অবস্থায় বাসে বেশিক্ষণ বসে থাকা যায় না। নেমে পড়েছি। জ্যাম বরাবর হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে গেছি কিছুদূর। পুরো জায়গাটা ধ্বস আর লোক চলাচলের কারণে ধুলোর ধোঁয়ায় ভরপুর। আশেপাশের অঞ্চল থেকে লোকাল বাচ্চাগুলো মওকা পেয়ে চানাচুর, গাঁটিয়া যে যা পেয়েছে বিক্রি করতে আসরে নেমেছে। দু-পয়সা যা আসে আর কী। বাস মাঝে মধ্যে এগোচ্ছে। তবে তা শম্বুক গতিতে। বাসে ওঠার দরকারও পড়ছে না। হেঁটেই দিব্যি ধরে ফেলা যাচ্ছে। শঙ্খদাও এই সুযোগে প্রাণ ভরে দমপান করে যাচ্ছে বউদির শকুনি চোখকে ফাঁকি দিয়ে।

১০,৮০০ ফিটের বদ্রীনাথ টার্মিনাসে যখন বাসটা ঢুকছে ঘড়িতে তখন পাঁচটা বেজে তিরিশ মিনিট। পাহাড়ি পথে এতক্ষণের জার্নির ধকলের সঙ্গে বিস্তর ধুলোও, ফাউ হিসাবে লেগে রয়েছে আমাদের পোশাক আর চুলে। সূর্যের শেষ রাঙা আলো পড়েছে নর ও নারায়ণ পর্বতের মধ্যবর্তী ছোট্টো জনপদটার আনাচে কানাচে। চারদিক ঘেরা পাহাড়ের সারি, ব্যস্ত লোকজন, কোলাহল সবমিলিয়ে অন্যান্যবারের থেকে আলাদা কিছু মনে হল না। বাসের মাথা থেকে মালপত্র নামানোর পর চারটে স্যাফরণ কালারের ড্রাম একবার চেক্ করে নেওয়া গেল। দিব্যি আছে। বাগরী মার্কেট থেকে শঙ্খদা, সুমন আর আমার মার্কেটিং রীতিমতো সুপারহিট। ওগুলোর মধ্যেই আছে আমাদের আগামী পথের রসদ মায় ক্লাইম্বিং রোপ।

ভারতসেবাশ্রম সঙ্ঘের দোতলায় ডানদিকের পাঁচ নম্বর ঘরটায় ঘাঁটি গেড়েছি। সস্তা অথচ পুষ্টিকর। সন্ধের দিকে বিশু, স্বর্ণেন্দু আর আমি বেরিয়েছি বদ্রীনাথ মন্দিরের দিকে। বিশুর ডান পায়ের বুড়ো আঙুলের নখটা কলকাতাতেই প্রায় নব্বইভাগ উড়ে গেছে। বাকিটুকু একটা ন্যাকড়া দিয়ে জড়িয়ে রেখেছে। ওষুধপত্র খাওয়া ওর ধাতে পোশায় না। তবু জোর করে কিছু ওষুধপত্র গেলানো হয়েছে। মন্দিরের রাস্তায় একটা গরম জলের কুণ্ড পেয়ে ওতে পা-টা চুবিয়ে রাখতে বললাম। জল বেশ গরম। বেশিক্ষণ পা রাখা যাচ্ছে না। তবু সইয়ে সইয়ে বেশ কিছুক্ষণ রাখার পর ছেলেটা বেশ আরাম পেল। বিভিন্ন মিনারেলস মেশানো থাকায় ভারতবর্ষের নানা জায়গায় এইসব কুণ্ডের বেশ একটা ঔষধি

গুণ আছে। সমতলের মতো পাহাড়ি জনপদগুলোতে কথায় কথায় রাস্তার ধারে মেডিসিন শপ্ চোখে পড়ে না। এখানকার মানুষ পাহাড়ি জড়িবুটি, কুণ্ডের জল এসবেই দিব্যি কাজ চালিয়ে দেয়।

বদ্রীনাথ মন্দিরে থিকথিকে ভিড়। উঠোনটায় পা রাখা যাচ্ছে না। পুরো মন্দিরটার ভিতর আর বাইরে জুড়ে হাজার আলোর রোশনাই। স্বর্ণেন্দু গোঁড়া হিন্দু। সে কথা নিজে গর্বভরে প্রচারও করে। ও দেবদর্শন না করে ফিরবে না। অগত্যা আমাদেরও সামিল হতে হল। অবশ্য স্বর্ণেন্দুর ডিফেন্সের আই-ডি কার্ড থাকায় আমাদের সেভাবে লাইন দিতে হয়নি।

গর্ভমন্দিরের সামনে কাউকে দাঁড়াতে দেওয়া হচ্ছে না। ওই লাইন দিয়ে যেতে যেতেই দেখতে হবে। আমরা অবশ্য পাশের দরজা দিয়ে দেখেছি। দুদণ্ড সুস্থির হয়ে দাঁড়াতেও পেরেছি। কালো পাথরের প্রায় দু-ফুট উঁচু মূর্তি বদ্রীনাথের। যোগাসনে আসীন, হাত দুটো কোলের ওপর ন্যস্ত, পায়ে পদচিহ্ন। মাথায় জটা, গলায় উপবীত, ভৃগুপদ চিহ্নিত বিশাল বক্ষ, ক্ষীণ কটি, সৌম্যদর্শন নারায়ণ।

একটা সময় নাকি চতুর্ভুজ মূর্তি ছিল, অপর দুটো হাত থাকার নিদর্শন নাকি আছে। অন্তত বৈষ্ণবরা একথা বিশ্বাস করেন। কিন্তু শৈবরা বলেন এই মূর্তি তপস্যারত জটাধারী শিবের। জৈনরা তীর্থঙ্কর বলেন, আর বৌদ্ধরা মনে করেন যে এটি ধ্যানী বুদ্ধের মূর্তি, তিব্বত থেকে এই মূর্তি এনে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

ফেরার পথে টিমের বাকিদের সঙ্গে দেখা। যে যার মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। একসময় মালাইদার চা খেয়ে খোশমেজাজে সবাই ভারত সেবাশ্রমের পথ ধরেছি।

সবার আগে আগে নিজের মতো হাঁটছিলাম। সরু রাস্তায় ভিড়ের মধ্যে বাকীদের থেকে একসময় ছিটকে গেছি। কী মনে হল সেবাশ্রম-এর পথ না ধরে নেমে গেছি অলকানন্দার দিকে। কাদা জলের পিচ্ছিল পথ পেরিয়ে পৌঁছেছি খরস্রোতার কাছে। প্রচণ্ডগতিতে বোল্ডারে চাবুকের মতো আছড়ে পড়ে সরোষে বয়ে চলেছে মুক্তধারা। জলের গর্জন বুকে কাঁপন ধরায়। আলোকময় বদ্রীনাথ মন্দিরের ছায়া পড়েছে জলের বুকে। অস্থির সে ছায়া। আমারই মতো। এই নির্জনতায়, প্রায়ান্ধকারে সে অস্থিরতা আরও প্রকট। জানি বদ্রীনাথ মন্দিরের পিছনেই মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে গর্বোধ্বত মাউন্ট নীলকণ্ঠ। রাতের

অন্ধকারে দেখতে না পেলেও তাকে দেখেছি আমি মানসচক্ষে। কাল যে এক্সপেডিশানের প্রথম দিন। দিনের শেষে তাঁবু পড়বে নীলকণ্ঠর পাদদেশে। মজে যাওয়া নদীতে বেড়ে ওঠা চড়া-র মতো আমার শরীর মন জুড়ে গ্রাস করেছে অস্থিরতা। এই অস্থিরতাই আমার আগামী পথের রসদ। ক্লান্তি, খিদে, ঘুম সব বাধা তুচ্ছ করে যা আমাকে এগিয়ে দেবে ওই অসীমের আরও কাছে।

আজ সারা আকাশ জুড়ে সমর্পণের চাঁদ। সেই সর্বনাশা চাঁদের আলোয় সমস্ত বদ্রীনাথ ভেসে গেছে নোনতা জ্যোৎস্নার মেদুর অবসাদে।

প্রথম দিন

বহুদিন প্রেমে নেই, ইটে ও কংক্রিটে গেঁথে আছি
রাতে খুব ইচ্ছে হল, যাই,
পাহাড় পাড়ায় একটু ঘুরেটুরে আসি
দেখে আসি, এখনো আগরবাতি শালম্মি বাটীতে

প্রেম প্রেম গন্ধ ছাড়ে কি না
ঢুকে একটু শুঁকেটুঁকে আসি।

রাত্তিরে পাথর খুব হিমঘুমে থাকে।
পাকদণ্ডি বেয়ে উঠছি সন্তর্পণে শহুরে সিঁধেল ...
তন্ময় পাহাড় ভাবছে আমাকে অতিথি।

আমি খুব ফিসফিস, ঝরনা ... ঝরনা বলে ডাকি
গুল্মের বেড়ায় আস্তে আস্তে টোকা দিয়ে ডাকি।
সহসা পাগলি এক নিদ্রাহারা পাখি
হাহাকার করে উঠলো "নিয়ে গেলো! নিয়ে গেলো!" বলে।

অমনি টর্চের আলো পাহাড় চূড়োয়
জেগে উঠলো পূর্ণিমার তীব্র রিফ্লেক্টার!
রক্ষে নেই পর্বতের হাতে আমি ধরা পড়ে গেছি ...
জ্যোৎস্নায় হাসছে ঝরণা, প্রেম হাসছে, জল খিলখিল।

— কমলেশ পাল

জন মুরের "The mountains are calling and I must go" এবং জর্জ ম্যালোরির "Because it is there"... এই কোটেশন দুটো যতবার পড়েছি ততবার মনে হয়েছে দুটো কোটেশন একসঙ্গে জুড়ে দিলে বক্তব্যটা যেন আরও সম্পূর্ণতা পায়। ম্যালোরি আমার চিরকালীন হিরো। মানছি পরবর্তীকালে আরও অনেক পর্বতারোহী বায়োডাটায় নিঃসন্দেহে এগিয়ে। কিন্তু ওই যে — ট্রাজিক হিরো। সন্তানসম্ভবা স্ত্রী-কে বাড়িতে রেখে ১৯২৪ সালে সেই যে এভারেস্ট সামিটে বেরিয়ে গেলেন আর ফিরলেন না। বহু বছর বাদে ১৯৯৯ সালের ১ মে যখন মৃতদেহ উদ্ধার হল, আইডেন্টিফিকেশান্-এ এলেন সেই সন্তান যিনি বাবাকে দেখেছেন শুধুই ছবিতে। বাপ ছেলের সাক্ষাৎপর্বটুকু তো আরও রোমাঞ্চকর। ছেলের সামনে শায়িত মৃত বাবা তখনও আটকে আছেন যুবা বয়সে, ন্যাচারাল রেফ্রিজারেটর-এ থাকার কারণে পচন ধরেনি শরীরটাতে, অবিকল সেই যুবক ম্যালোরি। কিন্তু ছেলের বয়স সময়ের নিয়মে

বেড়েছে, মুখে বলিরেখার জাল আর চুলে রূপালি ঝলক। ভাবতেই গায়ে কাঁটা দেয়। ১৯৯৯ সালে এরিক সিমসন-এর নেতৃত্বে ম্যালোরি আর আরভিন-এর দেহ খোঁজার জন্য একদল অভিযাত্রী অভিযান চালান। কনরাড অ্যাঙ্কার খুঁজে পান ম্যালোরির দেহ। কিন্তু অনেক তল্লাসীর পরও ম্যালোরির সঙ্গী আরভিনের দেহ বা তাঁর কোডাক ক্যামেরা পাওয়া যায়নি। এই অভিযাত্রী দলকে কোডাক কোম্পানির তরফ থেকেও নানাভাবে সাহায্য করা হয়। কিন্তু ক্যামেরাটা না-পাওয়ার জন্য অনেক রহস্যই ইতিহাসের গর্ভে থেকে গেল। ক্যামেরার থেকে ফিল্মটা উদ্ধার করে ডেভেলপ করা গেলে কে বলতে পারে, এভারেস্ট জয়ের তারিখ এবং নায়কের নাম পালটে যেত কিনা!

কাকতালীয় হলেও ম্যালোরি এবং আরভিনের এভারেস্ট সামিটের ফাইনাল পুস্ এর দিনটাও ছিল ৮ জুন, আমার জন্মদিন।

মার্ক টোয়েনের সমসাময়িক জন মুর ছিলেন স্কটিশ বর্ণ একজন আমেরিকান প্রকৃতিবিদ এবং লেখক। ক্যালিফোর্নিয়ার সিয়েরা নেভাদা পর্বতাঞ্চলে তাঁর অ্যাডভেঞ্চার নিয়ে লেখা বইপত্র পাহাড়ি মহলে যথেষ্ট সমাদৃত।

এই দুই বিখ্যাত পাহাড়প্রেমীর সঙ্গে পানপাতিয়া হিমবাহ বা তার আশেপাশের অঞ্চলের কোনো সম্পর্ক নেই। দুজনের কেউই এইসব অঞ্চলে কোনো অভিযানেও আসেননি। আসলে ছোটো থেকেই পৃথিবীর বিভিন্ন ক্ষেত্রে খ্যাতনামা মানুষের নানা কোটেশান্ ডায়েরিতে লিখে রাখা আমার হবি। সময়ের সঙ্গে এসেছে পর্বত প্রেম এবং পর্বতারোহীদের কোটেশান। এই কোটেশানগুলো আজও আমার বিবর্ণ ডায়েরির পাতাগুলো খুলে যখন পড়ি তখন মনে হয়, হয়তো সাধারণের চোখে 'সৃষ্টিছাড়া' কিছু মানুষ, কী অদম্য উৎসাহ আর অতিমানবিক জেদকে সঙ্গী করে সাধারণ মাউন্টেনিয়ারিং গিয়ার, ইক্যুইপমেন্ট ও পোশাক আশাক সম্বল করে পাড়ি দিয়েছিলেন এক আদিম জগতে। যাদের ঝুলিতে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি, অতি প্রিয়জনের পিছুটান সব থাকা সত্ত্বেও মানসিক ও শারীরিক যন্ত্রণার উর্দ্ধে উঠে ছুঁতে চেয়েছেন অসীমের মাঝে দানা বেঁধে থাকা অন্তরাত্মার এক অতিগোপন সত্ত্বা-কে। একসময় জানলা দিয়ে বয়ে আসা হাওয়ায় ডায়েরির পাতা গেছে উলটে। আর এই ক্ষুদ্র আমি জানলার বাইরে দৃশ্যমান গাছ, পুকুর, ঘরবাড়ি, লোকজনের সীমানা পেরিয়ে পৌঁছে গেছি ওই কুয়াশা ঘেরা তুষার প্রান্তরে। যেখানে অভ্রলেহী তুষার কিরীট দের

সঙ্গে মেঘেদের সিরিয়াস বৈঠক চলে নিরন্তর, হাওয়াদের ডাকহরকরা নিমেষে খবর পৌঁছে দেয় দিগন্তব্যাপী কর্ডিলেরার ডাকবাক্সে, যেখানে মেঘেদের সি-থ্রু ওড়নার ঝাপসা আড়ালে কঠিন বরফে নান্দনিক জিওমেট্রি নিয়ে শুয়ে থাকে করাল ক্রিভাসেরা। এই অনন্ত উদারের নিষ্কলুষ এক নন্দনকানন আমাকে জুগিয়েছে প্রাণধারণের প্রয়োজনীয় কাঠিন্য, সৃষ্টিশীলতার প্রয়োজনীয় আবেগ, অচেনার পাশে দাঁড়ানোর সাহস আর সব পেরিয়ে খুব খারাপ সময়েও নিজেকে খুঁজে পাওয়ার গোপন রাজপথ।

"ধুস, নেটওয়ার্ক-ই নেই", ভারতসেবাশ্রমের একতলার উঠোনে পায়চারী করতে করতেই শঙ্খদা স্বগোক্তি করে উঠল। সবাই বুঝেছি বদ্রীনাথের পর থেকেই আর নেটওয়ার্ক পাওয়া যাবে না। তাই সকাল থেকেই ডাইনে, বাঁয়ে, ঈশান, নৈঋর্ত-এ সরে সরে গিয়ে নেটওয়ার্ক পাওয়ার আপ্রাণ যুদ্ধ চলেছে।

আজ ১১ জুন, সোমবার। আজই এক্সপেডিশানের প্রথম দিন। গতকাল রাত আটটায় নন্দাদেবী জাতীয় উদ্যানে প্রবেশের অনুমতিপত্র নিয়ে বদ্রীনাথ পৌঁছেছে গাইড উত্তরকাশীর মঙ্গল সিং, সঙ্গে সাতজন মালবাহক। বেশিরভাগই বাচ্চা ছেলে একজনই শুধু বয়স্ক। একঝলক দেখে মনে হল পাহাড়ি পথে এদের অভিজ্ঞতা খুব বেশি নয়। আমাদের থেকে পোর্টার চার্জ বাবদ মঙ্গল সিং সঠিক অর্থ নিলেও এদেরকে নিঃসন্দেহে ওই টাকা দেবে না। অভিজ্ঞ পোর্টার হলে যা অবশ্যই দিতে হত। আশঙ্কা সত্যি প্রমাণ হল যখন দেখলাম এদের কারোরই সঙ্গে স্নো গগলস তো দুরের কথা ন্যূনতম সানগ্লাসটুকুও নেই, যা বরফের পথে চলতে অবশ্যই লাগে। না হলে 'পার্শিয়াল ব্লাইন্ডনেস' অবশ্যম্ভাবী। তবে ছেলেগুলো বেশ ভালো। পাহাড়ি সরলতা ভরা মুখ আর লাজুক কথাবার্তায় শহুরে মানুষের সামনে অল্প হলেও জড়সড়।

যখনই পাহাড়ে গেছি, পোর্টার গাইডদের সঙ্গে দোস্তিটা জমিয়ে করার চেষ্টা করেছি। ভুল বললাম, চেষ্টা করতে হয় না, 'দোস্তি' আপনা থেকেই হয়ে যায়। ওটা আমার স্বাভাবিক চরিত্র। প্রকৃতির সঙ্গে অসম লড়াইয়ে আগামী কদিন এরাই আমাদের সহযোদ্ধা। সুতরাং এদের সঙ্গে প্রপার মেন্টাল টিউনিং না থাকলে এক্সপেডিশান বিষময় হতে দেরি হয় না। এডমন্ড হিলারি বুঝেছিলেন বলেই বলেছিলেন, "When I was climbing, I built up a close relationship with the sherpa people." অনেক নব্য পাহাড়ি-কে

দেখেছি ভাবতে যে এদের পয়সা দিচ্ছি তো মালবহন এর জন্যই। দোস্তির আবার কী দরকার? কিন্তু এই বুর্জোয়া মানসিকতা পরবর্তী সময়ে রুটে অসুবিধের কারণ ঘটালেও ঘটাতে পারে। আধো অন্ধকার ঘরে কম্বলের ওপর আয়েস করে বসে রাজু, সূরজ, মঙ্গল সিং এর সঙ্গে কিছুক্ষণ আড্ডা দিয়ে একসময় ফিরে এসেছি নিজের রুমে।

সকালে বেলা গড়াতেই মঙ্গল সিং আমাদের থেকে টাকা নিয়ে বদ্রীনাথ বাজারে গেছে পোর্টারদের জন্য সানগ্লাস কিনতে। আমরা তৈরি। স্যাক নামিয়ে এনেছি একতলার উঠোনে। মলয়দা মানে মলয় দেবনাথ যথারীতি নানা ক্যারিকেচার শুরু করেছে। ছোটবেলায় আনন্দমেলার পাতায় একটা জোকস পড়েছিলাম। একজন বিখ্যাত লন টেনিস প্লেয়ারের ছবি দেখিয়ে একজন ভদ্রলোক তাঁর ছেলেকে বলছেন, "এই দ্যাখ্, ইনি হচ্ছেন ইলি নাসতাসে"। হাস্যময় মুখের সেই ছবির দিকে তাকিয়ে ছেলে অবাক হয়ে উত্তর দিয়েছে, "সেকি বাবা! ইনি নাচতাসেন কোথায়? ইনি তো হাসতাসেন!" জোকসটির কথা উল্লেখ করলাম এই কারণেই যে মলয়দা এমন একটা মানুষ যে তাকালেই হাসি পায়। হাত পা নাড়া, কথা বলার ভঙ্গী সবকিছুতেই 'কমিক'-এর ছোঁয়া। এক্সপেডিশান সেরে হরিদ্বারমুখী পথে একদিন আমরা বিখ্যাত পক্ষীবিশারদ মিঃ নেগীর বাড়ি ছিলাম। সেখানে বারমুডা পরে, খালি গায়ে খাটের ওপর বসে, রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের গানের সঙ্গে মলয়দার লিপ মেলানো তৎসহ নানা বিদঘুটে অঙ্গসঞ্চালন, সলিলদা ভিডিয়ো ক্যামেরাবন্দী করে রেখেছিল। আজও ল্যাপটপে কখনও সখনও আমি তা চালিয়ে দেখি। রীতিমতো স্ট্রেস বাস্টার।

মঙ্গল সিং ফিরেছে। সঙ্গে মালবাহকেরা। ছেলেগুলো নতুন সানগ্লাস পরে দিব্যি হিরো হিরো হাবভাবে ঘুরছে। চারবার রোদচশমা খোলে তো দু-বার সেটা নিয়ে ঝাড়পোঁচ করে। তারপর কায়দা করে চোখে গলিয়ে, লাজুক জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকায়। ভাবখানা এমন যেন বলতে চাইছে, "দ্যাহেন তো কত্তা, কেমন মানাইছে?"

গ্রুপ ছবি তোলা হল ভারত সেবাশ্রম চত্বরেই। সকলেই বেশ কায়দা করে পোজ দিয়েছে। আফটার অল রুটের এটাই শেষ ছবি যেখানে মুখচোখটা ভদ্রস্থ লাগে। এরপর যত এগোব, সূর্যের অতি বেগুনি রশ্মি আর 'আইস

বার্ণ'-এর প্রভাবে চেহারা যা খোলতাই হবে তা তো কারো অজানা নয়। সাধে কি আর এক্সপেডিশানের প্রায় শেষপর্বে একদিন সকালে মঙ্গল সিং আমাকে বলেছিল "ডক্টর সাব, তুমকো তো বিলকুল বান্দর জ্যায়সা লাগ রাহা হ্যায়।" সেই শুনে বিশু আর স্বর্ণেন্দু যথারীতি হ্যা হ্যা করে হেসেছে।

বেলা গড়িয়েছে। একপ্রস্থ চা পানের পর স্যাক কাঁধে একে একে বেরিয়েছি পিছনের গেট দিয়ে। অলকানন্দার ধার ঘেঁষে, বদ্রীনাথ মন্দিরের সামনে দিয়ে বাঁক নিয়েছি বাঁ দিকে। পথের ধারে সবজির দোকান থেকে কয়েকদিনের রসদ হিসাবে কয়েকধরনের সবজিও কেনা হয়েছে। এবার ডানদিকে কয়েক ধাপ সিঁড়ি উঠে গিয়েই শুরু হয়েছে ঋষিগঙ্গা ভ্যালির এক অনিন্দ্যসুন্দর পথ। এক্সপেডিশান-এর শুরুয়াৎ। আকাশ অল্প মেঘলা। বদ্রীনাথ মন্দিরের উলটো দিকের পাহাড়ের মাথায় ধূসর মেঘের আনাগোনা। ঘড়িতে প্রায় সকাল ১০.৩০।

ঋষিগঙ্গা ভ্যালি যেন প্রকৃতির ছড়ানো বৈঠকখানা। সতোপন্থ ও ভাগীরথী হিমবাহ থেকে উৎপন্ন হওয়া ঋষিগঙ্গা বয়ে চলেছে বদ্রীনাথের দিকে, যেখানে তার অপেক্ষায় রয়েছে অলকানন্দা। গর্জের ডান দিক দিয়ে পথ ক্রমশ ওপরে উঠে গেছে মৃদুমন্দ ইনক্লাইনেশানে। পায়ের নীচে সবুজ ধূসর এর আঁকাবাঁকা জ্যামিতি আর দু-পাশে কালচে বাদামি পাহাড়ের গায়ে সাদা বরফের আলগোছে ব্রাশ আপ। মাথার ওপর আশ্চর্য নীল আকাশের সামিয়ানা চিরে অনন্ত অম্বরে দাঁড়িয়ে আছে ধ্যানী পাহাড়ের কুন্দশুভ্র কিরীটের দল। প্রতিটি দিগন্তের পরেই অন্য দিগন্তের প্রাণকাড়া ইশারা নিয়ে যখন পথ চলা শুরু হল তখন মন ছেয়ে আছে অসীম প্রকৃতির ইন্দ্রজালে। কিছু পরেই শুরু হল বৃষ্টি। কিছু পথ বৃষ্টির মধ্যেই চলার পর বাড়ল বৃষ্টির বেগ। থামতেই হল। আশ্রয় নিলাম প্রাকৃতিক গুহার মধ্যে এক সাধুবাবার ডেরায়। প্রায়ান্ধকার গুহায় সাধুবাবার বাস নানা দেবদেবীর মধ্যে। প্রদীপের আলোয় যতটুকু দেখা যায় তাতেই নজরে এল বাবার চেহারাটি রিতীমত শীর্ণ। ম্যালনুট্রিশানের লক্ষণ আর কী। জনমানবহীন অঞ্চলে কে আর রোজ কলাটা মুলোটা দিচ্ছে? ভীষণ চুপচাপ মানুষটা পদ্মাসনে বসে চেয়ে আছে সামনের দেবদেবীর ছবিগুলোর দিকে। আসলে বরাবরই আমার এই সাধুসন্তদের ব্যাপারে অ্যালার্জি আছে। কে যে আসল আর কে যে নকল, বোঝা বড়ো দায়। কেরিয়ার আর ফ্যামিলির ব্যারিয়ার গাঁজার দমে ফুঁকে দিয়ে কেন যে এদের এই জীবন বেছে নেওয়া তাও আমার কাছে পরিষ্কার নয়।

ভ্রামণিক জলধর সেনের মন্তব্য এ প্রসঙ্গে রীতিমতো রসগ্রাহী ও তাৎপর্যপূর্ণ। যেমন — "রাস্তাঘাটের সন্ন্যাসীদের নামেও অধিকাংশই আনন্দ। নামে আনন্দ আছে বটে কিন্তু তা তার কতটুকু ভোগে লাগে, সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ, শুধু চিনির বলদের মতো আনন্দের বোঝা ঘাড়ে করে বেড়ান মাত্র।" আবার মঠের মহান্তদের সম্পর্কে — "কোনো মঠের মহান্তকেই তো এ পর্যন্ত কাহিল দেখলাম না; মহাদেবের সেবাইত এবং ষণ্ড উভয়েই চিরকাল দিব্য সুগোল দেহ।"

আমার কলেজের বন্ধু মনীশ একবার বিজ্ঞের মতো বলেছিল, "শালা এ সব হচ্ছে পলায়নীবৃত্তি। বসে বসে খাবো, কোনো কাজও করব না, দায়িত্ব-ও নেব না।" কথাটা হয়তো ঠিক। তবে মণীশের এই নাস্তিক স্টেটমেন্টের পিছনে কারণটা অন্য। ওদের একান্নবর্তী ফ্যামিলিতে দেব, দ্বিজে, সাধু, সন্তে প্রগাঢ় ভক্তি বরাবর। বাড়িতে এক সাধু বছরে একবার আসতেন দু-একজন চেলা চামুণ্ডা সমেত। রীতিমতো উৎসব চলত তখন। এসব নিয়ে মণীশের কোনো প্রবলেম ছিল না। গেরুয়াবাবা ওর বাবার পয়সায় গাণ্ডেপিণ্ডে দু-বেলা ঘি পরমান্নতে ডুবে থাকতেন ক-দিন, তাতে আপত্তি নেই। গোল বাঁধত রাতে শোবার সময় সাধুবাবার পা টেপা নিয়ে। কাকিমার অগাধ বিশ্বাস ছিল এতে নাকি ছেলে গত জন্মের যে পাপগুলো এ জন্মে নিয়ে জন্মেছে, সেগুলো নির্ঘাৎ হাওয়া হয়ে যাবে। কিন্তু কাকিমা এটাও জানতেন না রাতে পা টেপার পরদিন কলেজে মণীশের সাধুবাবার প্রতি বাছা বাছা বেদবাক্য। মণীশ এখন উত্তর কোরিয়ার পাহাং-এ ল্যান্ডাগ্যান্ডা নিয়ে দিব্যি সুখে সংসার করছে। বোধহয় দাঁড়িপাল্লায় পাপের চেয়ে পুণ্যের দিকটাই ঝুলে আছে বেশি।

বৃষ্টি থেমেছে। আবার ধরেছি পাহাড়ি পাকদণ্ডি। স্যাঁতস্যাঁতে অল্প ঠান্ডা হাওয়ায় পথ চলতে মন্দ লাগছে না। রাস্তায় সলিলদা পথের পাশের কিছু গুল্মের দিকে দিকনির্দেশ করে ছোটোখাটো একটা বোটানি-র ক্লাস নিয়েছে। বোটানি আমার দুচক্ষের বিষ। ওইসব বিচ্ছিরি বোম্বাই মার্কা নাম মুখস্থ রাখতে একসময় প্রাণ বেরিয়ে গেছে। তবু সত্যি বলতে কী মন্দ লাগেনি। হিমালয়ের বুকে অনেককিছুই ভালো লাগে যা সমুদ্রতল থেকে সত্তর ফিট উচ্চতার কলকাতায় লাগে না। সলিলদা অনেকদিন ধরেই পাহাড়ের পাঠশালায় পড়াশুনো করছে। পাহাড়ের বুকে বেড়ে ওঠা গাছগাছলি সম্পর্কে মোটামুটি বেশ ভালোই জ্ঞান আছে দেখলাম।

একবার পিছন ফিরে তাকাতেই নজরে এল চোখের ওপর ভ্রু-র মতো, দুই পাহাড়ের সারির মাঝখানে কপালের টিপের মতো জেগে আছে ছোট্টো বদ্রীনাথ টাউন। ঋষিগঙ্গা ভ্যালি সদ্যস্নাতার এলানো চুলের মতো নেমে গেছে নীচে। ছুয়েছে বদ্রীনাথের মন্দির আর মাইক্রো ঘরবাড়ি। তারপর আবার পিছনের পাহাড়ের তুষারগাত্র ধরে উঠে গেছে, মিশে গেছে দিকচক্রবালে। যেখানে আকাশ নীল।

সামনেই চরণ পাদুকা। কথিত আছে এখানেই ভগবান বিষ্ণুর পায়ের ছাপ আছে। স্বর্ণেন্দু বাঁড়ুজ্যে গোঁড়া হিন্দু। ঈশ্বর বিশ্বাস বড়ো প্রবল। কলকাতা থেকে মাস নয়েকের ছেলের মাথার একগুচ্ছ চুল নিয়ে এসেছে। ঢেলে দিয়েছে চরণ পাদুকার পদপ্রান্তে।

পথ ক্রমশ ওপরে উঠছে। বৃষ্টি না হলেও আকাশের মনখারাপ কিন্তু কাটেনি। মিউনিসিপ্যালিটি বা কর্পোরেশন থেকে সাফাই কর্মীরা এসে যেমন মাঝেমধ্যে ব্লিচিং পাউডার ছড়ায় পাড়ায় পাড়ায়, অনেকটা সেরকমই হালকা বরফের প্যাচ চোখে পড়তে লাগল চলার পথে। রোদের দেখা নেই বেশ কিছুক্ষণ। ঠান্ডার প্রকোপও বাড়ছে। পথটা একসময় চওড়া হয়ে একটা প্রায় চ্যাটালো জায়গায় মিশল। সেখানে বেশ কিছুটা অঞ্চল ভারগ্লাস-এর ওপর দিয়ে যেতে হবে। অল্পস্বল্প স্লিপ করলেও সবাই মোটামুটি নিরাপদে জায়গাটা পেরিয়েছি। এবার কিছুটা ছড়ানো ছেটানো বোল্ডারের অঞ্চল। সবাই একমত। এবার একটু বসা যেতে পারে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে বোল্ডারে হেলান দিয়ে সবাই কোমরটা একটু ছাড়িয়েছি।

বদ্রীনাথের ব্যস্ততা থেকে এখন আমরা অনেক দূরে। চারদিক ঘিরে প্রকৃতির নিপাট সারল্য। পেরিয়ে আসা ৮ কিমি. রাস্তার প্রতিটি বাঁকে আমরা নিঃশব্দে ঢুকে পড়েছি প্রকৃতির খাস দরবারে। ধূলোহীন, ধোঁয়াহীন, শব্দহীন অঞ্চলটার প্রতিটি ভাঁজে ভাঁজে মিশে আছে অখণ্ড শান্তি আর অবোধ ভালোলাগা।

মঙ্গল সিং বলল আর একটু এগিয়েই আজকের ক্যাম্প করা যেতে পারে।

ডাউন হিল ট্রেক করে নেমে এসেছি ঋষিগঙ্গার ধারে। বোল্ডারের ফাঁক গলে অনায়াস চলন খরস্রোতার। আর ওই বোল্ডারে পা দিয়েই টপকে যেতে হবে জলধারার চাপল্য। একে পিছল বোল্ডার তার ওপর আইস প্যাচ। জায়গাটা

সাবধানে পেরোতে হবে। সলিলদা আর স্বর্ণেন্দু সাবধানেই পেরিয়েছে। নিরাপদেই পৌঁছেছে ওপারের পাথুরে জমিতে। এবার আমার পালা। যথারীতি কায়দা করে বড়ো বড়ো জাম্প-এ ক্রশ করতে গেছি। ফলাফল নদীর হিম সলিলে পদার্পণ। চট করে সামলে বোল্ডারে উঠে পড়লেও কপালে জুটেছে ভেজা জুতো আর সলিলদার অল্প বিরক্তি ভরা চাহনি।

—"খুব তাড়া ছিল?" আমি ওপারে পৌঁছতে সলিল দাশগুপ্তর কপট গাম্ভীর্যে ভরা রসিকতা।

একটা জুতসই জবাব প্রায় ঠোঁটের গোড়ায় চলে এসেছিল। গিলে নিয়েছি। একে এজেড মানুষ তার ওপর খুব কম দিনের পরিচিতি। সম্পর্কের রসায়নটা এখনও দানা বাঁধেনি। তাই 'মুখ টিপে হাসে মালবিকা' টাইপ একটা হাসিতেই উত্তরটা সীমাবদ্ধ রেখেছি।

টিমের লোকজন এখনও ঋষিগঙ্গার ক্ষীণ স্রোতটা ক্রশ করেনি। আমি পছন্দসই একটা বোল্ডার বেছে আয়েস করে বসেছি। স্বর্ণেন্দু প্রায় পাহাড়ি ভেড়াওয়ালাদের ভেড়া তাড়ানোর মতো একটা ভঙ্গিতে টিমের বাকিদের রিভার ক্রসিং-এর গাইডেন্স দিচ্ছে।

জায়গাটা কিন্তু দুর্দান্ত। পুরোটা না হলেও কিছুটা অ্যাম্পিথিয়েটার গোছের। অক্সফোর্ড ডিক্সানারির ভাষায়— "Level space with hills rising on all sides." সামনেই নীলকণ্ঠ পর্বত সটান দাঁড়িয়ে গর্বোদ্ধত ভঙ্গিতে। ঠিক এই সময়েই শেষ সূর্যের দেখা মিলেছে. খাপখোলা শাণিত তলোয়ার এর মতো ঝলসে উঠেছে নীলকণ্ঠর কুন্দশুভ্র অবয়ব। বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়েছিলাম। চোখ সরানো যাচ্ছিল না।

—"চলিয়ে ডক্টর সাব, থোড়া অউর যানা হ্যায়, নাজদিক", চমক ভাঙল মঙ্গল সিং এর ডাকে।

দেখলাম সবাই পেরিয়ে এসেছে ঋষিগঙ্গা। বুঝতেই পারছি, ওয়াটার সোর্স যখন আছে, কাছাকাছিই টেন্ট পিচ করা হবে।

টেন্টটা একেবারে যেন নীলকণ্ঠ পর্বতের পায়ের গোড়ায় পিচ করা হল। বদ্রীনাথ থেকে প্রায় ৯ কিমি এসেছি। জায়গাটার নাম দুমকল খড়ক। উচ্চতা ৩৭২৫ মিটার। একটা সমতল জায়গা বেছে চারটে ফোর মেন টেন্ট লাগানো হল। পাশ দিয়ে চড়ুই পাখির তুড়ুক তুড়ুক ভঙ্গিতে, কলকল শব্দে পাথরের

ধাপে ধাপে নেমে গেছে ঋষিগঙ্গা। খরস্রোতার বালিকা সুলভ চলনের প্রতিটি ভঙ্গিমায় যেন রবি কবির ওই স্পন্দিত ছন্দ—

উন্মাদিনী কল্লোলিনী
ক্ষুদ্র এক নির্ঝরিণী
শিলা হতে শিলান্তরে লুটিয়া লুটিয়া
ফেনময় মুক্তকেশে
প্রশান্ত হ্রদের কোলে পড়ে ঝাঁপাইয়া।

টেন্ট পিচ করতে করতেই দেখেছি অস্তরাগের আলো পড়েছে নীলকণ্ঠর চূড়োয়। সুমন টেন্ট এর আউটারটা সাইজ করে ইনারের উপর ফিট করতে করতেই বলল — "দ্যাখ ডাক্তার, মাথাটা ঠিক যেন শিবের মুখের মতোই লাগছে না।" সুমনের দৃষ্টিকে তারিফ না করে উপায় নেই। আসলে দৃষ্টি নয়, এগুলো অর্ন্তদৃষ্টি। প্রকৃতির 'ভারজিন বিউটি'-র সামনে দাঁড়ালে এই 'ইনার আই'-ই খুলে দেয় উপলব্ধির এক অন্য জগৎ, সত্বার আপন যাদুঘর। কাঁধে স্যাকের বোঝা নিয়ে পাহাড় ভাঙতে গেলে ক্লান্তিতো আসবেই। তার মধ্যেই অনুভব করতে হবে প্রকৃতির ভাণ্ডার। পাহাড়ি পথে হেঁটে বারবার মনে হয়েছে এই অনুভব অনেকটা কবিতার সম্যক উপলব্ধির মতো। শুধু সারি সারি শব্দবন্ধ পড়ে গেলাম তাতে তো আর কবিতার নির্যাসটা বোঝা যায় না সবসময়। একটা অর্ন্তদৃষ্টি, বোধ, সৃষ্টিশীল মনন দরকার। বোল্ডার, নদী, বুগিয়াল, তুষার অঞ্চল, ক্রিভাস, শৃঙ্গ এদেরও নিজস্ব ভাষা আছে। সেই ভাষা জানা থাকলে এদের সঙ্গে কথোপকথনটাও অনায়াস হয়ে যায়। সত্যিই, দিনের শেষ সোনালি আলোয় নীলকণ্ঠের চূড়োটি যেন পাশ থেকে দেখা জটাধারী শিবের মুখমণ্ডলের প্রতিকৃতি। বাকী নীলকণ্ঠ সূর্যের আলো থেকে বঞ্চিত হলেও চূড়োটুকু ঝলসে উঠেছে আভিজাত্যের পূর্ণ গরিমায়। সাধে কী আর বিখ্যাত পর্বত অভিযাত্রী ফ্রাঙ্ক স্মিথ এই নীলকণ্ঠের রূপে মুগ্ধ হয়ে নাম দেন — গাড়োয়ালের রানি!

ব্রাভো সুমন। চল আজ তোকে আনাতোলি বুকরিভ-এর পাশেই বসিয়ে দিলাম, যিনি তাঁর স্বত্তার গভীরে গিয়ে বলতে পারেন—

"Mountains are not stadiums where I satisfy my ambition to achieve, they are the cathedrals where I practice my religion."

সন্ধে নেমেছে। ঠান্ডা আরও জমাট বেঁধেছে। টেন্ট থেকেই নজরে এসেছে পোর্টার মহাদেব আর বলবীর আগুন জ্বালিয়ে হাত সেঁকছে। পাশেই তৈরি হচ্ছে রাত্রের খাবার। গুটিগুটি বেরিয়েছি তাঁবুর জিপার খুলে। মঙ্গল এর সানন্দ আহ্বান ভেসে এসেছে — "বৈঠ ডক্টর সাব"। বলবীর আগুনটা আর একটু উসকে দিয়েছে। দূর থেকে মোমবাতি জ্বলা চারটে টেন্ট যেন ট্রান্সপারেন্ট চারটে আলোকিত ইগলু। কাঠের আগুন থেকে মাঝেমধ্যেই ছিটকে উঠছে দুটো চারটে ফুলকি। আগুনের লালচে আভা পড়েছে সুমন, বলবীর, মহাবীরদের টাফ পাহাড়ি মুখগুলোতে। আগামী পথটুকু আমরা যাব অ্যাডভেঞ্চারের নেশায় আর ওরা যাবে নেহাৎই জীবিকার যন্ত্রণায়। হায় এ মহাজীবন!

চাঁদের আলো পড়েছে চারদিক ঘিরে সাদা হয়ে থাকা পাহাড়গুলোতে। বেশ কিছু মানুষ আশেপাশে, তবু কেমন এক নিথর নিস্তব্ধতা ঘিরে আছে চারপাশ। আকাশে হালকা মেঘ আছে। চাঁদের পূর্ণপ্রভা সেই মেঘজালে কিছুটা হলেও আটকে। সেই অস্পষ্ট আলোয় সাদা ধবধবে পাহাড়গুলো যেন এক একটা অশরীরি মূর্তি। সময় যেন থমকে আছে 'মুহূর্তে'। শুধুমাত্র পাশ দিয়ে বয়ে চলা ঋষিগঙ্গার উপস্থিতি পূর্ণমূর্ত, যৌবনের প্রবল উচ্ছ্বাসে।

— "কেয়া সোচ রহে হোঁ ডক্টর সাব", চমক ভাঙল মঙ্গলের ডাকে।

— "কাল কাঁহাসে যানা হ্যায়, রুট কিসতরফ?" অন্যমনস্কতা থেকে নিজেকে সামলে আমার বাস্তব প্রশ্ন।

বিকেলে পৌঁছেই চারপাশে চোখ বুলিয়ে খুঁজছিলাম আগামীকালের রাস্তা। মঙ্গলকে এখন সেটাই জানতে চাইলাম। মঙ্গল ওর গাড়োয়ালী হিন্দিতে অঙ্গুলিসঙ্কেত করেছে এক দিকে। অল্প আলোয় যতটুকু বুঝেছি প্রথমেই একটা বেশ লম্বা তুষারপ্রান্তর ট্র্যাভার্স করতে হবে। সেটা কতটা লম্বা তা এইখানে দাঁড়িয়ে বোঝা সম্ভব নয়। তবে পথ যে খুব সোজা নয় তা আমার মতো নভিশও বুঝল।

আমাদের টেন্টটায় সুমন, বিশু, আমি আর মলয়দা। রাতে শুয়ে মোমবাতি নিভিয়ে সবার শেষে স্লিপিং ব্যাগের জিপার টেনেছি। টেন্ট সিলিং-এ ঝোলানো সুমনের হেড টর্চ-ও একসময় অফ হয়ে গেছে। বিশুর মোবাইলে গান বেজে চলেছে —

ঋষিগঙ্গা ভ্যালি, দূরে বদ্রীনাথ

বোল্ডার পেরিয়ে গন্তব্যে

ধামলিং ধারে আমাদের সংসার

ধামলিং ধারে সকাল বেলা

ধামলিং ধার থেকে দেখা নন্দাদেবী পরিবার

দ্বিতীয় দিন

দুর থেকে দেখা মদমহেশ্বর
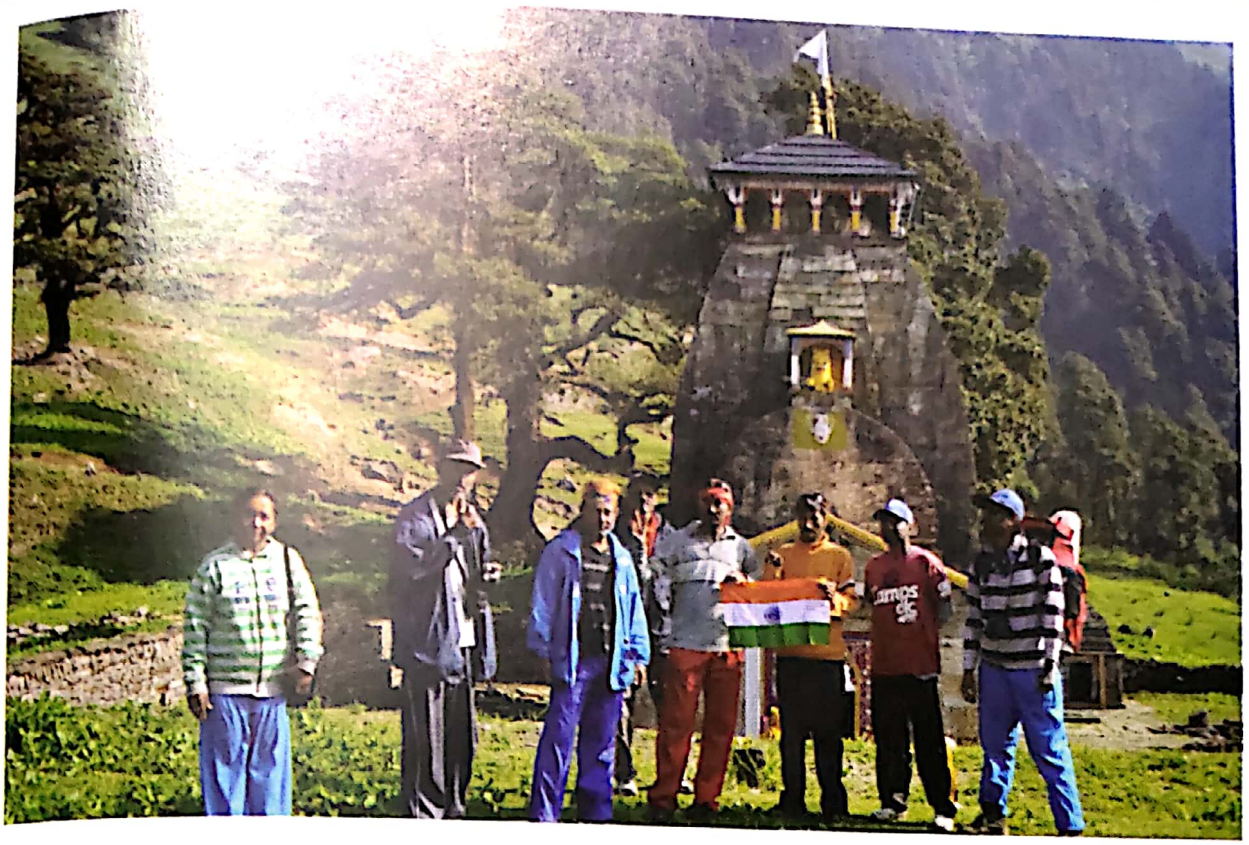
এক্সপিডিশনের শেষে মদমহেশ্বর মন্দিরের সামনে আমাদের টিম

মাউন্ট নীলকণ্ঠ

পানপাতিয়া উচ্চতুষার প্রান্তর

তুষারমৌলি এক অনন্তের পথে

আপার আইসফিল্ডের পথে

মাউন্ট চৌখাম্বারের সামনে আমাদের টেন্ট

পানপাতিয়া কল

পানপাতিয়া কল পেরিয়ে এসে অজানা হিমবাহে

নন্দাবারারি ধারের দিকে

"সারারাত জ্বলেছে নিবিড়, ধূসর নীলাভ এক তারা
তারি কিছু রঙ নাও তুমি..."

প্রত্যেক এক্সপেডিশানেই রাতে শোওয়ার পর বিশুর মোবাইল সুরেলা আবহ তৈরি করে। সত্তর আশির দশকের জনপ্রিয় হিন্দি অথবা এখনকার বাংলা। সারাদিনের পর বেশ রিল্যাক্সড লাগে।

একসময় গান থেমে গেছে। মলয়দার নাকডাকা ছাড়া চারদিক নিঃশব্দ নিঝুম। শুধু মাঝেমধ্যে অ্যাম্পিথিয়েটারের নিঃসঙ্গ হিম বাতাস তাঁবুর আউটারে তার চিরকালীন একাকিত্বের মৃদু অভিযোগ জানিয়ে গেছে। টেন্ট উইন্ডো দিয়ে দেখা যাচ্ছে একটু আবছা মাউন্ট নীলকণ্ঠর সাদা গাউন পরা উপস্থিতি। ঘুম আসেনি বেশ কিছুক্ষণ।

তাঁবুর জিপার টেনে বেরিয়েছি বাইরে। হিমেল পাহাড়ি হাওয়া অভ্যর্থনা জানিয়েছে আমায়।

বাইরে সমস্ত পার্বত্য আর উপত্যকা অঞ্চল জুড়ে যেন অভিসারে বেড়িয়েছে রূপোলি চাঁদের চন্দ্রপ্রভা। প্রভামুক্ত নয় ঋষিগঙ্গা-ও। প্রভালাবণ্যে লাবণ্যময়ী মদমত্তাও চলেছে তার নির্দিষ্ট অভিসারে, বদ্রীনাথের পথে, অপেক্ষারত অলকানন্দার বুকে। ওপরে আকাশের আদিগন্ত সামিয়ানা জুড়ে হীরের কুঁচির মতো ছড়িয়ে আছে জানা অজানা নানা তারার খেলাঘর। এ অপার্থিব সৌন্দর্যের বর্ণনা কলমের ডগায় আসে না। স্বযত্নে হৃদয়ের ওই কোর জায়গাটায় রেখে দেওয়াই শ্রেয়। মার্কিন মুলুকে প্রথমবার পা দেওয়ার পর নিউইয়র্কের শুল্ক দফতর খানাতল্লাশি করতে এলে অস্কার ওয়াইল্ড বলে বসেছিলেন — "আরে আমার মস্তিষ্কটা ছাড়া মূল্যবান আর কিছুই পাবেন না। আজ আমারও এই অনন্তের মাঝে দাঁড়িয়ে গলা চিরে বলতে ইচ্ছে করছে — "আরে আমার হৃদয়টা ছাড়া মূল্যবান আর কিছুই পাবেন না।"

আজ থেকে বহু বছর বাদে মাটির সেলারে বছরের পর বছর রেখে দেওয়া খানদানি হুইস্কির মতোই এই "মুহূর্ত মদ", স্মৃতির গেলাসে একটু একটু করে ঢেলে পরিবেশন করলেও রিমঝিম নেশা জাগবে — আমি নিশ্চিত।

টেন্ট-এর জিপার টেনে ভিতরে মাথা গলাবার আগে একবার চোখ তুলে দেখে নিয়েছি নীলকণ্ঠ-কে। তুষারাবৃত গ্রানাইট যেন নিঃশব্দে বিল টিলম্যান

এর ভাষায় আমাকে ডাকছে— "Just put on your boots & go." আমি নিঃশব্দে মাথা তুলে সায় দিয়েছি এ আহ্বানে।

ক্লান্তি ঘিরে তন্দ্রা নেমেছে দু-চোখের পাতা ভারী হয়ে। তাঁবুর ডান পাশ দিয়ে বয়ে চলা ঋষিগঙ্গার শীৎকার ক্রমশ অস্পষ্ট হয়েছে। কুয়াশার মতো ঘুম জড়িয়েছে আমায় আর তাকে ওম দিতে মননের খাঁজে খাঁজে উষ্ণতা ছড়িয়েছে আমারই কলম নিঃসৃত কিছু শব্দছন্দ—

নিঃশব্দের শব্দ মেখেছ গায়ে,
নিহিত ছায়ার চাদরে ঢেকেছ মন,
বরাভয় ছুঁয়ে ক্লান্তি মিশেছে ঘুমে,
অধোঘুম জুড়ে, শুধু—
'তুমি'-ময় বিচরণ।

দ্বিতীয় দিন

"ভালোবাসা ক্ষয়ে যায়,
ভালোবাসা স্মৃতি হয়ে যায়,
যারা ভালোবাসে, তারা—
স্মৃতির ভিতরে ঘরবাড়ি
এখনও বানাতে ভালোবাসে।"

— নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।

—"একবার তোমার সঙ্গে পাহাড়ে যেতে চাই, নিয়ে যাবে তো দাদা", তথাগত হঠাৎই আমাকে জড়িয়ে ধরে বলে উঠল।

১৮ মে ২০১৪, বাগবাজার গঙ্গার ঘাটে এক রবিবাসরীয় সন্ধ্যায়, আড্ডার শেষে যখন ফিরছি তখনই তথাগত-র এহেন আর্জি।

— "নিশ্চয়ই", আমি মন থেকে বলেছিলাম। পাশে দাঁড়িয়ে তখন হাসছে আর এক প্রকৃতিপ্রেমী বরুণ চট্টোপাধ্যায়।

তথাগত জানা। বদ্যিবাটীর বাসিন্দা। শ্যামবর্ণ, দোহারা, উজ্জ্বল চোখের আড্ডাবাজ ছেলেটা একটু অন্যধরনের। আসলে কিছু মানুষ হয় যাদের আলাদা করে কোনো দেখানেপনা থাকে না। যারা নিজেদের সরল, সুন্দর, স্বাভাবিক উপস্থিতিতেই নজর কাড়ে। তথাগত সেরকমই। আলাপটা ফেসবুক থেকে। ক্রমশ আলাপ পেরিয়ে পরিচয় মিশে গেছে নিখাদ বন্ধুত্বে। সম্পর্কটা ছিল দাদা ভাইয়ের মতো। আদ্যন্ত পাহাড় পাগল। নিজের একটা স্টুডিয়ো আছে। মনে আছে পানপাতিয়া এক্সপেডিশানের আগে নিজে যেচে বলেছিল—

— "দাদা আমার D90টা নিয়ে যাও"।

— "সে কি! ওটা তোমার প্রফেশনাল ক্যামেরা, জীবিকার সঙ্গে জড়িয়ে!" আমি অবাক হয়ে বলে উঠেছি।

— "ও আমি বুঝব, তুমি নিয়ে যাও। দীপঙ্কারদা (এভারেস্টার দীপঙ্কর ঘোষ) মাউন্ট শিবা সামিটে এই D90 টা নিয়েই গিয়েছিল। তুমি পানপাতিয়ার ছবি তুলবে, আমার ক্যামেরা ওখানে যাবে, এ তো আমার ভাগ্য দাদা।" আমাকে কনভিন্স করার চেষ্টা করেছে ছেলেটা।

আমি নিইনি। নিতে ভরসা হয়নি। যদি কোনো ক্ষতি হয় ওই দুর্গম পথে। ভরসা রেখেছি নিজের ফুজি প্রো-ডিস এস এল আর-এর ওপরেই। কিন্তু সেদিনই মন কেড়েছিল এক আবেগ প্রবণ উদার মানুষ। যে আমাকে তখনও সামনা সামনি দেখেনি, অথচ একটা অচেনা মানুষকে দিতে চেয়েছে তার পঞ্চাশ হাজারি ক্যামেরা। নিজে যেতে না পারলেও, ক্যামেরাটা যে পৌঁছে যাচ্ছে ওই অনন্তমার্গে, এতেই যেন তার মোক্ষলাভ।

আজও যাওয়া হয়নি একসঙ্গে। ওই বছরই সেপ্টেম্বর মাসে একটা মামুলি পাস ক্রশ করতে গিয়ে তুষারঝড়ে হারিয়ে গেল ছেলেটা। বডি আইডেন্টিফাই করা গিয়েছিল। কিন্তু আনা যায়নি। আনার মতো অবস্থাও ছিল না।

আজও কানে বাজে, "একবার তোমার সঙ্গে পাহাড়ে যেতে চাই, নিয়ে যাবে তো দাদা।"

উত্তুরে বাতাসের সঙ্গে দু-দণ্ড গপ্পো করতে নিশ্চিন্তে পাহাড়েই রয়ে গেল ছেলেটা। এ যেন এক পাহাড় পাগলের পাকাপাকি স্ববন্দোবস্ত। ডানপিটেদের জীবন এরকম নাটকীয় ভাবেই শেষ হয়। এরা কালবৈশাখীর মতো। হঠাৎই আসে, হঠাৎই যায়। জীবন বিস্তার হয়তো এদের ছোটো কিন্তু প্রাণ প্রাচুর্য বা প্রাবল্যে চেনা ছকের বাইরে।

শীর্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটা লেখায় পড়েছিলাম যে সুইজারল্যান্ডে জেরম্যাট নামের একটা জায়গা আছে। একসময় এটা ছিল আল্পস অভিযাত্রীদের বিশ্রাম এবং রসদ জোগাড়ের জন্য একটা ছোট্ট গ্রাম। আল্পসের বিখ্যাত ম্যাটারহর্ন শৃঙ্গ প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়েছে এই আধাশহরটার ওপর। এখানে একটা ছোট্টো কবরখানা আছে। ম্যাটারহর্ন জয় করতে গিয়ে যেসব পর্বতারোহীরা মারা গেছেন, তাঁরা বিশ্রাম নিচ্ছেন।

পরের অংশটুকু শীর্ষ-র জবানিতেই বলি — "সেখানে চোখে পড়েছিল একটা কবর। মাত্র ১৮ বছর বয়সে মারা গিয়েছিলেন সেই অভিযাত্রী। সাল তারিখ বলছে, খুব বেশি বছর আগে নয়। কবর ফলকের মাথায় ক্রুশকাঠের বদলে আটকে রাখা আইস অ্যাক্সের ইস্পাতের ফলাটা তখনও চকচকে। নজর সরাতে গিয়ে চোখে পড়ল পাশেই একটা কবর। এঁর নাম আলাদা। কিন্তু পদবি এক, মারা যাওয়ার তারিখটিও। এঁর বয়স ছিল ২৩। তা হলে কি দুই ভাই? কিন্তু এঁদের পিছনের কবরটা, সেখানে যিনি শায়িত আছেন, তাঁরও তো একই পদবি। কেবল মৃত্যুর দিনটা এঁদের দুজনের বছর দশেক আগে।

এক এক করে খুঁজে পেলাম একই পদবিধারী মোট সাতজনের কবর। তাঁদের বেঁচে থাকার সময়ের ফারাক দেখে বোঝা যাচ্ছে, একই পরিবারের তিনটি প্রজন্ম জুড়ে সাত-সাতজন মানুষের অকালমৃত্যু হয়েছে, দুর্জয় ম্যাটারহর্নকে চ্যালেঞ্জ জানাতে গিয়ে।

তারপর অনেকক্ষণ আনমনা, উদ্দেশ্যহীন ঘুরে বেরিয়েছিলাম জেরম্যাটের রাস্তায় আর ভেবেছিলাম হতভাগ্য ওই পরিবারটির কথা। সাতজন কাছের মানুষকে যাঁরা ছেড়ে গিয়েছেন ওই কবরখানায়। এমন হতেই পারে, ওঁদের পরিবারে আর কোনো সমর্থ পুরুষ জীবিত নেই। জীবন যদিও থেমে থাকে না,

কিন্তু ওঁরা কি কখনও আসেন প্রয়াত প্রিয়জনদের কবরে ফুল দিতে? না কি শোকের সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতিও দুর্বল হয়েছে?"

এভাবেই কত স্মৃতি আর গল্প লেগে থাকে হিমালয়ের গ্রানাইট কিংবা কারাকোরাম বা আল্পসের দুর্ভেদ্য তুষার জ্যামিতিতে। ম্যালোরি থেকে নাওমি উয়েমুরা, ছন্দা গায়েন থেকে তথাগত জানা, সর্বজিৎ সাধু খাঁ থেকে এই পানপাতিয়ার বুকে হারিয়ে যাওয়া রণজিৎ লাহিড়ী, অরুণ ঘোষ। তালিকাটা আরও অনেক অনেক বড়ো। আর তার থেকেও বড়ো আমাদের মতো পর্বতপিপাসু মানুষদের স্মৃতির বৈঠকখানা। যেখানে আমরা স্বযত্নে সাজিয়ে রাখি তাঁদের, জমতে দিই না এককণা ধুলোও। বৈঠকখানাটা যে ভালোবাসার বারান্দা দিয়ে ঘেরা, যেখানে প্রত্যহ পড়ে হিমালয়ের নিষ্কলুষ রোদ্দুর। সভ্যতার 'পলিউটেড রং' এর প্রবেশ যেখানে একান্ত নিষিদ্ধ।

কয়েকমুহূর্ত সময় লাগল বুঝতে যে কোথায় রয়েছি। তাঁবুর নেটের জানলা দিয়ে ছিটকে আসা হালকা আলোর পলিগোনাল বিম-এ চোখ সয়ে যেতে, ডানপাশ ফিরে দেখি সবাই তখনও ঘুমোচ্ছে। নিশ্বাসের ভারী শব্দে তাঁবুর বাতাসও যেন ভারী হয়ে আছে। জানি বাইরে নীলকণ্ঠ ওয়েট করছে। তবু কেন জানি না ইচ্ছে হয়নি বেরোতে। অদেখার সুখও মাঝেমধ্যে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করার মধ্যে বেশ একটা মজা আছে। গত রাতে মাউন্ট নীলকণ্ঠর সঙ্গে অভিসারের শৃঙ্গার মুহূর্ত এখনও আচ্ছন্ন করে রেখেছে আমায়। স্লিপিং ব্যাগের চেনটা কিছুটা নামিয়ে চোখ বুজে শুয়ে থেকেছি আরও কিছুক্ষণ। আজ ১২ জুন মঙ্গলবার। হাতঘড়ি বলছে এখন সকাল ৬টা ৩ মিনিট। থেকে থেকেই তাঁবুর নাইলন ফ্যাব্রিক হাওয়ার ধাক্কায় কেঁপে কেঁপে উঠছে। বাইরে মঙ্গল সিং-এর ভারী কোফলাস' এর আওয়াজ উঠেছে পাথুরে রুক্ষ জমির ওপর। গাড়োয়ালী টিপিক্যাল হিন্দিতে ও পোর্টারদের ডাকাডাকি শুরু করেছে। জানি আর কিছুক্ষণ বাদেই চা আসবে। আমি স্লিপিং ব্যাগের ওম নিতে চেয়েছি আরও কিছুটা সময়। তাঁবুর পাশ দিয়ে সংশব্দে বয়ে গেছে নির্ঝরিণী — ঋষিগঙ্গা।

কিছুক্ষণ ধরেই স্টোভের গোঁ গোঁ আওয়াজ কানে আসছে। টেন্টের ভেতর বাকীদের নড়াচড়াও শুরু হয়েছে খানিক আগেই। সুমন অলরেডি স্যাক গোছাতে শুরু করে দিয়েছে। সুমনবাবুর স্যাক গোছানোটা বেশ ইন্টারেস্টিং। প্রত্যেকদিনই

স্যাক থেকে প্রায় সব জিনিসপত্র বার করে আবার ঢোকায়। শুরু করে সবার প্রথমে, শেষ করে সবার শেযে। বিশু আবার সবার শেযে শুরু করলেও চটপট গুছিয়ে ফেলে। বিভিন্ন মানুষ, বিভিন্ন চরিত্র। তাদের কাছ থেকে দেখা, বোঝা পাহাড়ের পথে মনুষ্য জীবনের অভিজ্ঞতার ঝুলি নানাভাবে পুরণ করে। সুমনের স্যাক গোছানোর ঠ্যালায় আমি আধশোয়া হয়েছি কিছুটা কাত হয়ে। আজ আমাকেও আলিস্যিতে ধরেছে।

— "চায়ে লিজিয়ে", মঙ্গল সিং-এর গলার আওয়াজ পাশে শঙ্খদাদের তাঁবুর কাছে।

সুমন আমাদের টেন্টের জিপার টেনেছে। সঙ্গে সঙ্গেই সকালের একমুঠো টাটকা তাজা হাওয়া হুইহুই করে ঢুকে এসেছে ভেতরে। বাইরেটা একঝলক দেখলেই মনটা আপনা থেকেই খুশি হয়ে যায়। পাথরে, পাহাড়ে ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত তুষার প্রলেপ। নীল সামিয়ানা জুড়ে দুধ সাদা মেঘের স্বতঃস্ফূর্ত মিছিল। আর পাথুরে জমিতে বিক্ষিপ্ত হলেও ধূসর ও সবুজ মেশানো ঘাসের 'আই রিলিফ'।

বিশুকে কোনোবারই সকালে চা না এলে ওঠানো যায় না। প্রথমত আমরা ভদ্রভাবেই ডেকে থাকি। কিন্তু হতভাগা সেই মটকা মেরেই পড়ে থাকবে আর নতুন কনের মতো সোহাগী স্বরে উম্ উম্ আওয়াজ করবে। খুব স্বাভাবিক ভাবেই পাবলিকের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে। শেষমেষ রীতিমতো ধাক্কাধাক্কি, স্লিপিং ব্যাগের চেন খুলে দেওয়া, এইরকম নানাবিধ মুষ্টিযোগ চলতে থাকে। এত কিছুর পর অবশ্য একটাই কাজ হয়। বাপধন একটু পাশ ফিরে শোয়। তবে এই শালগ্রাম শিলাই চায়ের গন্ধে স্প্রিং-এর মতো উঠে পড়ে। আজকেও উঠেছে।

আমার গোছগাছ কমপ্লিট। জুতো গলিয়ে বাইরে এসে স্যাকের পিছনে আড়াআড়ি স্লিপিং ম্যাট্রেসটা বাঁধতে বাঁধতেই তাকিয়েছি নীলকণ্ঠর দিকে। ভোরের আলোয় সাদা তুষারে মোড়া ধ্যানগম্ভীর মূর্তি। ভালো লাগাটা যদিও ব্যক্তিগত, তবুও মাউন্ট নীলকণ্ঠের প্রেমে পাগল ফ্রাঙ্ক স্মিথ বোধহয় কিছু ভুল বলেননি— "Second only to Siniolchu in Himalayan beauty."

যাঁরা তথ্য, পরিসংখ্যান এবং ভৌগলিক ব্যাপার স্যাপার সম্পর্কে আগ্রহী তাঁদের জন্য কিছু তথ্য দিয়ে রাখি। ৬৫৯৬ মিটার বা ২১,৬৪০ ফুটের এই

রাজকীয় পর্বতের প্রমিনেন্স ১২০০ মিটার বা ৩৯০০ ফুট। গাড়ওয়াল হিমালয়ে ৩০° ৪৩' ১২" উত্তর ও ৭৯° ২৪' ০০" পূর্বে এর অবস্থান। প্রথম সামিট করেন সোনম পুলজর, ১৯৭৪ সালের ৩ জুন। সঙ্গী ছিলেন কানহাইয়ালাল, দিলীপ সিং ও নিমা দোরজে। নীলকণ্ঠর উত্তর পশ্চিম দিকে বিরাজমান সতপন্থ গ্লেসিয়ার আর আমাদের গন্তব্য পানপাতিয়া গ্লেসিয়ার শুয়ে আছে নীলকণ্ঠর দক্ষিণ পশ্চিমে। পিক এর আরও পশ্চিমে বহুখ্যাত গঙ্গোত্রী গ্লেসিয়ার।

মঙ্গল সিং আমাদের এগোতে বলেছে। সাদা রঙের কিচেন টেন্টটা এখনো প্যাক করা হয়নি ভিজে থাকার দরুণ। টেন্টটা যেহেতু ক্যানভাসের এই অসুবিধাটা সারা এক্সপেডিশানেই আমাদের সঙ্গী হবে, বোঝাই যাচ্ছে। ভিডিয়োগ্রাফি-র দায়িত্বটা প্রত্যেকবারই স্বেচ্ছায় কাঁধে তুলে নেয় দলনেতা বিশু। ওর ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে সুমন যখন বাইট দিচ্ছে ঘড়িতে তখন ৮টা বেজে ৫ মিনিট। স্বর্ণেন্দু সুমনের বাইট প্রসঙ্গে ফুট কেটেছে, "উফ্, পুরো উত্তমকুমারের মতো ডায়ালগ দিচ্ছিস। কি বলো মলয়দা?" মলয়দা চলা শুরু করে স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে উত্তর দিয়েছে, "ফলো মি"।

বদ্রীনাথ মন্দিরের পশ্চিমে নারায়ণ পর্বত (৫৯৬৫ মিটার) এবং উর্বশী পর্বতের মধ্যবর্তী এই ঋষিগঙ্গা উপত্যকা ধরে আজকে আমরা এগিয়ে যাব নীলকণ্ঠের দক্ষিণ পূর্ব গিরিশিরার ওপর অবস্থিত হোল্ডসওয়ার্থ পাস বা নীলকণ্ঠ খালের দিকে।

নীলকণ্ঠকে কোনাকুনি ডানদিকে রেখে ঋষিগঙ্গার ডানতীর ধরে ওপরে ওঠা শুরু হয়েছে। প্রথমে পাথুরে ঘাসজমির ব্যালকনিটা পেরিয়ে বাঁ দিক বরাবর উঠে যাওয়া আইস প্যাচটার সামনে দাঁড়িয়েছি আমরা। প্যাচটা ক্রশ করতে গিয়ে দিন শুরুর প্রাথমিক জড়তায় দু-একজন হালকা স্লিপ করেছে। উল্লেখযোগ্য কিছু নয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই বডি ওয়ার্ম হলেই চলা স্বাভাবিক হবে, নিশ্চিত। প্যাচটা পেরিয়ে আবার কিছুটা ঘাস আর বোল্ডার মেশানো জমি। এখান থেকে আমাদের গতকালের শিবির পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। বলবীর আর মহাদেব কিচেন টেন্ট খুলে প্যাক করতেও শুরু করেছে। কিছুটা ওপরে উঠে আসার দরুণ গতকালের পথের অনেকটাই উন্মুক্ত। ভীষণ ফটোজেনিক লাগছে আমাদের ফার্স্ট ক্যাম্প স্পট। দাঁড়িয়ে দু-একটা ছবি তুললাম। এবার বরফের হাম্পটা ক্রশ করতে হবে। গতকাল এই হাম্প অবধি ক্যাম্প থেকে দেখা গিয়েছিল।

এরপরের পথ এখনও অদৃশ্য।

হাম্প-এর ওপরটায় উঠে নজরে এল সামনে অর্থাৎ পশ্চিমদিকে তুষার ঢাকা এক বিস্তীর্ণ ঢাল। যেটা এখন আমাদের ট্রাভার্স করতে হবে। আমাদের ঠিক বাঁদিকের উঁচু পাহাড়টার মাথা থেকে ঢালটা ডানদিকে গড়িয়ে নেমে গেছে সেই কোন নীচে, ক্রিভাসদীর্ণ এক ভয়ংকর সুন্দর অঞ্চলে। ওপর থেকে দেখা জলবিভাজিকার মতো ছড়িয়ে থাকা বরফ ফাটলের বেহিসাবী বিস্তার, কিঞ্চিৎ হৃদকম্পন বাড়িয়ে দেয় বইকি। রোপ আপ করা হয়নি। এক্সপেডিশানের বেশির ভাগ জায়গাতেই মঙ্গল রোপ ফিক্স করেনি। এমনকি পানপাতিয়া কল থেকে নামার সময়ও না। অথচ আমাদের পূর্ববর্তী বছরের প্রত্যেকটা টিমের ছবিতে দেখেছি রোপ আপ-এ রয়েছে টিম মেম্বারেরা।

মঙ্গল স্টার্ট করেছে, স্বর্ণেন্দু আর সুমন পিছনে। আমি একটু ওয়েট করেছি। প্রায় ৫০-৫৫ ডিগ্রি ঢালে শরীর এমনিই ডান দিকে হেলে যাবে গ্র্যাভিটেশনের নিয়মে। তাই চেয়েছি আগে কয়েকটা ফুট স্টেপ পড়ুক। তাহলে পা রাখা তুলনামূলক সহজ হবে। মঙ্গলের পাহাড়ি পা, সেই পায়ে কোফলাস আর হাতে আইস অ্যাক্স, সব মিলিয়ে ও মোটামুটি সহজ ভাবেই এগিয়েছে। পা দেবার আগে দেখে নিয়েছি, আমার আন্দাজমতো প্রায় ৬০০-৬৫০ ফুটের লম্বা অঞ্চলটায়, ১৫০-২০০ ফুট দুরত্বে কিছু কিছু বোল্ডার জেগে আছে। ধরেই নিয়েছি বোল্ডার টু বোল্ডার ওই ১৫০-২০০ ফুট দূরত্ব খুব একটা থামা যাবে না। কারণ একে ঢালের ওপর আড়াআড়ি যাচ্ছি তার ওপর ৯টা বেজে গেছে। সূর্যের তাপে বরফের ওপরের স্তর গলতে শুরু করেছে। মাঝপথে থামলে হড়কে যাওয়া অবধারিত। আর একবার হড়কালে নীচে আমাকে লোপ্পা ক্যাচের মতো লুফে নেওয়ার জন্য ক্রিভাস তো ফিল্ডিং করছেই। সাবধানে ফার্স্ট স্টেপটা রেখেছি বরফের বুকে। জানি প্রথম কয়েকটা স্টেপ ঠিকঠাক পেরোলেই কনফিডেন্সটা পেয়ে যাব। ক্রমাগত লেফট ফুটের ল্যাটারাল আর রাইট ফুটের মিডিয়াল পোর্সান দিয়ে লেফট সাইডে অর্থাৎ ঢালের উলটো দিকে কিক্ করতে করতে এগিয়ে চলেছি। যত এগিয়েছি তত বুঝেছি রোপ আপটা দরকার ছিল।

হঠাৎ পিছন থেকে একটা কানফাটানো বীভৎস চিৎকার ভেসে এল।

নর্মাল রিফ্লেক্সে ঘাড় ঘুরেছে পিছনে, সঙ্গে কোমরের নীচ থেকে পেলভিক গার্ডেলটাও। স্বাভাবিক ভাবেই শরীর হেলে গেছে ডানদিকে। সজোরে বাঁ পা

গেঁথে দিয়েছি নরম তুষারের বুকে। আলতো করে শরীর বাঁ দিকে হেলিয়ে একটা মোটামুটি ভারসাম্য রাখার চেষ্টা করেছি। যা দেখেছি তা নিঃশংসয়াতীত ভাবে ভয় জাগানো। পোর্টার রাজু পা স্লিপ করে গড়িয়ে চলে যাচ্ছে ডানদিকে নীচে ক্রিভাস অঞ্চলটার দিকে, প্রচণ্ড গতিতে। ভয় পেয়ে ছেলেটা যেন সেল্ফ অ্যারেস্ট করতেও ভুলে গেছে। এলোপাথাড়ি হাত পা চালাচ্ছে কিন্তু একটা কিক্ ও গাঁথছে না ঠিকমতো। ওর শরীরের ধাক্কায় ধ্বসে যাওয়া বরফের মাঝে ওকে প্রায় দেখাই যাচ্ছে না। কয়েকমুহূর্ত ঘটনার আকস্মিকতায় কারোরই রিফ্লেক্স কাজ করেনি। সম্বিত ফিরতেই রাজুর দাদা মহাবীর আইস অ্যাক্সটা নিয়ে গ্লিসেইড করতে শুরু করেছে। দেখতে পাচ্ছি মহাবীর যত না গ্লিসেইড করতে তার চেয়ে বেশি তালগোল পাকিয়ে নামছে। উত্তেজনায় ওরও শরীরে ভারসাম্য থাকছে না।

প্রায় ২৫০ ফুট নীচে রাজু আটকেছে একটা জেগে থাকা বোল্ডারে। বোল্ডারটা আঁকড়ে ও কাত হয়ে একটা অদ্ভুত ভঙ্গিমায় শুয়ে আছে। মহাবীর যখন পৌঁছেছে রাজুর তখন ওঠার ক্ষমতা নেই। বুঝতে পারছি আঘাতটা যতটা শারীরিক তার চেয়ে বেশি মানসিক। আর কিছুটা হড়কে গেলেই ও গিয়ে পড়ত ক্রিভাস-এর মধ্যে। মৃত্যুর কয়েক ফুট দুর থেকে আবার জীবনের পথে ফিরে আসার মাঝের মুহূর্তটুকু ও বাকি জীবনে ভুলতে পারবে না। মঙ্গল তেড়ে গালাগাল শুরু করেছে। ও বুঝেছে রোপ আপটা কতটা জরুরি ছিল। কিন্তু নিজের ব্যর্থতা ঢাকতে ও এখন 'অফেন্স ইস দা বেস্ট ডিফেন্স'-এর পথ নিয়েছে। ঢাল বেয়ে ভাইকে হিঁচড়ে টেনে আনছে মহাবীর। মূক ও বধির ফরসা ফুটফুটে ছেলেটাকে একসময় এনে ফেলেছে আমাদের কাছে। রাজুর মুখটা ভয়ে রক্তশূন্য। ওই ঢালেই বরফ খামচে বসে পড়েছে ছেলেটা। মহাবীর ওর পিছনে গার্ড করেছে। হাইপোভলেমিক শক্-এ ছেলেটার যে কার্ডিয়াক অ্যাটাক হয়নি, এই রক্ষে। পাহাড়ি পথে এরকম উদাহরণ প্রচুর আছে।

মঙ্গল সিং আবার কিছু বলেছে বিকৃত চোখে মুখে। এবার মহাবীর হাঁফাতে হাঁফাতেই পালটা লড়ে গেছে। বাকি এক্সপিডিশান-এ মঙ্গল-মহাবীর রসায়নটা আর একদমই দানা বাঁধেনি। আমি আর ওয়েট করিনি। ঢালে এক জায়গায় আর দাঁড়ানো যাচ্ছে না বেশিক্ষণ। কিক্ করেছি তুষারের বুকে, মনে বিরক্তি চেপেই।

প্রায় তিন চতুর্থাংশ যাওয়ার পর একটা বোল্ডার পেয়ে উঠে দাঁড়িয়েছি তার ওপর। ক্রমাগত সাইড কিক্ করতে করতে পায়ের পেশীগুলো অসাড় লাগছে। হালকা দু-একটা স্ট্রেচিং করেছি, পায়ের পেশিতে জমে যাওয়া ল্যাকটিক অ্যাসিড সরানোর জন্য। একটা ভুল করেছি গ্যেইটার টা না পড়ে। অ্যাডিডাস-এর ট্রাকস্যুটের লোয়ারটা শুকোতে যদিও সময় লাগবে না তবু পরে নেওয়াটা উচিত ছিল। এখন বোল্ডারে দাঁড়িয়ে গেইট্যার পড়াটা রিস্কি। সুতরাং চিন্তাটা ভাবনার পর্যায়েই রয়ে গেল।

৩৬০ ডিগ্রি জুড়ে প্রকৃতির অনবদ্য রূপের পসরা শরীরের ক্লান্তি ভুলিয়ে দেবার জন্য যথেষ্ট। সূর্যের তাপ বেড়েছে। বরফে প্রতিফলিত হয়ে সান বিম্ ধাক্কা দিচ্ছে চোখে। সানগ্লাস খোলা যাচ্ছে না। এসমস্ত অঞ্চলে যদিও স্নো-গগলস পড়াটাই যুক্তিযুক্ত, কিন্তু আমার তা নেই। কাজ চালিয়ে নিচ্ছি ফাস্টট্রাকের সানগ্লাসেই, তাও আবার ধার করা। পোর্টাররা আইস অ্যাক্সে নিজেদের জন্য স্টেপ কেটে নিচ্ছে। মঙ্গল বউদিকে পার করাচ্ছে সাবধানতার সঙ্গেই। স্বর্ণেন্দুর সঙ্গে আমি আবার নেমেছি তুষারে, বাকি পথটুকু পেরিয়ে যাবার জন্য।

এবার ঢুকে পড়েছি ল্যাটারাল মোরেনের একটা বড়ো অঞ্চলে। যতদুর চোখ যায় শুধু রুক্ষ মোরেনের বিধ্বংসী তরঙ্গ। ক্রিভাস অঞ্চল এবার বাঁ দিকে। এই অঞ্চলটাও যথেষ্ট ক্লান্তিকর। বোঝাই যাচ্ছে লোকজন ক্রমশ ক্লান্ত হয়ে পড়ছে। স্বর্ণেন্দু ক্রিভাসের কাছাকাছি একটু সহজ জায়গা দিয়ে পেরোনোর চেষ্টা করছে। কিন্তু আমার মনে হয়েছে জায়গাটা রিস্কি। আমি একটু ওপরের তুলনায় কঠিন পথটাই বেছে নিয়েছি। একসময় মোরেন যেখানে প্রায় শেষ সেখানে সবাই একটু রেস্ট নিয়েছি। মাথায় যন্ত্রণা শুরু হয়েছে। জল ছাড়া মুখে কিছু দিতেও ইচ্ছে করছে না। আসলে ওই তুষার ঢাল ক্রশ করাটাই অনেকটা এনার্জি ক্ষইয়ে দিয়েছে। সঙ্গে রাজুর গড়িয়ে পড়ার মানসিক চাপটা তো আছেই।

দেখতে পাচ্ছি মোরেন অঞ্চল যেখানে শেষ, সেখান থেকে কোণাকুনি একটা তুষার ক্ষেত্র গিয়ে মিশেছে প্রায় ১০০০ ফুট মতো চড়াইয়ের পাদদেশে। চড়াইটা যেন প্রায় আকাশে গিয়ে মিশেছে। ইনক্লাইনেশন এখান থেকে যা মনে হচ্ছে আন্দাজ ৫০-৫৫ ডিগ্রি।

নেমে এসেছি তুষারক্ষেত্রের দক্ষিণদিকে। পুরো অঞ্চলটা ক্রিভাসে পরিপূর্ণ।

সোজা যাওয়া যাচ্ছে না। ক্রিভাস এড়াতে মাঝে মধ্যেই ডিট্যুর করতে হচ্ছে। কিছুক্ষণ চলার পর প্রায় ১০-১২ ফুট উঁচু বরফের দেওয়াল ডিঙিয়ে উঠে এলাম মোটামুটি সমতল অঞ্চলে। যেখান থেকে বাঁ দিকে অল্প কিছুটা গেলেই শুরু হয়ে গেছে ওই হাজার ফুটের প্রাণান্তকর চড়াই। জায়গাটা একটু ঢাকা মতো, চারদিক পাহাড়ে ঘেরা। প্রায় সমতল বরফ জমি অনেকটা 'রিংক্'-এর মতো। স্বচ্ছন্দে স্কেটিং করা যায়।

আকাশের অবস্থা ভালো নয়। আশেপাশের পাহাড়ের গা থেকে হামাগুড়ি দিয়ে নেমে আসছে মেঘ। সিদ্ধান্ত নেওয়া হল আজ এখানেই হবে সেকেন্ড ক্যাম্প।

চা আর চিড়েভাজা সহ বেশ একটা জমাট আড্ডা জমেছে তাঁবুতে। কিন্তু আমার মন পড়ে রয়েছে হাজার ফুটের ওই খাড়াইটায়। কাল ওটাই পেরোতে হবে। তারপর কিছুটা প্রায় সমতল স্নো ফিল্ড পেরিয়ে পৌঁছে যাব পাস-এ পৌঁছোবোর আরও খাড়াই দেয়ালটার কাছে। একসময় বেরিয়েছি তাঁবুর বাইরে। চারদিক জুড়ে শুধুই সাদা। বোঝাই যাচ্ছে উঠে এসেছি স্নো-লাইনের ওপরে। প্রথম ও দ্বিতীয় ক্যাম্পের মধ্যে আবহাওয়া, ভূগোল সবকিছুতেই অনেক তফাৎ।

হাওয়ার বেগ বেশ বেড়েছে। আমাকে দেখেই রাজু একগাল হেসেছে। কে বলবে কয়েকঘণ্টা আগেই ও ফিরে এসেছে যমরাজের সঙ্গে হ্যান্ডসেক করে। আকারে ইঙ্গিতে ও বুঝিয়েছে কালকে ওই চড়াইটায় ওঠার কথা। ওর আঙুল যেদিকে নির্দেশ করছে সেদিক বরাবর তাকিয়ে দেখলাম চড়াইটার শেষপ্রান্ত অনেকটা 'ইউ' আকৃতির। তার ওপরের মেঘলা আকাশে জমেছে একপোঁচ কালো মেঘ। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেছি স্লোপটার পাদদেশে, একটা ছোটো ক্রিভাস এড়িয়ে। পিছন ফিরে দেখলাম মঙ্গল গল্প জুড়েছে দেশোয়ালী ভাইদের সঙ্গে। আমায় দেখে হাত নেড়েছে। আমিও প্রত্যুত্তর দিয়েছি ইঙ্গিতে। এখান থেকে দেখা যাচ্ছে কয়েকঘণ্টা আগে পেরিয়ে আসা মোরেনের ওই বিশাল ধ্বংসযজ্ঞ।

চারদিক ঘিরে সমস্ত জায়গাটা জুড়ে অদ্ভুত রকম গা শিরশির করা নৈঃশব্দ। অভ্রলেহী সব তুষারাবৃত রিজ আর তাদের পিক্ যেন নিঃশব্দে মেপে চলেছে আমাদের। মাঝেমাঝেই গ্লেসিয়াল লেকের জলে গুমগুম করে পাথর খসে পড়ার আওয়াজ আবার তারপরই সব আগের মতোই চুপচাপ। আমি মুখ

ঘুরিয়ে তাকিয়েছি 'ইউ' সেপের চড়াই শীর্ষের দিকে। একসময় ধীরে ধীরে উঠতেও শুরু করেছি। উত্তর থেকে বয়ে আসা দমকা হাওয়া মাঝে মধ্যেই কাঁপন ধরাচ্ছে। অদ্ভুত এক ভালোলাগা ঘিরে ধরেছে আমায়। বোধহয় একা হওয়ার সমস্ত মুহূর্তই দামী। মনে পড়ে, বাবা যখন শেষ শয্যায়, আমি সারারাত বাবার ঘরে মেঝেতে খাটের পাশের আলমারিতে ঠেস দিয়ে বসে থাকতাম। ওয়াটার বেডে শুয়ে থাকা আমার জন্মদাতার ক্ষীণ শ্বাসপ্রশ্বাস, মাথার ওপর ঘুরতে থাকা সিলিং ফ্যানের চাপা আওয়াজ, ঘরের ওষুধপত্র আর বাবার বেডসোরের ক্ষতগুলোতে লাগানো সল্যুশান-এর কড়া গন্ধ ও আমার একাকীত্ব, আমাকে প্রতিটা রাতে নতুন জন্ম দিয়েছে।

আরও কয়েক পা উঠে গেছি সাদা বরফের বুকে জুতোর সোলের দৃঢ় ছাপ ফেলে। ওই 'ইউ' শেপটা এক অমোঘ আকর্ষণে টানছে আমায়। ওখানে দিনের শেষ আলোর বিচ্ছিন্ন গরিমা সধবা মহিলার কপালের লেপটে যাওয়া সিঁদুরের টিপের মতো ছড়িয়ে আছে। ক্রমশ দিনের আলো প্রায় শেষের পথে। পিছন ফিরে দেখেছি মঙ্গল আর তার দলবল ঢুকে গেছে তাঁবুর আড়ালে। এখন এই বিশাল কুন্দশুভ্র তুষার অঙ্গনে আমি সম্পূর্ণ একা। চারদিকের রিজ আর পিকগুলো ঢেকে যাচ্ছে মেঘের মায়াজালে। কালচে হয়ে আসা আকাশের চাঁদোয়া অস্পষ্ট হয়ে গেছে কুয়াশা আর মেঘের ছলচাতুরীতে। দ্রুত আবহাওয়ার অবনতি ঘটেছে। শুধু মেঘের জাল ছিঁড়ে এক অদ্ভুত অশরীরি দৃষ্টি নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থেকেছে ওই 'ইউ' শেপ। সহসা হাঁটু মুড়ে বসে পড়েছি, খামচে ধরেছি নরম তুষারের প্রতিরোধ। অনেকদিনের জমে থাকা এক অব্যক্ত যন্ত্রণা ধীরে ধীরে নোনতা অভিমান হয়ে নেমে এসেছে দু-চিবুক বেয়ে।

— "কেয়া হুয়া ডক্টর সাব", পিছন থেকে কাঁধে হাত রেখেছে মঙ্গল।

ও কখন উঠে এসেছে আমি জানি না। বরফের বুকে ওর কোফলাস-এর আওয়াজ কানে আসেনি আমার, হয়তো বা হাওয়ার প্রাবল্যে অথবা অন্যমনস্কতায়।

— "কুছ নেহি, সব ঠিক হ্যায়", আমি মাথা নীচু করে ওয়েস্ট পাউচটা ঠিক করার অছিলায় ওকে উত্তর দিয়েছি।

— "জলদি চলিয়ে, মওসম্ বিগড় গ্যায়া হ্যায়", মঙ্গল তাড়া দিয়েছে।

— "ওকে তুম চলো, ম্যায় আ রাহা হুঁ", মঙ্গলের উপস্থিতি আমার

ভালো লাগছে না।

— "যো আপকা মর্জি, লেকিন জলদি", মঙ্গল সিং কিছুটা অসহিষ্ণু হয়েই বলেছে।

ও দ্রুত নেমে গেছে। আমি ধীরে ধীরে নামতে শুরু করেছি নীচের দিকে। উত্তরের হাওয়া এবার সরাসরি আঘাত হেনেছে আমার সর্বাঙ্গে। আমি জানি আমি নির্বিঘ্নে পৌঁছব। চড়াই-এর পাদদেশের ছোটো ক্রিভাসটা এই ফিকে হয়ে আসা আলোতেও পেরোতে কোনো অসুবিধা হবে না। আজকের এই একা হওয়াটা আমার কাছে অসম্ভব দামি, অন্তর থেকে উপভোগ্য। সোরেন কির্য়েকেগার্ড-ই সঠিক— "Life can only be understood backward; but it must be loved forward." একান্ত ব্যক্তিগত কিছু ক্লেদ যেন আমি ফেলে যাচ্ছি এই নিষ্কলুষ প্রকৃতির বুকে। আর সেও নীলকণ্ঠের মতো নিশঙ্ক চিত্তে তা শুষে নিচ্ছে কোনো প্রশ্ন না রেখেই।

আজ আমার নতুন জন্মদিন। আমার এই না বুঝিয়ে বলতে পারা আবেগ হয়তো অনেকেরই খুব চেনা। একটা অলটিট্যিউড্-এর পর পাহাড় হয়তো তাদের এভাবেই হালকা করেছে, দিয়েছে বেঁচে থাকার নতুন অক্সিজেন। জো সিম্পসন যথার্থই বলেছেন— "An exhilarating combination of emotion, the essence of climbing ..."। বর্তমানে নানা উন্নত প্রযুক্তি, নানা কৃত্রিম সহায়তা পর্বতারোহণের পথ সহজ করলেও, আরোহণের আবেগ কিন্তু চোদ্দোটা এইট থাউজান্ডার জয়ী নাওমি উয়েমুরা থেকে, প্রখ্যাত রক্ ক্লাইম্বার অ্যালেক্স হোনল্ড কিংবা স্পিড অ্যালপানিস্ট উলি স্টক্ পর্যন্ত একই থেকে গেছে।

ক্যাম্প সাইটে যখন এসে পৌঁছেছি সূর্যের আলো আকাশের বুক থেকে প্রায় মুছে গেছে। অসম্ভব হালকা লাগছে নিজেকে, শরীর ও মনে। ক্যাম্প থেকে ভেসে আসছে শঙ্খদা, সুমন আর বিশুর গলা। জিপার টেনে ঢোকার আগে একবার হিমেল চরাচরে শান্তির চোখ মেলেছি। অন্ধকারে ঝাপসা হয়ে আসা নীরব প্রকৃতির পটভূমিতে, মনে পড়েছে অমিয় চক্রবর্তী-কে লেখা কবিগুরুর একটা চিঠির কিছু অংশ। ওই জায়গায় দাঁড়িয়ে কোট আনকোট বক্তব্যটা মনে আসেনি। তাই পাণ্ডুলিপি তৈরির সময় সাহায্য নিতে হয়েছে বইয়ের। ৯ নভেম্বর ১৯১৭, অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা বিশ্বকবির একটা চিঠির

কিছু অংশ ছিল এইরকম — "তুমি ঠিক জায়গাতেই গেছ, প্রকৃতি জীবনের ক্ষতস্থানে হাসপাতালের মতো ব্যান্ডেজ বাঁধাবাঁধির উৎপাত করে না, সে মন্ত্র পড়ে চুম্বন করে দেয়। তার আদরের অ্যান্টিসেপ্টিকে না আছে জ্বালা, না আছে কড়া গন্ধ।"

বক্তব্যটা যে কতটা সঠিক, সে আর আজকে আমার চেয়ে বেশি কে বোঝে।

ডিনারটা আজ তুলনামূলক একটু তাড়াতাড়িই শেষ হয়েছে। কাল প্রথম পাস ক্রশ করার দিন। চাপা উত্তেজনার আঁচড়টা রয়েছেই। রাতে একটা সময় অবধি তুষারপাত হয়েছে। চলেছে মরুতের মাতলামো। তাঁবুর ভেতর একটা মানুষ অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করেছে আগামী ভোরের। যে ভোর নিয়ে আসবে অবাক করা প্রুশিয়ান নীল আকাশের কোলে রৌদ্রস্নাত তুষারধৌত এক নতুন পৃথিবী। যে পৃথিবী শুধুই শান্তি আর আনন্দের এক অপার মুক্তাঞ্চল।

আমি ঘুমের বারান্দা পেরিয়ে সেখানে গিয়ে দাঁড়াই।

তৃতীয় দিন
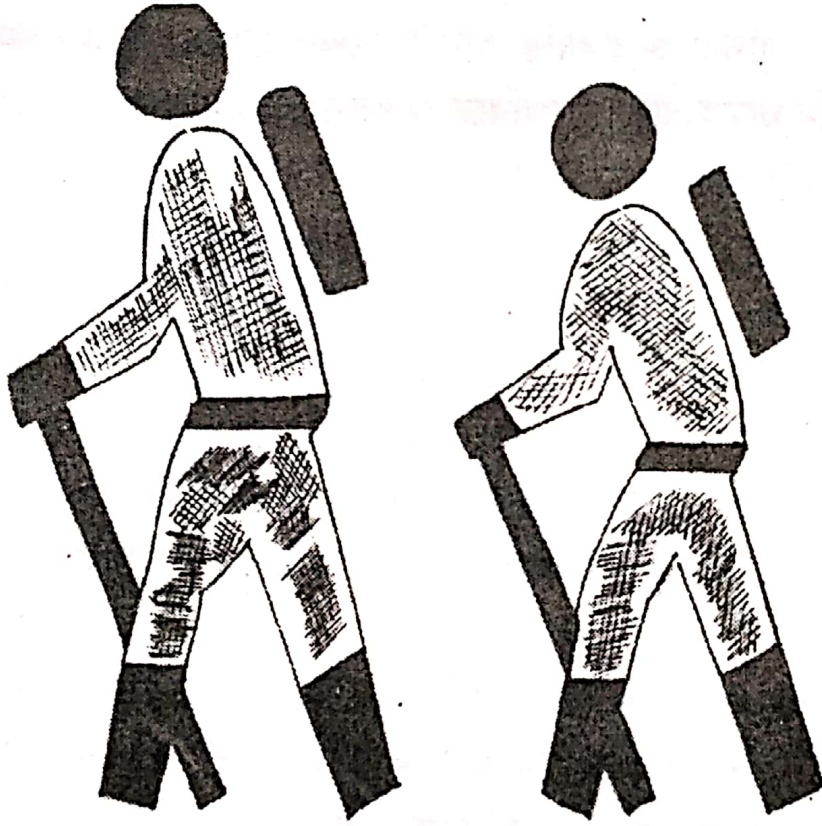
"No matter how sophisticated you may be, a large granaite mountain can not be denied— it speaks in silence to the very core of your being."

—Ansel Adams

পাহাড়ি ঠিক কাদের বলে জানি না। পাহাড়ে গেলেই পাহাড়ি হওয়া যায় এটাও আমি বিশ্বাস করি না। পাহাড়ে হাঁটার প্রতি মুহূর্তে যে রোমাঞ্চ, যে অব্যক্ত অনুভূতি মিশে থাকে তা যদি কারও ভেতর দোলা দিয়ে না যায় তাকে কি পাহাড়ি বলা চলে? তাই নিজেকে পাহাড়ি বলতে সাহসে কুলোয় না। নিছক একজন পর্বতপ্রেমিক ভাবতে বরং অনেক বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করি।

আসলে পৃথিবীর প্রত্যেকটা মানুষেরই তো কোথাও না কোথাও হেরে যাওয়া থাকে। পাহাড় সেই হেরে যাওয়ার ক্রমাগত ন্যাগিং পেনগুলোকে অদ্ভুতভাবে প্রশমিত করে। মনের শো-কেস থেকে এক এক করে 'হেরে যাওয়া' ট্রফিগুলো নামিয়ে সযত্নে তুলে রাখে 'জিতে যাওয়া' ট্রফিগুলো। নিছক একজন পর্বতপ্রেমিক হিসাবে ট্রেকিং, ক্লাইম্বিং তাই আমার কাছে এক অনন্ত যাত্রা। যে পথে হেঁটে চলি আমি অনায়াস, অনাবিল এক মন্ত্রমুগ্ধতায়। যেখানে শিশুর সারল্যে অনায়াসে ল্যাক্রাইমাল্ গ্ল্যান্ডস নিংড়ে আসে লোনা জল কোনো নাগরিক লজ্জার আড়াল না রেখে, যেখানে নরম তুষারে হাঁটু গেড়ে বসে দু-হাত মুঠো করে নীল আকাশের নীলিমায় এক নিঃশ্বাসে মনে মনে চলে আমার একান্ত 'কথোপকথন'। যা কোনোদিনও শহর কলকাতায় বলার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারব না।

পাহাড় নিয়ে লিখতে বসার এই এক বিড়ম্বনা আমার। বস্তা বস্তা আবেগ জ্বলন্ত লাভার মতো ছিটকে বেরিয়ে আসে যার বর্ণনা দিতে গিয়ে 'শ্যাম রাখি না কূল রাখি' অবস্থা। কোন শব্দবন্ধনী-তে বাঁধব আমি, পাহাড়ে সবার মাঝে থেকেও একা হওয়ার অদ্ভুত স্বাচ্ছন্দ-কে? কোন ভাষায় বলব আমি, পাহাড়ের বুক চিরে চলে যাওয়া সর্পিল রাস্তার অনেক নীচ দিয়ে বয়ে চলা নদীর অনিন্দ্যসুন্দর জ্যামিতিক চলনকে? কী করে বোঝাব আমি সেই শেষ বিকেলের গল্প, যেখানে লালচে গালের এক কিশোরী দুহিতা তার আস্থাভাজনের হাতে হাত রেখে হেঁটে গিয়েছিল কুয়াশা ঘেরা দিগন্তের দিকে, যেখানে দুর্গের মতো দাঁড়িয়ে আছে রহস্যময় গ্র্যানাইটের সারি? সত্যিই কি পরিবেশন করা যায় সেই সন্ধে, যেখানে আটচালার নীচে 'ছাং'-এর নেশায় বুঁদ হয়ে থাকা পাহাড়ি মানুষের ঘ্রাণে নেমে এসেছিল নিঃশব্দ এক তারাভরা রাত?

ভাষায় বোঝাতে না পারার অক্ষমতাটাকু মেনে নিলেও একথা তো সত্যি যে পাহাড়ে বিভিন্ন সময় চাক্ষুষ বা অনুভব করা এইসব মুহূর্ত, আমাকে জুগিয়েছে

কিন্তু গোয়ালার গলি থেকে রাজপথে ফিরে আসার এক সপাট সাহস। দিয়েছে নিজের শক্তি, কাঠিন্য আর আত্মবিশ্লেষণের এক উপযুক্ত রঙ্গমঞ্চ। আসলে আমাদের জীবনের স্বপ্ন, আকাঙ্ক্ষা, চাহিদাগুলো কোথাও মাঝেমধ্যেই অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তাই খুঁজি 'লার্জার দ্যান লাইফ', খুঁজে ফিরি মেলোড্রামা। তাই কখনও হিমালয়, কখনও সাগর বা এমন কিছু যাকে অনায়াসে করে ফেলতে পারি নিজেকে মাপার একক। বদলাতেই পারে স্থান, কাল পাত্র কিন্তু আপাত দৃষ্টি 'শীর্ষ' ছোঁওয়ার। শীর্ষে দাঁড়িয়ে আর সবকিছুর থেকে নিজেকে একটা উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার তাগিদ ছুঁয়েই এই নামজীবন। যা হরিপদ কেরানি থেকে আকবর বাদশা ... ভাইরাসটা বড্ড সংক্রামক। তাই 'জিতে যাওয়া' আর 'হেরে গিয়েও বিজয়ী' চরিত্র দুটোতে বরাবর অর্জুন আর কর্ণের ডুয়েল, হিলারি আর ম্যালোরির এক অমর আখ্যান। আমি বিশ্বাস করি র্জ ম্যালোরি কখনও ভুল বলেন না— "For the stone from the top for geologists, the knowledge of the limits of endurance for the doctors, but above for the spirit of adventure to keep alive the soul of man."

— "এই চড়াইটা উঠে গিয়ে, তারপর আবার ওপরের ওই চড়াইটা পেরোলেই পাস্-এ উঠে যাব, তাই তো?" চায়ের কাপে সশব্দে চুমুক দিয়ে বলে উঠল মলয় দেবনাথ।

ভাবখানা এমন যেন কোনো ব্যাপারই নয়। মলয়দা এরকমই। সবসময় ক্যাসুয়াল। পাহাড়ে মলয়দার অ্যাটিট্যিউড্ দেখে একটা কাঁহাবত মনে পড়ে যায় আমার। কাঁহাবত-টা এরকম—

"জঙ্গল মে কোই আওয়াজ নেহি হ্যায়,
তো ইয়ে মাত সোচনা কি উহাঁপে কোই শের নেহি হ্যায়,
হো সাকতা হ্যায় শের শো রহে হ্যায়।"

যখনই মনে সন্দেহ হয়, লোকটা এরপর এগোতে পারবে তো? তখনই দেখি ভালুকের মতো টলতে টলতে বাকি পাহাড়ি রাস্তাটা বিলকুল মেরে দিল, হয়তো অনেকের আগেই। ওই ল্যাকপ্যাকে চেহারার মোমবাতি মার্কা ঠাঙদুটোতে যে কী করে এত জোর পায়, রাম জানে। হয়তো এটা অন্য 'রাম'-এর জোর, যা মলয়দার অত্যন্ত প্রিয় পানীয় (অবশ্যই পাহাড়ের পথে নয়)।

আজ ১৩ জুন। এক্সপেডিশানের তৃতীয় দিন। কালকে রাতের তুষারপাতের কারণে আজ সকালে চারদিক জুড়ে ফ্রেশ স্নোয়ের প্রাবল্য। ওয়েদার খুব ক্লিয়ার বলা যাবে না তবে ভিসিবিলিটি বেশ ক্লিয়ার। চারদিক জুড়ে গায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়া শৃঙ্গের নজরদারির ফলে জায়গাটা অনেকটা বাটির আকারের। আমরা রয়েছি এই বাটির তলদেশে। সুতরাং অবস্থান জনিত কারণে সূর্যের আলো সকাল নটার আগে এখানে এসে পৌঁছবে বলে মনে হয় না। হালকা ব্রেকফাস্টের পর স্যাক কাঁধে নিয়ে আমি তৈরি। শঙ্খদা এখন ভিডিয়ো ক্যামেরার সামনে আজকের রুট নিয়ে গম্ভীর হয়ে বাইট দিচ্ছে। মহাশয় রসিক এবং প্রচুর কথা বললেও ক্যামেরার সামনে বেশ জড়সড়।

প্রত্যেকবার পাহাড়ে যাবার আগে রুকস্যাকের হুডে ল্যাকমের একখানা নতুন সানস্ক্রিন লোশান ঢুকিয়ে নিই আর ভীষ্মর প্রতিজ্ঞা করি যে এবার এটার সদব্যবহার করবোই। কিন্তু প্রত্যেকবারেই সকালে উঠে বেরোনোর আগে সাজগোজ পোষায় না বলে স্যাকহুডেই শবরীর প্রতীক্ষা নিয়ে থেকে যায় বেচারি। এবং একসময় পরপুরুষ স্বর্ণেন্দু-র গালে ঠোঁটেই তাকে লেপটে থাকতে হয়। আজ-ও হয়েছে। গালে, নাকে, ঠোঁটে একগাদা লোশান মেখে, মুখটা ভূতের মতো সাদা করে স্বর্ণেন্দু আমার দিকে টিউবটা এগিয়ে দিয়ে বলল — "চলো ডাক্তার, এগোনো যাক"।

দিনের প্রথম স্টেপটা দেওয়ার আগে প্রত্যেকদিনই সময়টা দেখা আমার অভ্যেস। আজও দেখেছি। সকাল ৮.৩০ মিনিট। একবার তাকিয়েছি ওই হাজার ফিট চড়াইটার শেষপ্রান্তে 'ইউ' শেপটার দিকে। অল্প ধোঁয়াটে নীলচে আকাশের নীচে এক নীরব অথচ নিশ্চিত অবস্থিতি।

বাটির তলদেশ থেকে গাত্রদেশ ধরে ওঠার মতো ধীরে ধীরে ওঠা শুরু হয়েছে। নীচে আমাদের টেন্টসগুলো প্যাক করে বিজেন্দ্র, দলজিৎ, মহাবীর-রাও একে একে উঠে আসছে। নীচে থাকার সময় হাওয়ার বেগটা অতটা মালুম হয়নি। যত ওপরে উঠেছি হাওয়ার দাপট ক্রমশ বেড়েছে। শৃঙ্গগুলো যেন আরও হাতের কাছে মনে হচ্ছে। যে শৃঙ্গগুলো এতক্ষণ মেঘের আড়ালে ছিল তারাও ক্রমশ দৃশ্যমান। হাপর এর মতো শ্বাসপ্রশ্বাস-এর ফাঁকে মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ে দেখে নিচ্ছি চারদিক। অদ্ভুত নিঃস্তব্ধ এক বিস্তীর্ণ তুষার অঞ্চল। আকাশের ধোঁয়াটে নীল উপস্থিতি আর বৃত্তের মতো ঘিরে থাকা অনামা

সব শৃঙ্গরাজির শাসনে আমরা মাত্র কটা মানুষ। সমস্ত পরিস্থিতিটাই যেন বারবার বুঝিয়ে দিচ্ছে এই বিশাল প্রকৃতির কাছে আমরা কত অসহায়। এক দমকা তুষারঝড়ে এক লহমায় আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারি পরস্পর-এর থেকে, হারিয়ে যেতে পারি চিরতরে।

—"জলদি চলিয়ে", মঙ্গল তাড়া দিয়েছে।

সেভাবে কিন্তু এখনও রোদের দেখা নেই। ক্রমশ মেঘের দাপট বাড়ছে। এভাবে চললে পাসের ওপর যখন পৌঁছব তখন কী অপেক্ষা করছে কে জানে। সবাই বুঝেছে সেটা। যথাসম্ভব দ্রুত পা-ও চলেছে সবার। চড়াই শীর্ষের কাছাকাছি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কিছু বোল্ডার। যা একদিকে আমার শীর্ষে ওঠার ক্ষেত্রে সুবিধাজনক-ই হয়েছে। কারণ শেষ পথটুকুতে ইনক্ল্যাইনেশনটা আর একটু বেশি। একসময় উঠে এসেছি ওই হাজার ফিটের শীর্ষে। শীর্ষের মাথায় উঠেই নজরে পড়েছে সামনে কিছুটা জায়গা জুড়ে পড়ে রয়েছে প্রায় সমতল এক তুষার অঞ্চল। প্রচণ্ড হাওয়ায় ধারে দাঁড়ানো যাচ্ছে না। কিছুটা ঢুকে গেছি সমতল প্রান্তরের তুষার ক্ষেত্রটায়। এখান থেকে সেই কোন নীচে দেখা যাচ্ছে আমাদের কালকে রাতের ক্যাম্পসাইট। আর ক্যাম্পসাইট-এর ডানদিকে বেশ কিছুটা দুরে গতকালের সেই বোল্ডার বিধ্বস্ত অঞ্চল।

এখনও টিমের বেশ কিছু মেম্বার আর পোর্টারদের উঠে আসা বাকি। এখান থেকেই এখনও অনেকটা দূরে নীলকণ্ঠ পাসের মাথায় দেখা যাচ্ছে কেয়ার্ন। পরপর পাথর সাজিয়ে তৈরি করা এই কেয়ার্ন আমাদের আগামী পথনির্দেশক। সমতল তুষার প্রান্তর যেখানে শেষ হয়েছে সেখান থেকেই উঠে যেতে হবে পাসের মাথায়। এই শেষ তিনশো ফুট মতো চড়াইয়ের ঢাল প্রায় ৬০ ডিগ্রি। পিঠ থেকে স্যাক নামিয়ে গলায় ঢেলেছি গ্লুকোজ মেশানো ঠান্ডা কনকনে জল। ঠান্ডা জলটাও অনায়াসে গিলেছি বোধহয় হাজার ফুট চড়াই পেরোনোর শ্রান্তিতেই।

মঙ্গল সিং বরফের ওপর আইস অ্যাক্স দিয়ে নিজের খেয়ালখুশি মতো আঁকিবুঁকি কেটে চলেছে। স্বর্ণেন্দু স্থির তাকিয়ে রয়েছে শেষ চড়াইটার দিকে। সলিলদা সমতল প্রান্তরটা ধরে বেশ কিছুটা এগিয়ে এক জায়গায় থেমেছে। কোমরে হাত দিয়ে তাকিয়ে রয়েছে সামনের দিকে, নিবিষ্ট মনে। আমি একটা বোল্ডারে আয়েস করে বসে পিঠ ঠেকিয়েছি আর একটা তেরছা হয়ে থাকা

বোল্ডারে। আসলে এই রেস্টিং ফেজ্‌টায় যে যার মতো নিজেকে তৈরি করে নিচ্ছে আগামী কঠিন পথটুকুর জন্য। জায়গাটা অনেকটা ওপেন হবার কারণে হাওয়ার কনকনে সূঁচ বিধছে সর্বাঙ্গে। আমি দু-হাঁটুর মধ্যে মাথা রেখে আরামে চোখ বুজেছি।

— "এই শালা ডাক্তার, একটা বিড়ি দে", মাথা তুলে দেখি শঙ্খদা নীল উইন্ড চিটারের বাঁ-হাতায় কপালে লেগে থাকা অল্প ঘাম মুছতে মুছতে ডান হাত বাড়িয়েছে। ঈষৎ ভারী চেহারার অল্প পাফী মুখটা পথশ্রমের শ্রান্তিতে বেশ লাল হয়ে উঠেছে। দাদার হঠাৎ আমাকে এই যে 'বউয়ের ভাই' বানিয়ে ফেলা বা তুইতাকারি করাটা আমার খুব চেনা। পাহাড়ে দেখেছি, একটা কষ্টকর ফেজ্‌ সাফল্যের সঙ্গে পেরিয়ে আসার পর বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন রকম এক্সপ্রেশান্‌ থাকে। হাজার ফুটের ওই তুষার চড়াইটা সদ্য পেরিয়ে আসার আনন্দেই দাদার এহেন উচ্ছ্বলতা সেটা বুঝতে আমার বাকি নেই। নিঃসন্তান এই মানুষটা হয়ত মাউন্টেনীয়ারিং এর গ্রেডেশান্‌-এ দারুণ নম্বর পাবে না কিন্তু সবসময় ভীষণ এনার্জেটিক। ঠিক যেরকম স্বর্ণেন্দু, সুমন, বিশু, সলিলদা। পথের ক্লান্তি, খাওয়াদাওয়া, টিম ম্যানেজমেন্ট কোনোকিছুতেই এদের কোনো অভিযোগ নেই। এর উলটো পথের পথিকদেরও বিভিন্ন এক্সপেডিশান-এ দেখেছি। তবে তাদের নামটা উহ্যই থাক।

মঙ্গল সিং ওর কোফলাসে লেগে থাকা বরফ আইস অ্যাক্সের নাইফ এজ্‌টায় ঠুকে ঝেড়ে নিচ্ছে। ওর ভঙ্গিতে আবার শুরু করার ল্যাঙ্গুয়েজটা স্পষ্ট। ওয়েদার-এর ভাবগতিক ভালো নয়। কুয়াশার মসৃণ জাল ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবেই ঘিরে ধরছে আমাদের। বুঝতে পারছি ও চাইছে তাড়াতাড়ি পাস-টা ক্রশ করে নেমে যেতে।

আমি আর দেরি করিনি। পাহাড়ি মানুষদের এই ইনস্টিংক্টকে আমি যথেষ্ট মর্যাদা দিই। ওয়েদার আরও খারাপ হলে ক্যাম্পটা তবু এখানে করা যাবে, যদিও একটা দিন নষ্ট হবে। কিন্তু পাসে ওঠবার পথে বা পাসের ওপরে যদি কোনোভাবে আটকে যাই সে আরও মারাত্মক। তাই পা ফেলেছি মঙ্গলের সঙ্গে তাল মিলিয়ে। আপাতত কোণাকুনি সমতল তুষার অঞ্চলটা পেরিয়ে পৌঁছে যাব তিনশো ফুট দেয়ালটার পাদদেশে। যেখান থেকে শুরু হবে পাসে ওঠবার প্রাণান্তকর লড়াই।

৬০ ডিগ্রি গ্র্যাডিয়ান্টের তিনশো ফুটি দেয়ালটার কাছে পৌঁছে একবার পিছনে ফিরে তাকিয়েছি। পুরো সমতল ক্ষেত্রটা জুড়ে সাপের চলনের মতো আঁকাবাঁকা রেখায় পড়ে আছে আমাদের চলনচিহ্ন! হয়তো কিছুক্ষণ পরেই শুরু হবে তুষারপাত, মুছে যাবে সব দাগ। নতুন তুষারের স্যাটিন আস্তরণে ঢেকে এই পথ অপেক্ষা করবে আগামী অভিযাত্রীদের। সেদিন হয়তো আকাশ থাকবে ঝকঝকে নীল, চারপাশের গিরিশৃঙ্গের মাথায় অলঙ্করণ হয়ে হেলায় ভেসে বেড়াবে দুধসাদা মেঘ, ভিসিবিলিটির মাত্রা অনেক বেড়ে গিয়ে তাদের চোখের সামনে ধরা দেবে এই অনুপম স্বর্গরাজ্যের এক অনন্ত বিস্তার। কিন্তু আপাতত তা আমার কাছে স্বপ্ন। চারদিক জুড়ে মেঘেদের হেঁয়ালি আর কুয়াশার প্রহেলীকা চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য করে রেখেছে সে স্বর্গ। একবুক ছেলেমানুষী অভিমানে রোদচশমা ঝাপসা হয়ে গেছে। পা বাড়িয়েছি চড়াই-এর পথে।

কঠিন বরফের ৬০ ডিগ্রি বিপদজনক ঢালে আইস অ্যাক্স চালিয়েছে মঙ্গল সিং। স্টেপ কাটছে। মসৃণ নিষ্কলঙ্ক তুষার, তুষার গাঁইতির যন্ত্রণা সহ্য করে তৈরি করে দিচ্ছে আমাদের এগিয়ে চলার পথ। এগিয়েছি এগোতে হবে বলে। জানি পাহাড়ে ইমোশান একটা নির্দিষ্ট গণ্ডিতে বেঁধে রাখাই ভালো। না হলেই নষ্ট হয় রিফ্লেক্স, নড়ে যায় মনসংযোগ, ঘটে ধৈর্য্যচ্যুতি, ফলত বাড়ে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা। কিন্তু একজন অভিযাত্রীও কি বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবেন কারোর জীবনে কখনও কুয়াশার মতো এই ইমোশান হঠাৎই ঘিরে ধরেনি? অবিবেচকের মতো ভাবনা ধাক্কা দেয়নি মনোজগতে? না বুঝিয়ে বলতে পারা অবোধ্য এক অযাচিত ছেলেমানুষী, খামচে ধরেনি বুকের ওই আপাত লুকিয়ে রাখা নরম জায়গাটাকে? আসলে কান্না বড়ো ব্যক্তিগত ব্যাপার। আর প্রকৃতি উপভোগ্যতার ব্যাপারটাও ব্যক্তিগত পর্যায়েই পড়ে। তাই সঙ্গমটাও বোধহয় একান্তই অনিবার্য। আমি থামি নি। কোয়েচার ফোরক্লাজ মাউন্টেনিয়ারিং বুটের ছাপ পড়েছে নিষ্কলঙ্ক তুষারের বুকে, এক থমথমে নিস্তব্ধতা ঘেরা, ক্রমশ উঠে যাওয়া ধামলিং রিজ বরাবর। শুধু কুয়াশা আর মেঘের সঙ্গে আবেগের নিদারুণ সংযুক্তি ঝাপসা করেছে দৃষ্টি। বাকিদের মনের রসায়নটা অবশ্য আজও আমার অজানা।

সব পথের যেমন শেষ হয় সেভাবেই শেষ হয়েছে এই তিনশো ফুটের

ঘাম ঝরানো, টেনশন পূর্ণ, দড়িদড়া আর অন্যান্য ইক্যুইপমেন্টের টেকনিক্যাল তত্ত্বকথা ঘেরা এক অনিবার্য তুষার পথ। গিরিশিরা একসময় আচমকাই মোড় নিয়েছে ডানদিকে। রিজ্ এর সেই খামখেয়ালিপনা চলনকে সঙ্গত করেই উঠে এসেছি ৪৮৯৫ মিটারের হোল্ডসওয়ার্থ পাস বা নীলকণ্ঠ খালের শীর্ষে। আমার সস্তা টাইটান ঘড়িতে বড়ো আর ছোটো কাঁটাটা তখন গা জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে বারোটার ঘরে।

আজকে সত্যিই মনখারাপের দিন। উত্তর পশ্চিম দিক থেকে ধেয়ে আসা কালো মেঘের একটা বড়ো অংশ এর মধ্যেই ঢেকে ফেলেছে থামলিং গিরিশিরার ওপর এই নীলকণ্ঠ পাস। চারদিক ক্রমশ ঝাপসা হয়ে আসছে। জানি দাঁড়িয়ে আছি অনিন্দ্যসুন্দর এক স্বর্গের মাঝখানে। কিন্তু ওই যে বললাম আজ মনখারাপের দিন। খুব জোর ভাবনা সুতোর লাটাই ছেড়ে ভেবে নিতে পারি অনেক কিছু। স্বাভাবিক দৃষ্টিপথ জুড়ে যে শুধুই কালো মেঘ আর ধূসর কুয়াশার একঘেঁয়ে সহবাস।

প্রবল বেগে হাওয়া বইছে পাসের ওপর। যা যে-কোনো পাসের ওপরের স্বাভাবিক চরিত্র। মঙ্গল পাস-এ আরোহণের আনন্দে দু-হাত তুলে চেঁচিয়ে উঠেছে — "জয় বদ্রীবিশাল কি জয়।" জড়িয়ে ধরেছে সলিলদা, সুমন আর আমাকে। এক অনাবিল না বোঝাতে পারা অনুভূতিতে এলোমেলো হয়ে গেছে ভেতরটা। থরথর করে কেঁপে উঠে বুক ভাঙা নিঃশব্দ কান্নায় হাঁটু গেড়ে বসে গেছি। পাক খেয়ে ওঠা হিম বাতাস আর ঝুরো বরফের ঘূর্ণি, সপাট ঝাপটা মেরে কনগ্রাচুলেট করেছে আমায়। ভালোবাসা যে এক তরল পদার্থ তা পাহাড়ই মাঝে মাঝে মনে পড়ায় আমায়। সলিলদা পিঠে হাত রেখেছে। ওর-ও দুচোখ ভেজা। সানগ্লাস খুলে ফেলার দরুণ যা আরও স্পষ্ট। এ অনুভূতি তাঁদেরকে ভাষায় বোঝানো যাবে না যাঁরা কোনোদিন কোনো পাস বা শীর্ষে আরোহণ করেননি। এ হয়তো অনাস্বাদিতপূর্ব গর্ব, উত্তেজনা আর আনন্দের মায়াময় এক কোলাজেরই উত্তুঙ্গ বহিঃপ্রকাশ। মাথায় ফেট্টি দেওয়া জাতীয় পতাকা খুলে নাড়িয়েছি ক্রমশ পাসের কাছাকাছি চলে আসা টিমের বাকি সদস্যদের দিকে। লো-ভিসিবিলিটির কারণে যারা আমার কাছে এই দুপুরেও ঝাপসা কিছু অবয়ব মাত্র।

মঙ্গল সিং সুমন আর দলবীরকে নিয়ে একটু দূরে দুটো পাশাপাশি থাকা

বোল্ডারের মাঝে একগুচ্ছ ধূপ জ্বালাবার চেষ্টায় পূজোর আয়োজন করেছে। হাওয়ার প্রাবল্যে বেশ কয়েকবারের চেষ্টায় ও ধূপগুলো জ্বালিয়েও ফেলেছে একসময়। একে একে উঠে এসেছে বাকি সদস্যরা। শঙ্খদা শিশুর মতো কাঁদতে কাঁদতে জড়িয়ে ধরেছে আমাকে। জড়িয়ে ধরেছে না বলে আঁকড়ে ধরেছে বললেই বোধহয় যুক্তিযুক্ত হবে। দাদার কয়েকদিনের না কামানো কাঁচাপাকা খোঁচা দাড়ি আমার গালে ক্রমাগত ঘষা খাচ্ছে আর কানে ভেসে আসছে — "গুরু পেরেছি"। দেখতে পাচ্ছি বিশু এগিয়ে আসছে একমুখ স্বস্তি আর আনন্দের চওড়া হাসি নিয়ে। কাছে এসে বলেছে — "ডাক্তার উঠে এলাম রে"। আমি কিছু বলার আগেই মলয়দা বলে উঠল — "এখানে কী ঠান্ডা মাইরি"।

একে একে আলিঙ্গন, করমর্দন আর ক্যামেরার সামনে জাতীয় পতাকা নিয়ে সারিবদ্ধ পোসের পর আমি একটু আলাদা হয়েছি। একটা বড়ো কাজ যে এখনও বাকি। ওয়েস্ট পাউচ থেকে বার করে এনেছি সাদা খামে মোড়া পোস্টকার্ড সাইজের খান পাঁচেক সাদা কালো ছবি। বউভাতের দিন একগাদা ফুলের ডেকরেশনের মাঝে দাঁড়িয়ে আছেন একজন পুরুষ ও মহিলা। ধীরে এগিয়ে গেছি মঙ্গল যেখানে পুজো করেছিল সে জায়গাটায়। একখানা ছবি অর্ধেক পুঁতে দিয়েছি ধবধবে সাদা তুষারের বুকে। হাঁটুগেড়ে বসে দু-হাত জড় করেছি বুকের কাছে। ধূপের সুগন্ধি ধোঁয়া এলোমেলো হয়ে ঘিরে ধরেছে আমার বাবা-মাকে। বাকিদের থেকে একটু আড়ালে আবার কতদিন পরে আমরা তিনজন। যেখানে নেই চিমনির কালো ধোঁয়া, অহেতুক কলরব, ইট কাঠ পাথরের ঘেঁষাঘেঁষি বিরক্তি আর জটিল কুটিলের দৃশ্য অথবা অদৃশ্য থাবা।

বেশিক্ষণ থাকিনি, বলা ভালো থাকতেও চাইনি। যা কিছু ব্যক্তিগত তা একান্তই থাক আমার গভীরে, গোপনে। আমি যে বড়ো বিশ্বাস করি — "শুধু তাই পবিত্র, যা ব্যক্তিগত"। দুজনেই স্মিত হেসে নিঃশব্দ সমর্থন জানিয়েছেন আমায়। আমি পিছন ফিরে হেঁটে গেছি আবার টিমের মাঝখানে, যেখানে এখন শুধুই সাফল্যের উচ্ছ্বাস।

শুরু হয়েছে তুষারপাত। তাপমাত্রা আরও নেমেছে। বেড়েছে হাওয়ার বেগ। মঙ্গল এই দুর্যোগপূর্ণ পরিবেশে আর পাসের ওপর থাকতে চাইছে না। স্যাক থেকে লাল রঙের হোলিফিল জ্যাকেটটা বার করে চাপিয়ে নিয়েছি গায়ে, টেনে দিয়েছি জ্যাকেট হুডটাও। মুহূর্তে লাল জ্যাকেটের আনাচ কানাচ ভরে

গেছে সাদা তুষারের মসৃণ আলিঙ্গনে। মওকা পেয়ে বরফের 'ফ্লেক্স' ঢুকে পড়েছে গলার কাছে জ্যাকেটের ফাঁক দিয়ে।

পাস-এর প্রশস্ত অঞ্চলটা যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে আড়াআড়ি ভাবে ছড়িয়ে আছে বেশ কিছু বোল্ডার। সীমাহীন এই তুষারজমির শুভ্র প্রেক্ষাপটে তারা নেহাতই সংখ্যালঘু। বোল্ডারগুলো পাস থেকে নামার রাস্তায় একটা ছোটোখাটো প্রাচীর তৈরি করে রেখেছে। বোল্ডার প্রাচীর টপকে অবতরণের রাস্তা ধরতে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। কিন্তু সমস্যাটা অন্য জায়গায়। ওয়েদার ক্রমশ খারাপ হতে হতে প্রায় "ডেড লাইট"। দু-আড়াই ফুট বৃত্ত জুড়ে তবু কিছু দেখতে পাচ্ছি। বাকি রাস্তাটুকু কিচ্ছু বোঝা যাচ্ছে না। যেন রাশি রাশি ধোঁয়া ভেদ করে এগোচ্ছি।

— "মেরে পিছে পিছে আও, ইধার উধার স্টেপ মাত দে না", কুয়াশা ভেদ করে মঙ্গলের গলা ভেসে এসেছে।

মঙ্গল তো বলেই খালাস। কিন্তু ওর হালকা বিস্কিট কালারের জ্যাকেট এই আলোতে মেঘ আর কুয়াশার ভেতরে প্রায় দেখাই যাচ্ছে না। ফুট স্টেপ ধরে যে এগোব, তারও উপায় নেই। কারণ টিম মেম্বাররা কেউই মঙ্গলের স্টেপ-এ স্টেপ ইন করেনি। ডানদিক বাঁ দিক যে যেমন পেরেছে পা ফেলেছে। আমি চেষ্টা করেছি মঙ্গলের গলার আওয়াজটা অনুসরণ করার। বেশ কিছুক্ষণ এভাবেই এগিয়েছি। প্রচণ্ড এলোপাথাড়ি হাওয়ার আওয়াজ আর অবিশ্রান্ত তুষারপাত এখন আমাদের নাছোড়বান্দা সঙ্গী।

এইভাবে এগিয়ে চলার মধ্যে একটা অ্যাডভেঞ্চার হয়তো থাকে আবার একঘেঁয়েমিও থাকে। আর স্বাভাবিক ভাবেই আমরা দোষ দিই সেই সময়ের আবহাওয়াকে। আমিও মনে মনে দুষেছি তাকে। সেই সময়ে মনে হয়নি কিন্তু লিখতে গিয়ে এখন মনে হচ্ছে George Barnard Shaw-এর একটা উদ্ধৃতি পড়েছিলাম— "If you trip in the darkness, will you blame the darkness?" ঠিকই তো, যারা পাহাড়ের এই সমস্ত অলটিটিউড্ এ আসি, তাদের আগেই যাত্রাপথের একটা জলছবি মনে ভেসে থাকে। কখনও মেঘ, কখনও রোদ্দুর, কখনও কুয়াশা আবার কখনও ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে তুষারপাত, এসব তো হিমালয়ের দুর্গম পথে নিত্যসঙ্গী। এই খামখেয়ালিপনা আছে বলেই তো হিমালয় এত বৈচিত্র্যময়, প্রোবাবিলিটি মেলে না বলেই সে

এত রহস্যময়। নাগরিক জীবনে আমরা চারপাশে ঘিরে থাকা হাজার মানুষের লক্ষ হিপোক্রেসি মানিয়ে চলতে পারি, টেকনোলজির উন্নতির বাহানায় পরিবেশ দূষণের গ্যালন গ্যালন গরল কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করতে পারি আর প্রকৃতির এই আপন নাট্যশালার বৈচিত্র্যপূর্ণ উপস্থাপনার ক্ষেত্রে কেন এত অধৈর্য্য হব? কেন সেখানে জটিল মন লাভ লোকসানের হিসাব মেলাবে? কেন সেখানে খতিয়ে দেখবে চাওয়া পাওয়ার তুচ্ছ মানবিক আকাঙ্ক্ষা?

তুষারপাত থেমেছে। কিন্তু বেড়েছে হাওয়ার বেগ। মনে হচ্ছে যেন একটু ফাঁকা জায়গায় এসে পড়েছি। ঝাপসা হয়ে থাকার কারণে বোঝা যাচ্ছে না। তবে হু হু করে বয়ে আসা মাতাল মরুত সশব্দে ঝাঁপিয়েছে আমাদের ওপর। ঠিক সেইসময়ই মেঘ কুয়াশার তমিস্রা জাল ছিঁড়ে বেরিয়েছে সূর্যালোকের কিছু পলিগোনাল বিম্। একটা হালকা জাফরানি আলোয় ভেসে গেছে গোটা চরাচর। সেই মোমের মতো নরম আলোতেই দেখলাম আমরা দাঁড়িয়ে আছি এক বহুদূর সোজা চলে যাওয়া তুষার ঢালে। যা ডানদিক থেকে ঢালু হয়ে আমাদের বাঁ দিকে নেমে গেছে সেই কোন অতল অঞ্চলে, যা এখনো আমাদের চোখে ঝাপসা। এই ঢাল ধরেই এখন আমাদের এগোতে হবে সোজা সামনের দিকে যেখানে সারা আকাশের ক্যানভাস জুড়ে ছড়ানো কনে দেখা আলো আর মেঘেদের এক অনবদ্য চিত্রকল্প। আর এই মোহময় চিত্রকল্পে আলাদা অনুষঙ্গ যোগ করেছে ডানদিকে ক্রমশ উঁচু হয়ে যাওয়া, ঢাল চিরে হঠাৎই মাথা তুলে দাঁড়ানো এক অনামা তুষারশৃঙ্গ। আমি দাঁড়িয়ে পড়েছি। এগিয়ে যেতে দিয়েছি বাকিদের। মূলত দুটো কারণে। প্রথমত এই মনোমুগ্ধকর পিকচার গ্যালারির সৌন্দর্য আমি দুচোখ ভরে দেখব আর দ্বিতীয়ত এই দৃশ্য আমি ক্যামেরাবন্দী করব। আমি জানি এই সুবিশাল তুষারক্ষেত্র ধরে ট্র্যাভার্স করে যখন আমার টিম মেম্বাররা এগিয়ে যাবে ওই দিকচক্রবাল এর দিকে আর পিছনে পড়ে থাকবে তাদের সারি সারি পায়ের ছাপ, সেই ফ্রেম যে-কোনো ফোটোগ্রাফারের কাছে অত্যন্ত লোভনীয়। বাস্তবে ঘটেছেও তাই। তুষার ঢালে নিজেকে অ্যারেস্ট করে, হাওয়ার বেগ সামলে কয়েকখানা স্ন্যাপও নিয়েছি। কপাল ভালো বলতে হবে ছবি তোলার প্রয়োজনীয় আলোটুকু ওই মুহূর্তগুলোতে আমার সফরসঙ্গী ছিল। কারণ আবার কিছুক্ষণ পরেই সূর্যের দিপ্তী চলে গিয়ে শুরু হয়েছে মেঘ কুয়াশার হানাদারি।

এভাবেই এগিয়েছি। পুরো তুষারঢাল ট্রাভার্স করে মোড় নিয়েছি ডানদিকে। একসময় পথ উৎরাইয়ে নেমেছে। বেড়েছে তুষারের গভীরতা। মাঝে মধ্যেই তা ছাড়িয়েছে গেইটার-এর উর্দ্ধসীমা আর ছুঁয়েছে নি-জয়েন্ট। ঘড়িতে প্রায় ১টা বেজে ১৫ মিনিট।

আবার শুরু হয়েছে নাছোড়বান্দা তুষারপাত। ভিসিবিলিটি আরও কমেছে। কোথাও কোথাও কোমর অবধি ডুবে গেছে নরম তুষারে। জুতোর ভেতর বরফ গলা জল কইমাছের মতো খলবল করে উঠেছে। আঙুলগুলোয় যেন কোনো সাড় নেই। ক্রমাগত সংকোচন প্রসারণ করে চললেও আঙুলের ঘুম ভাঙছে না। টিমের কেউ কেউ বেশ পিছিয়ে পড়েছে। বাধ্য হয়ে দুপুর আড়াইটে নাগাদ একটা হাম্প-এর ওপর টেন্ট পিচ করা হল। যার ডাইনে, বাঁয়ে, ঈশাণ, নৈবর্তে কী যে আছে কিছুই বুঝতে পারিনি। শুধু চেষ্টা করা হয়েছে উলটানো গামলার মতো হাম্পটার যথাসম্ভব মাঝখানে টেন্টগুলো পিচ করতে। যাতে রাতবিরিতে হাওয়ার ধাক্কায় নেইল খুলে তাঁবুগুলো গড়িয়ে না যায় এই হরিপদ কেরানিদের নিয়ে।

পৌনে তিনটে নাগাদ তাঁবুতে ঢুকেছি। সুমন আমাদের জুতোগুলো তাঁবুর সামনেই প্লাস্টিকে ঢেকে দিয়েছে। মোজা খুলতেই বেরিয়ে পড়েছে মড়ার মতো রক্তশূন্য ফ্যাকাসে পদযুগল। আঙুলগুলোতে সাড় না থাকার কারণে রীতিমতো যন্ত্রণা শুরু হয়েছে। সবাই মিলে ঘষে ঘষে পা গরম করার চেষ্টা করেছি। আমরা সবাই পা নিয়ে পড়লেও মলয়দা উঠে পড়ে লেগেছে তার ঠোঁট জোড়া নিয়ে। ঠাণ্ডায় চষা খেতের মতো ফাটা ঠোঁট দুটো দাদাকে গতকাল থেকেই ভোগাচ্ছে। তবে আজকে তা রীতিমতো রক্তাক্ত। একটা সময় বিজেন্দ্র চা দিয়ে গেছে। আমরা আয়েশ করে চায়ের কাপে চুমুক দিলেও, মলয়দার কাপের সঙ্গে চুম্বনপর্বের দৃশ্যায়ন আমাদের কাছে হাসির খোরাক হয়েছে। যদিও বেচারার কাছে তা হয়ে উঠেছে বাস্তবিকই বেদনাদায়ক।

আমাদের সান্ধ্য আড্ডাটা আজ আর জমেনি। প্রায় সাত ঘণ্টার টানা স্নো মার্চ সঙ্গে পাস ক্রশের ধকল বিধ্বস্ত করেছে সকলকেই। যে শঙ্খদা সাজুগুজু করে প্রত্যেকদিন আমাদের টেন্টে চলে আসে আড্ডা আর সিগারেটের লোভে সেই লোকটাও আজ অনুপস্থিত। আধশোয়া হয়ে আমরা চারজন কিছুক্ষণ বকবক করেছি। খুব একটা প্রাণ ছিল না তাতে। কিছুক্ষণ বাদেই বিশু ফুরুৎ ফুরুৎ

করে নাক ডাকতে শুরু করেছে। মলয়দাও মড়ার মতো নির্জীব হয়ে এককোণে লম্বা হয়েছে। আমি আর সুমন কিছুক্ষণ রুট নিয়ে বকবক করার পর যে যার মতো থেমে গেছি। বাইরে আবার স্নো-ফল শুরু হয়েছে টের পাচ্ছি। হিমালয়ের বেপরোয়া হাওয়া ধাক্কা মারছে টেন্ট আউটারে। এ অবস্থায় কতক্ষণই বা চুপ করে থাকা যায়। ক্যামেরাটা বার করে আজকের তোলা ছবিগুলো দেখতে দেখতে একসময় হালকা তন্দ্রা নেমে এসেছে দু-চোখ জুড়ে।

—"ডিনার লিজিয়ে দাদা", বাইরে মহাবীরের গলা।

টেন্টের জিপার খুলতেই ডিনারের সঙ্গে ফাউ হিসাবে ভেতরে ঢুকেছে ঠাণ্ডা হাওয়া আর ফ্লেক্সের কুচি। ডিনার দিয়েই মহাবীর আর দাঁড়ায়নি। দৌড় দিয়েছে কিচেন টেন্টের আশ্রয়ে। গরম ঝোল ঝোল ম্যাগী মুখে দিয়েই অমৃত লেগেছে। এইসময়গুলোতে মুখে কিছু পড়লেই ভালো লাগে। আর সেটা যদি গরম কিছু হয় তাহলে তো 'রাজভোগ'। মলয়দা বাদে সকলেই বেশ তৃপ্তি করে খেয়েছে। অনুষ্ঠান বাড়িতে লিপস্টিক চর্চিত মহিলারা যেভাবে লিপস্টিক বাঁচিয়ে মুখে খাবার তোলে, দাদা অনেকটা এভাবেই মুখে তুলেছে খাবারটা। দেখে খারাপ লাগলেও হাসি চাপতে পারেনি কেউই। বদলে কপালে জুটেছে মলয়দার শাপশাপান্ত।

সন্ধে সাড়ে সাতটায় যখন স্লিপিং ব্যাগে ঢুকেছি, বিশুর মোবাইলে তখন বেজে চলেছে যেশু দাসের— "যব দীপ জ্বলে আনা"। বাইরে তখন খ্যাপা হাওয়া আর অবিরাম হিমাণী সম্প্রপাত। সেই যুগল রুদ্রনাদের মধ্যেও একসময় নেমে এসেছে ঘুম, এই তুষারমৌলি হিমালয়ের বুকে।

চতুর্থ দিন
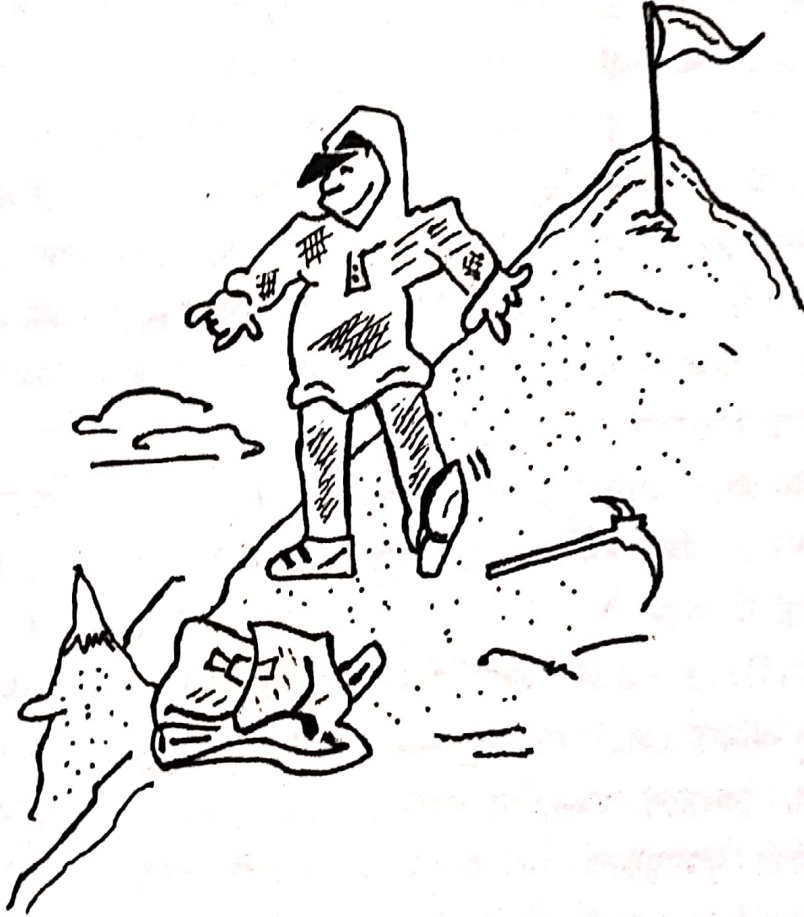
আরবি অনুযায়ী 'তানবীর' শব্দের অর্থ 'আলোকিত' আর 'মোকাম্মেল' মানে সম্পূর্ণ। চতুর্থ দিনের সকালটা ঠিক এরকমই — 'সম্পূর্ণ আলোকিত'। যেন

পুরো একখানা ওয়ার্ডসওয়ার্থ এর কবিতা বইয়ের পাতা থেকে উঠে এসে ধরা দিয়েছে চোখের সামনে। অবশ্য ওয়ার্ডসওয়ার্থ কবিতার মধ্যে দিয়ে প্রকৃতির যে ছবি আঁকতেন তার সঙ্গে সবটাই যে সাযুজ্যে ভরপুর এমন দাবি করছি না। তবে ওনার কবিতা মানেই চোখের সামনে প্রকৃতির যে 'পিকচার পোস্টকার্ড'-টা ভেসে ওঠে, আজকের সকালটাও যেন ঠিক তেমনই। মাথার ওপর ঝকঝকে নীল পরিষ্কার আকাশ, চারদিকে তপস্বীর বৈরাগ্য নিয়ে সারিসারি সব পাহাড়ের সারি, ঢেউ খেলানো বর্ফিলি সীমাহীন প্রান্তর আর মন ভালো করা নরম রোদ্দুর। চরাচরের সেই শুভ্রপবিত্র, ধ্যানমন্দ্রিত, অনির্বচনীয় রূপের দিকে চেয়ে থাকলে চোখের শুশ্রূষা হয়, মনের আরাম হয়। বন্ধুতা উসকে ওঠে।

আমরা যে হাম্প-টার ওপর টেন্ট পিচ্ করেছি তার কাছাকাছি দুটো রিজ্ পেরিয়ে একটু দূরে পুবদিকে দিকচক্রবাল ঘেঁষা আড়াআড়ি এক বিশাল কর্ডিলেরার সাম্রাজ্য। নন্দাদেবী বায়োস্ফিয়ারের অন্তর্গত সেই কর্ডিলেরা সাম্রাজ্যের অধিপতিরাও সব নামজাদা। নন্দাদেবী, সুনন্দাদেবী, দুনাগিরি, ঋষি, কলঙ্ক, নন্দাখাত, হনুমান টিব্বা, মাইকতোলি, ত্রিশুল, মৃগথুনি, নন্দাঘুন্টি, নন্দাকোট সহ আরও অনেক অভিজাত পিক্-এর ছড়াছড়ি। আর ঠিক কোণাকুণি উত্তর পশ্চিম দিকে রয়েছে নীলকণ্ঠ আর পার্বতী। থোকা থোকা সাদা মেঘ আর রোদ্দুর ধোঁয়া উজ্জ্বল নীল আকাশের নীচে প্রত্যেকটা পিক্ তার নিজস্ব জ্যামিতিক আকৃতিতে, নিজস্ব গরিমায়, আভিজাত্যে যুগ যুগ ধরে অবিচল। সময় যেখানে থমকে আছে ইতিহাসের হাত ধরে।

সবার মাঝে আমার চোখ আটকে আছে নন্দাদেবীর দিকে। নন্দাদেবী উচ্চতায় ৭৮১৭ মিটার। আর নন্দাদেবী থেকে একটা সরু রিজ্ অল্প ঢেউ খেলে গিয়ে মিশেছে যে পর্বতশীর্ষে, তার নাম নন্দাদেবী ইষ্ট বা বর্তমানে সুনন্দাদেবী। উচ্চতা ৭৪৩৪ মিটার। হিমালয়, কারাকোরাম আর আল্পসের যে সমস্ত পিক্ আমায় ছোটো থেকেই টানে তারমধ্যে এই 'টুইন পিক্' সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। কৈলাশে যেমন শিব, কুমায়ুনে তেমন নন্দাদেবী। সমগ্র কুমায়ুনের জাগ্রত দেবতা। কুমায়ুনের দুর্গা। তাঁর নামেই মাউন্ট নন্দাদেবী।

অনেকের কাছে একটা পিক্ মানে শুধুমাত্র কঠিন গ্র্যানাইটের ওপর তুষারের প্রলেপ। আরোহীসুলভ মানসিকতায় শৃঙ্গ আরোহণেই তাদের চরম তৃপ্তি, একমাত্র মোক্ষ। আবার কারোর কাছে এক একটা শৃঙ্গ রূপকথার মতো, অপার্থিব এক

স্বপ্নের নাম। উচ্চতা বা আরোহণের জটিলতার মাত্রা তাদের কাছে একমাত্র বিবেচ্য নয়। এই দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য, ভাবনার বৈচিত্র্যই আলাদা করে দেয় একজন নিছক 'পর্বতারোহী'-র থেকে একজন 'মানুষ'-কে। যেমন, রেইনহোল্ড মেসনার। এনারাই কালজয়ী, মানুষ এদের জন্যই মনে পাকাপাকি আসন বিছিয়ে রাখে। প্রসঙ্গের উল্লেখ করলাম এই কারণেই যে কত ঘটনা, কত গল্প, কত ইতিহাস আর কত বৈচিত্র্যপূর্ণ 'মুখ' জুড়ে আছে এই দুই পর্বতশীর্ষকে নিয়ে।

মাউন্ট নন্দাদেবীর কথা মনে এলেই মনে পড়ে বিখ্যাত পর্বতারোহী উইলি আনসোল্ড এর কথা। যাঁকে বলা হয়— "The father of experimental education." ১৯৬৩ সালে এভারেস্ট ওয়েস্ট রিজ্ ক্লাইম্ব করা পাহাড় পাগল মানুষটা নিজের মেয়ের নাম দেন নন্দাদেবী। ভাগ্যের এমনই পরিহাস ১৯৭৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মাউন্ট নন্দাদেবী ক্লাইম্ব করছিলেন বাবা ও মেয়ে একসঙ্গে। ক্যাম্প ফোর-এর কাছাকাছি একটা স্লোপ-এ গড়িয়ে পড়ে যান নন্দাদেবী আনসোল্ড। দেহ উদ্ধার করা হয়। তারপর বাবা উইলি 'মাউথ টু মাউথ রেসপিরেসন'-এর মাধ্যমে মেয়েকে বাঁচিয়ে তোলার অন্তিম চেষ্টা চালিয়ে যান। কিন্তু ক্রমশ নন্দাদেবীর ঠোঁটজোড়া ঠান্ডা আর শক্ত হয়ে আসে। নিথর মেয়ের দিকে তাকিয়ে উইলি ভেঙে পড়েন কান্নায়। মাত্র বাইশ বছর বয়সে পৃথিবী ছাড়েন নন্দাদেবী আনসোল্ড। ক্যাম্প ফোর-এর কাছাকাছিই তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। নিজের নাম যে পাহাড়ের নামে সেখানেই বাকীজীবন শান্তির ঘুমে রয়ে গেলেন নন্দাদেবী আনসোল্ড। পরে এক সাক্ষাৎকারে উইলি-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, মেয়ের মৃত্যুর পরেও উনি কি করে এখনও ক্লাইম্ব করেন? উইলির জবানীতেই তাঁর উত্তরটা তুলে দিচ্ছি— "What you want me to die of a heart attack, drinking beer, eating potato chips, and watching a golf tournament on TV???" ঘরের ফায়ারপ্লেসের ওপর রাখা ফটো স্ট্যান্ডে তখন জ্বলজ্বল করছে নন্দাদেবী আলসোল্ড-এর হাসিমুখের প্রতিকৃতি।

ভোলা যাবে না ১৯৩৬ সালে নন্দাদেবী শীর্ষের সফল অভিযাত্রী বিল টিলম্যানের বক্তব্য, "সবার ওপর যে অনুভূতি সেদিন মন প্রাণ আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, তা যেন এক অপরাজেয় দৈত্যের লুটিয়ে পড়া দেখবার করুণ অভিজ্ঞতা।"

এভাবেই হিমালয়ের সুন্দর-কে কেউ খুঁজতে আসে দেবতার নামে, কেউ আবার হিমালয়ের সৌন্দর্যে খুঁজে পায় অন্তরের পরশপাথর। আবার কেউ বা ঝালিয়ে নেয় নিজের অ্যাডভেঞ্চারাস এবং ন্যাচারাল ইনস্টিংক্ট। কারণটা যাই হোক না কেন আরোহণ আদতে যে এক নেশা তা Andy Kirkpatrick-এর বক্তব্যটা দারুণ ভাবে তুলে ধরে, "Climbing is like a lover and your wife knows this. Whenever you are together, no matter how much you love your family, your thoughts are only of your lover, of climbing."

সামনে একগাল হাসিমুখ নিয়ে ধোঁয়াওঠা চায়ের কাপ বাড়িয়ে ধরেছে রাজু। বেচারা কথা বলতে পারে না, শুনতেও পায় না। তবু ওই হাসিমাখা সরল পাহাড়ি মুখটায় যেন কত কথা লেখা আছে। ঠিক প্রকৃতির মতোই। নীরব অথচ কত সরব, সরস উপস্থিতি।

চা-টা হয়েছে কিন্তু চমৎকার। চিনিটা বেশি, যা আমি কলকাতায় খাই না। তবে পাহাড়ের পথে ক্যালোরি যোগানোর জন্য যথার্থ।

টেন্ট প্যাক করার কাজ চলছে। এদিকে ব্রেকফাস্টও প্রায় তৈরি হয়ে এসেছে। কালকের ভিজে যাওয়া জুতোগুলো রোদ্দুর-এ শুকিয়ে নেওয়ার পালাও প্রায় সাঙ্গ। ধূ ধূ বরফের শুভ্রতার মাঝে আমাদের রঙিন টেন্টস, জামাকাপড়, রুকস্যাকগুলো বেশ একটা কনট্রাস্ট এনেছে। দেখতে বেশ লাগে। একটু দূরে কিচেন টেন্টে লো পিচে হিসহিসিয়ে জ্বলছে স্টোভ।

ডানবাহুতে একটা টোকা খেয়ে পাশ ফিরেছি। শঙ্খদা আমার দিকে একটা সিগারেট আলতো করে বাড়িয়ে উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে নন্দাদেবী সাম্রাজ্যের দিকে। কিছু বলব ভেবেও চুপ করে গেলাম। দাদার 'প্রকৃতি মৌতাত'-টা নষ্ট করার আমার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই। এমনিতে শঙ্খদা মোটেও দার্শনিক টাইপ ক্যারেক্টার নয়। ওর ভাবনা চিন্তার মধ্যে গুঢ় তত্ত্ব খুঁজতে যাওয়া বোকামো। কিন্তু প্রকৃতি এমনই যে সে বোধহয় সব মানুষকেই দার্শনিক করে তোলে।

নন্দাদেবী ইষ্ট-এর দিক থেকে একটা পাতলা সাদা মেঘের চাদর ভেসে যাচ্ছে নন্দাদেবীর দিকে। যেন 'টুইন পিক্' দুটোর মাঝখানে একটা ব্রিজ। আমি জুতো-গলিয়েছি পায়ে। বিশু আমার স্যাকে স্লিপিং ম্যাট্রেসটা জুত করে বেঁধে দিয়েছে। মিনিট দশেকের মধ্যেই ছেড়েছি আমাদের কালকে রাতের অস্থায়ী

আস্তানা। মঙ্গল আর বলবীর এখন জমা হওয়া প্লাস্টিক আর পিচবোর্ডে আগুন ধরিয়েছে। কিছুটা জায়গা জুড়ে সাদা বরফের বুকে নিঃশব্দে ছড়িয়ে পড়েছে সভ্যতার কলঙ্ক ছাপ।

মলয়দার বোধহয় আর একটু আয়েস করার ইচ্ছে ছিল। আয়েস করে এতক্ষণ একটা স্লিপিং ব্যাগ পেতে শুয়েছিল। কিন্তু সলিলদা তাড়া দিয়ে বেচারাকে পথে নামিয়েছে। অতি অনিচ্ছায় বেচারা স্যাক তুলেছে কাঁধে।

কিছুটা পথ বরফের উঁচু নীচু হাম্প পেরিয়ে একসময় স্তূপীকৃত বরফের ঢাল পেরিয়ে নীচের দিকে নামা শুরু হল। কিছুটা এভাবেই নামার পর আবার একটা তুষার চড়াই। চড়াইটা পেরিয়ে যে জায়গাটায় উঠে এলাম সেখানে কিন্তু আর এগোনোর সে অর্থে কোনো রাস্তা নেই। চড়াইটা প্রায় শিয়ার ড্রপ করেছে অনেক নীচে বরফের এক উপত্যকায়। আর সেখান থেকেই প্রায় সোজা উঠে গেছে রোদ্দুর ধোয়া ঝকঝকে এক অনামা শিখর। মঙ্গল সিং-ও দাঁড়িয়ে পড়েছে।

— ''কাঁহাসে যানা হ্যায়'', আমি প্রশ্ন ছুঁড়েছি।

— ''ওহি তো দেখ্ রাহা হুঁ'', মঙ্গল আনমনেই উত্তর দিয়েছে।

আসলে ও কিছুটা ভুল করেছে। আরও আগেই আমাদের বাঁ দিক ধরে নামা উচিত ছিল। এখন বাঁ দিক ধরে নামাটা শরীরের ভারসাম্য রাখার পক্ষে বেশ কষ্টকর।

মঙ্গল গ্লিসেইডিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

এই গ্লিসেইডিং বেশ এক মজার খেলা। বেশ কিছুটা পথ কম সময়ে অনায়াসে অতিক্রম করা যায়। আইস্ বা স্নো দুরকম সারফেস-ই গ্লিসেইডিং-এর জন্য উপযুক্ত তবে গ্র্যাডিয়্যান্ট যথাযথ হতে হবে। ছোটোবেলায় আমরা যেভাবে পার্কে স্লিপ-এ চড়েছি ব্যাপারটা প্রায় তাই। শুধু গতি কমাবার, বাড়াবার বা থামাবার জন্য গোড়ালির ওপর ভর দিয়ে বা আইস অ্যাক্সের সাহায্য নিতে হয়। তবে 'সেল্ফ অ্যারেস্ট' করার কায়দাটুকু ভুলভাল হলে খাদের দিকে গড়িয়ে যাবার সম্ভাবনাটুকু পুরো মাত্রায় থাকে।

প্রথমে বাঁ দিকে ডায়াগোনালি কিছুটা ট্রাভার্স করে তারপর নীচের দিকে গ্লিসেইড করা শুরু করেছি জোড়ায় জোড়ায়। আমার সঙ্গী সুমন। সামনে আমি। আমার কোমরের দু-দিক দিয়ে পা ছড়িয়ে সুমন পিছনে। সামনে থাকার

দরুণ আমিই এক্ষেত্রে চালক বলা যেতে পারে। পাহাড়ে ওয়াকিং স্টিক আমি সেভাবে কখনও ব্যবহার করিনি। কিন্তু কখনো-কখনো গিয়ারটা বেশ কার্যকরী। যেমন এক্ষেত্রে। আইস অ্যাক্স আমার কাছে না থাকার দরুণ সুমনের থেকে ওয়াকিং স্টিকটা চেয়ে নিয়েছি। ডাইরেকশান্ চেঞ্জ করার জন্য দুটো পায়ের সঙ্গে স্টিকটাও দিব্যি কাজে দেবে।

সলিলদা স্টার্ট করেছিল একা। পিছনে আমি আর সুমন। ছোটোবেলায় স্লিপ-এ চড়ার সময় যেমন একটা স্ফূর্তির চিৎকার করতে করতে নামতাম, সুমন-ও আমার পিছনে বসে ওরকমই চিৎকার জুড়েছে। পাহাড় আমাদের বয়সের কৃত্রিম বাকলটা ছিঁড়ে বার করে আনে শৈশব অথবা কৈশোরকে। আমি প্রত্যক্ষদর্শী, বারেবারে। হু হু করে কানের দু-পাশ দিয়ে বাতাস কেটে বেরিয়ে যাচ্ছে আর দুপায়ের দ্রুত সঞ্চালনায় আমরা নেমে যাচ্ছি নীচে। মাঝেমধ্যে বাঁ দিকের খাদ থেকে নিজেদের তফাতে রাখতে কোমর আর পায়ের সাবলীল মোচড়ে ডাইরেকশান্ চেঞ্জ করেছি ডানদিকে।

শঙ্খদা মাঝপথে একটু আটকেছিল। গ্লিসেইডিং-এর সময় পায়ের নীচে বরফের স্তূপকে এড়াতে মাঝেমধ্যে গোড়ালিটাকে একটু তুলতে হয়। তাতে বরফ স্তূপকে এড়িয়ে চলা যায়। দাদা গোড়ালি দুটো না তোলার কারণেই বোধহয় আটকেছে। শঙ্খদাকে আটকে যেতে দেখে সলিলদা নীচে দাঁড়িয়ে উইকেটকিপারের স্টাইলে পজিশন নিয়েছে মজা করে। শঙ্খদা নেমেও এসেছে নির্বিঘ্নে।

মলয়দা নেমে আসা অবধি একটাই কথা বলে যাচ্ছে — "এই আমার প্যান্ট-টা তো ভিজে গেল"। সলিলদা আর থাকতে না পেরে মলয়দার পশ্চাদদেশে একটি সবুট বন্ধুত্বপূর্ণ পদাঘাত করেছে। মলয়দা ঘুরে তাকিয়ে সিরিয়াস ভঙ্গিতে বলে উঠেছে— "এতে কি আমার পিছনটা শুকোবে?"

মঙ্গল সিং সবার শেষে বেদাতী বউদিকে নিয়ে নীচে নেমেছে। শেষ হয়েছে প্রায় দুশ ফুটের গ্লিসেইডিং পর্ব।

আরও প্রায় ঘণ্টাখানেক চড়াই উৎরাই-এর স্লো মার্চ পর্ব শেষ করে পৌঁছেছি এমন এক জায়গায়, যেখানে ইতিউতি কালো কালো বোল্ডারের দল তুষার থেকে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে ঔদ্ধত্যের নিদর্শন স্বরূপ। ক্রমশ আরও এগিয়েছি। আজকে আমাদের লক্ষ্য ক্ষীরাও নালার স্নাউট। একসময় বোল্ডারের সঙ্গে ধূসর ঘাসেদেরও দেখা মিলেছে। নেমেছি আরও উৎরাইয়ে। থেমেছি

অনেকটাই তুষারমুক্ত পাহাড়ের ঢালে।

সঙ্গের বোতলের জল ফুরিয়েছে। তেষ্টায় ছাতি ফাটছে। অনেক কষ্টে পাহাড়ের খাঁজে বয়ে চলা আক্ষরিক অর্থেই সুতোর মতো একটা স্ট্রিম থেকে বোতলের ছিপিতে একটু একটু করে জল ভরেছে পোর্টার সুরজ। একটা বোতল ভরতেই বেশ সময় লেগেছে। ইতিমধ্যে পোর্টারদের মধ্যে সবচেয়ে বয়স্ক মদন আর থাকতে না পেরে এক জায়গায় জমে থাকা নোংরা ঘোলা জলেই হাঁটু মুড়ে ঠোঁট ডুবিয়েছে। সেই দেখে হাসির হুল্লোড় উঠেছে সবার মধ্যে। আমি চট করে ক্যামেরা বার করে সাটার টিপেছি। সাবজেক্ট হিসাবে বেশ ইন্টারেস্টিং।

স্যাক নামিয়েছি শুকনো ঘাসের একটা জায়গা দেখে। আয়েস করে আধশোয়া হয়েই চোখ বুলিয়েছি চারিদিকটায়। জায়গাটা কিন্তু বেশ। অনেক নীচে সবুজ ঘাসের গালিচা মোড়া এক দৃষ্টিনন্দন বুগিয়াল। সামনে প্রায় গায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে আছে একগাদা পাহাড়ের সারি। যাদের গায়ের কালো পাথরে অবিন্যস্তভাবে লেগে রয়েছে বরফের ছোপ। আকাশ কিন্তু এখনও বেশ ঝকঝকে। যদিও বেলা বাড়ার দরুণ মেঘেদের আনাগোনাও বেড়েছে।

দলবীর একটা জলের বোতল এগিয়ে দিয়েছে। আকণ্ঠ পান করেছি সেই বরফগলা জল, যদিও তা বেশ অপরিষ্কার।

জল খাওয়ার ফাঁকেই আলাপ হয়েছে চার-পাঁচ জন ক্ষীরাও গ্রামের মহিলার সঙ্গে। হাতে, কানে, নাকে অজস্র অলঙ্কারে ভূষিতা এই রমণীদের পরিচয় এরা জড়িবুটিওয়ালা। এক উপত্যকা থেকে অন্য উপত্যকায় শেকড়বাকড়, গাছের ছাল খুঁজে ফেরে ওষুধ তৈরির জন্য। এরাই 'হাই হিমালয়ান রক্স' থেকে নিয়ে আসে 'পাত্থর কী পসিনা' অর্থাৎ পাথরের ঘাম, যার পরিচিত নাম 'শিলাজিৎ'। কিংবা পাহাড়ি গুল্মের শিকড়, যার গুড়োকে ওরা বলে 'আতিশ', যার অর্থ উত্তাপ (ঠান্ডায় এই ওষুধ গা গরম করে বলেই হয়তো এহেন নামকরণ)। অথবা নানা উদ্ভিদের অ্যাফ্রোডিসিয়াক নির্যাস অর্থাৎ যৌন উত্তেজক দাওয়াই।

এইসব জড়িবুটিওয়ালাদের কাছ থেকে দেশের নামী ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিগুলো অল্প দামে জড়িবুটি সংগ্রহ করে। তারপর শীততাপ নিয়ন্ত্রিত রসায়ণাগারে তৈরি লাল, হলুদ, সবুজ নানারঙের ক্যাপসুল, ট্যাবলেট বা সিরাপের মোড়কে বিক্রি করে সাধারণ মানুষের মধ্যে। দাম বেড়ে যায় বহুগুণ। সবটাই

প্যাকেজিং আর অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আর কী।

হিমালয়ের পথে নানা সময়ে এইসব জড়িবুটির গুণাগুণ আমি নিজের চোখে দেখেছি। অবিশ্বাস্য ফলদায়ক। যেমন এবারে হাতেনাতে ফল পেয়েছে সলিলদা। বোল্ডারিং-এর সময় পড়ে গিয়ে হাঁটুতে চোট লেগেছিল। তাঁবুতে ফিরে পেন রিলিভিং ট্যাবলেট, স্প্রে সব কিছু করেও ব্যথাটা অনেকটাই রয়ে গিয়েছিল। পরের দিন সকালে মঙ্গল সিং একটা ভেজা পাথরের গায়ে গেঁথে থাকা খয়েরি রঙের শিকড়, আইস অ্যাক্সের পিক্-এর মোচড়ে তুলে আনল। তারপর পকেট থেকে ছুরি বার করে শিকড়-এর খয়েরি আস্তরণটা তুলে ফেলতেই গোলাপি রঙের মূলটা বেরিয়ে এল। সেটাকে পাথরের ওপর রেখে আবার আইস অ্যাক্সের এজটা দিয়ে থেঁতো করল মঙ্গল। তারপর সলিল-দার রুমালটা চেয়ে নিয়ে থেঁতো করা মূলটা ওর মধ্যে রেখে বেঁধে দিল দাদার হাঁটুতে। বিকেলে যখন সলিলদা তাঁবুতে ঢুকছে তখনই পা অনেকটাই স্বাভাবিক।

হিমালয়ের বুকে এরকম প্রচুর ঔষধি গুণসম্পন্ন গাছগাছালি, শিকড়বাকড়ের সন্ধান মেলে। যেমন, জুনিপার চটকে গন্ধ শুঁকলে ট্রেকিং-এর ক্লান্তি অনেকটা কেটে যায়। এক বিশেষ ধরনের 'লাইকেন' থেঁতো করে ক্ষতে লাগালে ক্ষত শুকিয়ে যায় তাড়াতাড়ি। আমার মতে পথের পাশে ছড়িয়ে থাকা এইসব 'ঔষধি'-চেনার ক্ষমতা থাকলে পাহাড়ে মেডিক্যাল কিট ভারী করার দরকার পড়ে না।

বুগিয়ালের দিকে না নেমে আমরা এগিয়ে গেছি একটা পাথুরে সংকীর্ণ রিজ্ ধরে। ঘণ্টাখানেক পর যে জায়গাটায় এসে থামলাম সেখান থেকে ঝুরো পাথর, ছোটো বড়ো ঘাস আর কাঁটাঝোঁপের একটা ঢাল নেমে গেছে অনেক নীচে। সোজা ক্ষীরাও নালার ধারে। ওপর থেকেই নালার জলস্রোত চোখে পড়ছে। যদিও দূরত্বের কারণে বহমানার কলেবর বেশ ক্ষীণ।

যতটা ভেবেছিলাম, ঢাল বেয়ে নামার সময় ব্যাপারটা অতটা সহজ হল না। একে ঝুরো পাথর, পা স্কিড করছে, তার ওপর কাঁটাঝোঁপ। ঘাসের সঙ্গে গায়ে গায়ে তারা এমনভাবে মিশে আছে যে ঘাসের সাপোর্ট নেওয়াটাও রিস্কি হয়ে যাচ্ছে। বিশুর ফ্ল্যাট ফুট। ফলত ঝুরো পাথরে ক্রমাগত স্লিপ করছে। প্রায় হাজার ফুটের ঢালটা ক্রমশ বিরক্তিকর হয়ে উঠেছে। নামছি ঠিকই। সেভাবে কোনও রিস্কি জোন্ও নেই। কিন্তু হোল্ড-এর অভাবে ব্যালেন্স এবং কমফর্ট

কোনোটাই মিলছে না। আমার সাধের লাল ট্র্যাকস্যুটের লোয়ার হাঁটু অবধি কাঁটার আচড়ে ছিঁড়েছে কয়েক জায়গায়। হাঁটু অবধি লোয়ার-টা যে গুটিয়ে নেব তারও উপায় নেই। সরাসরি কাঁটা বিঁধছে পা-এ।

এরই মধ্যে শুরু হল বৃষ্টি। প্রথমে ঝিরঝির তারপর মুষলধারায়। প্রায় একঘণ্টার মাথায় ঢাল বেয়ে যখন নীচে এলাম তখন প্রায় কাকভেজা। কিছুটা বাধ্য হয়েই ক্ষীরাও নালার স্নাউটের কিছুটা আগে, নালার ধারেই ফোর্থ ক্যাম্প করা হল।

জায়গাটা বেশ পাথুরে। আইস অ্যাক্স দিয়ে জায়গায় জায়গায় পিটিয়ে যথাসম্ভব সমান করে তাঁবু টাঙানো হল। বিশুর পায়ের বুড়ো আঙুল-এর হালত বেশ খারাপ। ওই হাজার ফুটের ঢালটার সঙ্গে কুস্তি করতে গিয়ে ক্রমাগত বুড়ো আঙুল ঠোক্কর খেয়েছে বুটের সঙ্গে। জায়গাটা রীতিমতো টাটিয়ে আছে।

বৃষ্টি থেমেছে। রোদ্দুরের দেখা নেই। তবে শেষ বিকেলের হালকা মায়াবী এক নরম আলো ছড়িয়ে আছে সমস্ত উপত্যকা অঞ্চলটা জুড়ে। অঞ্চলটা অনেকটা দুদিকে টানা সারি দেওয়া পাহাড়ের মাঝখানের অংশ। আর দু-দিক থেকে দুটো পাহাড়ের সারি যেখানে মিশেছে সেখানে পথরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে এক বিশাল তুষারাবৃত শৃঙ্গ। চারদিকে পাহাড়গুলোর গায়ে বরফের স্তর বৃষ্টিতে কিছুটা ধুয়ে গেছে। কল্লোলীনি ক্ষীরাও নালার স্বচ্ছ জল আপনমনে তাঁবুর পাশ দিয়ে বহমান, এক নিশ্চিন্ত স্বাচ্ছন্দে।

রাতে রুটি হবে। দলবীর আর সুরজ আটা মাখছে। বৃষ্টিতে কাঠকুটো ভিজে। মনে হয়েছিল কেরোসিন-ই ব্যবহার করতে হবে। সামনে এখনও অনেকটাই পথ। প্রায় পুরোটাই বরফের রাজ্য। সেখানে কেরোসিন ছাড়া গত্যন্তর নেই। তাই কেরোসিন বাঁচিয়ে স্নাউট অঞ্চলের কাঠগুলো দিয়েই আজ চালানো হবে এরকমই ভাবনায় ছিল। বৃষ্টি দিয়েছে পরিকল্পনা ভেস্তে। কিন্তু কী করে জানি না পোর্টাররা কাঠকুটো জোগাড় করে এনে আগুন-ও জ্বালিয়ে ফেলেছে।

সন্ধ্যে নামছে। সূর্যের শেষ আলো আস্তে আস্তে ছেড়ে যাচ্ছে উপত্যকার ডানা। তাঁবুগুলোতে জ্বলে উঠেছে মোমবাতি। আমি মেস্টিনে কিচেন টেন্ট থেকে গরম জল এনে বিশুকে দিয়েছি আঙুলে কমপ্রেস করার জন্য। ওয়েস্ট পাউচে রাখা ডেটল আর বোরিক তুলো আজই প্রথম কাজে লাগছে।

বউদির রান্নার হাতটা বেশ ভালো। কলকাতায় থাকলে আমরা মাঝে মধ্যেই দাদা বউদির বাড়ি হানা দিই হরেকরকম লোভনীয় খাদ্যদ্রব্যের লোভে। বউদিও বেশ যত্ন করে নানারকম রান্নাবান্না করে আমাদের পেটুকে পেট-কে তৃপ্ত করে। আজও বউদি চলে গেছে কিচেন টেন্টে। অস্থায়ী রান্নাঘরের কাছে একটা বোল্ডারের ওপর বসে সুরজ, মহাবীরদের ইনস্ট্রাকশান্ দিয়ে চলেছে। ওরাও মেন শেফ্-এর নির্দেশ মেনে ট্রেনি শেফ্দের দায়িত্ব পালন করে চলেছে যথাযথ ভাবে।

তাঁবু ছাড়িয়ে কিছুটা হেঁটে গেছি ক্ষীরাও গঙ্গার ধার ঘেঁষে। পাহাড়ে এই ক্ষীণকায়া খরস্রোতাগুলো আমার বেশ লাগে। এ যেন প্রকৃতির আশ্বাসের ভেতর সেই কোন আদিম ইভ্-এর বাহুপাশ। সারাদিনের শেষে এদের পাশে দু-দণ্ড পা ছড়িয়ে বসলে মনের পরতে পরতে এক অদ্ভুত উষ্ণতার ছোঁয়া পাই। নিস্তব্ধ রিভার বেড-এ একাকীত্বের সঙ্গী হওয়ার অভিজ্ঞতা যাদের আছে তাঁরা সদর্থক বুঝবেন আমার এই অনুপম উদাসী অনুভূতি। নীরব অন্ধকারকে আশ্বস্ত করে তাঁবু জুড়ে একে একে জ্বলে উঠেছে আলো। সন্ধ্যের নিকষ কালোর বুক চিরে জ্বলে ওঠা সে আলোয় উপত্যকা জুড়ে যেন গর্ভবতীর পূর্ণতা। একটা চ্যাটালো পাথরের ওপর বসে নিঃশব্দে ছুঁয়েছি ক্ষীরাও-কে। চোখে মুখে ছিটিয়েছি শীতল বহমানতা। এক না বোঝাতে পারা ভালোলাগা পাকে পাকে জড়িয়েছে আমায়। নালার সঙ্গে-ই বয়ে আসা ঠাণ্ডা হাওয়া ঝাপটা দিয়ে গেছে সর্বাঙ্গে। চারদিকের নিথর সাদা কালো পাহাড়ের সারি নিঃশব্দে জরিপ করেছে এক অচেনা আগুন্তুক-কে। টিপ টিপ করে শুরু হয়েছে মনকেমনের বৃষ্টি।

"ডাক্তার, এদিকে এসো, চা হয়ে গেছে"— সন্ধ্যের নিঃস্তব্ধতা চিরে, দূর থেকে ভেসে এসেছে স্বর্ণেন্দুর গলা।

অভিমানী ক্ষীরাও-কে একা রেখেই তাঁবুর বোল্ডার বন্ধুর পথ ধরেছি, এই একান্ত অনিচ্ছুক আমি।

রাতে শোওয়ার পর টের পেয়েছি যতই পিটিয়ে জমি সমান করার চেষ্টা হোক না কেন, স্লিপিং ম্যাট্রেস-এর তলা থেকে একটা বেয়াড়া পাথর ক্রমাগত আমায় গুঁতিয়ে গেছে। মনে পড়েছে আমার ছোটোমামার একটা কথা। প্রায়শই বলতেন। কথাটা আদতে যীশু খ্রিস্টের — "The Foxes have holes & the birds of the air have nests; but the son of man hath no

where to lay his head." অর্থাৎ মুক্তপুরুষের জন্মভূমিও নাই, আবাসভূমিও নাই। আমি তো আর মুক্তপুরুষ নই, সে যোগ্যতাও আমার নেই। তবে এই বেয়ারা জমিতে ততোধিক বেয়াড়া পাথরের গুঁতো সহ্য করেও আমাকে শবাসনে পুরো রাতটা যে কাটাতে হবে এটা ভেবেই বেশ আত্মপ্রসাদ লাভ করলাম।

রাতে আবার বৃষ্টি নেমেছে।

জাপানের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে সমুদ্রপারের এক গ্রামে ১৭৫৮ সালে রিয়োকোয়ানের জন্ম। শ্রমণ রিয়োকোয়ানের এই চারটে লাইনের সঙ্গে আমি পাহাড়ের পথে এক আত্মিক যোগাযোগ পাই। যতবার কবিতাটা মনে পড়ে ততবার মনে হয় সহজ, স্বতঃস্ফূর্তভাবে বয়ে যাওয়া শব্দবন্ধগুলো যেন আমার আত্মার কথা বলছে। আমি ঠিক যেমনভাবে পাহাড়কে ছুঁতে চাই, হাত বোলাতে চাই স্বত্তার গভীর থেকে, সহজভাবে ঠিক সেকথাই যেন প্রকাশ পেয়েছে রিয়োকোয়ানের কলমে।

'আবসাঁৎ'। বলা হয় দুনিয়ার সবচেয়ে মারাত্মক মাদক দ্রব্য। শতকরা আশিভাগ তাতে অ্যালকোহল। এ মদ মানুষ তিন-চার বছরের বেশি খেতে পারে না। তারই ভেতরে হয় আত্মহত্যা করে, নয় পাগল হয়ে যায়, না হয় অ্যালকোহলিক বিভীষিকা দেখে দেখে এক মারাত্মক রোগে চিৎকার করে করে শেষটায় ভিরমি খেয়ে মারা যায়। ইঁদুর ছানার নাকের ডগা এ মদে একবার চুবিয়ে নিয়ে ছেড়ে দিলে সে মিনিট তিনেকের ভেতর ছট্‌ফট্‌ করে মারা যায়। 'আবসাঁৎ' এর কথাটা উল্লেখ করলাম পাহাড়ের পথে চলার উদগ্র নেশাটা বোঝাতে। এ এমন এক নেশা যেখানে শত দুর্ভোগ, দুর্বিপাক, শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা এমনকি মৃত্যু আছে জেনেও কিছু মানুষ পরিবার, পরিজন, কেরিয়ার সব ছেড়ে এগিয়ে যায়। ওই তুষারাবৃত বন্ধুরতা, ওই ন্যারো রিজ্, ওই যুগান্তরের পাথরের বুক চিরে বয়ে চলা নির্ঝরের করুণাধারা তাদের চুম্বকের মতো টানে। আমি নিশ্চিতভাবে এই সমস্ত পাহাড় পাগলদের মতো বেপরোয়া, অ্যাডভেঞ্চারাস বা শারীরিক ও মানসিক শক্তির অধিকারী নই। তবু আমি আমার মতো করেই পাহাড়ের দুর্গম জমিতে আমার 'স্বপ্ন বসত' বানাই। প্রয়োজন এবং প্রফেশানের কারণে মেগাসিটিতে পড়ে থাকলেও মন পড়ে থাকে ওই অরণ্য, পাষাণ আর তুষারের শান্তি রাজ্যে।

এই বইয়ের পাণ্ডুলিপি লেখার সময় বারেবারেই নিজের ভেতর থেকে একটা প্রশ্ন উঠে এসেছে — কেন আমি লিখছি? আমার কলমে তো শঙ্খ ঘোষ, নবনীতা দেবসেন, জন রসকেলি বা জন মুরের মাহাত্ম নেই। কাঞ্চনজঙ্ঘা, K_2 বা নাঙ্গা পর্বত অভিযানের মতো এই পানপাতিয়া অভিযান তো সে অর্থে 'GRANDE COURSE' এর মধ্যেও পড়ে না। দু-চারটে ট্রাভেল ম্যাগে ছোটোখাটো লেখা বেরোলেও এতটা বড়ো পরিসরে তো নিজেকে প্রকাশ করার

অভিজ্ঞতাও নেই। তবে কেন? বারে বারে উঠে আসা এ প্রশ্নের একটাই উত্তর দিয়েছে আমার অন্তরাত্মা। তা হল — এতগুলো বছর ধরে পাহাড়ের পথে হাঁটার মধ্যে ছড়িয়ে আছে যেসব অসংখ্য ভালোলাগা, যেসব অন্তহীন নির্ভেজাল আবেগ, তার নিষ্কলুষ ছোঁয়া দিতে চেয়েছি কিছু সমমনস্ক সমঝদার মানুষকে। যাঁরা পাহাড়ের অন্দরমহলে খুঁজে বেড়ান বেঁচে থাকার বীজমন্ত্র। পুঁথিগত বিদ্যার বাইরেও অজানাকে জানার আর অচেনাকে চেনার অদম্য নেশা আছে যাঁদের। তাঁদের সঙ্গে ছাপার অক্ষরে এ আমার এক 'আবসাঁৎ মোলাকাত'।

আজ ১৫ জুন, শুক্রবার। গত রাত মোটামুটি নিদ্রাহীন কেটেছে। জায়গাটা এতটাই অসমান যে অনেকেরই গতরাতে পিঠে, কোমরে আর পশ্চাদদেশে পাথরের খোঁচা নিয়তি ছিল। বিশুর পা গতকাল সন্ধের কমপ্রেসের পর কিছুটা বেটার। বুড়ো আঙুলে মোটা করে কটন প্যাড আপ করে তাতে লিউকোপ্লাস্ট জড়িয়ে দিয়েছি ভালো করে। জানি পুরোটা রাস্তা হয়তো ব্যান্ডেজটা থাকবে না। তবে যতটুকু পথ থাকে ততক্ষণ পথ চলাটা অন্তত কিছুটা আরামদায়ক হবে।

রাতে ঘুম না হওয়ায় সকালে আলস্যটা ঠিক কাটছে না। গরম কড়া চা-টা খেয়ে তবু কিছুটা ভালো লাগল। গায়ে হাতে পায়ে বেশ ব্যথা। কালকে পথের শেষ পর্যায়ে ওই প্রায় হাজার ফুটের বীভৎস উৎরাই আর রাতের বোল্ডার-শয্যাই এহেন গা ব্যথার জন্য দায়ী। ভাবলাম একটা প্যারাসিটামল খেয়েইনি ব্রেকফাস্টের পরে। পাহাড়ের পথে ওষুধপত্র খুব দরকার না পড়লে আমি খাই না। পাহাড়ি পরিশ্রমের সঙ্গে বডি ফিজিওলজি যতটা পারা যায় মানিয়ে চলাই ভালো। না হলে রিফ্লেক্স ভোঁতা হওয়া, সাডেন অ্যাটিটিউড চেঞ্চ এগুলো অনেক সময়ই দেখা দেয়। তাই এক্ষেত্রেও নিবৃত্ত করেছি নিজেকে।

পোর্টাররা রুটি তৈরি করে এক অদ্ভুত কায়দায়। ছোটো থেকে বাড়িতে দেখে আসা মা-ঠাকুমাদের স্টাইল এখানে অদৃশ্য। বেলুন চাকির ফান্ডা একেবারেই নেই। মোটা মোটা লেচিগুলো দু-হাতের তালুতে থাবড়ে থাবড়ে আকারে অনেকটা বড়ো করে। পুরো গোলাকার হয়তো হয় না। তবে সেঁকার পর বেশ রুটির আকার-ই নেয়। আমরা বেশিরভাগ সকাল ম্যাগির ওপর থাকলেও, মঙ্গল আর ওর দলবল কিন্তু রুটিতেই ভরসা রেখেছে। আমি রাজুর থেকে একটা রুটির অর্ধেক ছিঁড়ে নিয়ে ওকে কিছুটা ম্যাগি দিয়েছি। ও যথারীতি

একগাল সরল হাসি দিয়ে প্রত্যুত্তর দিয়েছে।

সলিলদা মানুষটা অদ্ভুত। সকাল থেকেই নিজেকে খুব পরিপাটি করে তৈরি করে। পোশাক, জুতোর পরিচর্যা, স্যাক গুছোনো, মুখে সান স্ক্রিন মাখা সব ব্যাপারেই বেশ যথাযথ। নিজের কোনো ব্যাপারে কাউকে অযথা ইনভলভ করে না। পাহাড়ের পথে ঘুরে বেড়ানো এরকম অনেক মানুষ দেখেছি যারা কিন্তু যথেষ্ট স্বনির্ভর নয়। দাদা কিন্তু ব্যতিক্রম। আজ সকালে মানুষটাকে খুঁটিয়ে দেখছিলাম। বেশ শিক্ষণীয়। সলিলদার হাঁটার পদ্ধতিটাও বেশ সুন্দর। কিছুক্ষণ হাঁটার পরপরই চারদিক তাকিয়ে 'স্ক্রিন' করে নেয়। তারপর আবার এগোয়। এবারে সলিলদা আমাকে একটা কথা বলেছিল — "একটু রিস্কি জোন-ও যদি হয়, সেখানেও হাঁটতে হাঁটতে চারদিকে তাকাবে না, তাকানোর ইচ্ছে হলে দাঁড়িয়ে তাঁকাও।" পাহাড়ের পথে এইসব আপাত ছোটোখাটো কিন্তু মহামূল্যবান টিপ্‌সগুলো দারুণ কাজের। কিন্তু আমার 'ছটফটে লগ্নে' জন্ম। যদিও এইসব টিপ্‌স আমি যথেষ্ট মনোযোগ এবং গুরুত্বসহকারে শুনি কিন্তু বিশ-পা গিয়েই বিলকুল ভুলে মেরেদি। তারপর যে কে সেই। দু-চোখে অপুর মতো হাজার বিস্ময় আর অবাকময়তা নিয়ে চলে আমার অ-ব্যকরণসম্মত পথ চলা।

মলয়দা আজ সকালে জুতো নিয়ে পড়েছে। ঠোঁটদুটো তো কয়েকদিন যাবৎ ভোগাচ্ছিলই। আজও বেশ খারাপ অবস্থা। আমি ডাক্তারি ফলানোর বৃথা চেষ্টা করে হাল ছেড়েছি। দাদাকে ক্যারি করে এমন ক্যারিব্যাগ এখনও তৈরি হয়নি। ঠোঁটের সঙ্গে এবার জুতোজোড়াও বিট্রে করেছে। আপাতদৃষ্টিতে জুতোটায় বেশ দেখনদারী থাকলেও কাজের বেলা কার্যকরী নয়। দাদা নাকি বর্ধমানের রাস্তায় জুতো পড়ে কয়েকদিন হাঁটাহাঁটিও করেছে। কোনো প্রবলেম হয়নি। আসলে সমতলে যতই স্বস্তিদায়ক হোক না কেন জুতোর আসল পরীক্ষা বন্ধুর পথের লং মার্চ-এ। সেক্ষেত্রে হিল কিছুটা 'ফ্লেয়ারড' থাকা দরকার, 'হিল কনট্যুর' শক্ত উপাদানের হওয়া প্রয়োজন, শুকতলা যেন খুব 'স্প্রিংগি' না হয় ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু মলয়দার জুতোর মূল সমস্যা 'টো-বক্স'-এ আঙুল খেলাবার জায়গা কম। চাষার মতো বেয়াড়া পা দুটো তাই জুতোর ভেতর রীতিমতো হাঁসফাঁস করছে।

আমাদের টিমে মলয়দা আর সলিলদা সম্পূর্ণ দুটো ভিন্ন চরিত্র। দুজনের চারিত্রিক তফাৎটা অনেকটা ট্যাকিলা শট আর সিঙ্গল মল্ট হুইস্কির মতো।

আমি আর দাঁড়াইনি। জুতোর ফিতে বেঁধেছি। আজ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বেরোতে হবে। পেরোতে হবে এ রুটের সবচেয়ে বোল্ডার বন্ধুর পথ।

অন্যান্য দিনের তুলনায় আজ একটু তাড়াতাড়িই তাঁবু গুটিয়ে চলা শুরু হল। আজকের লক্ষ্য পানপাতিয়া লোয়ার আইসফিল্ডে সেকেন্ড আইসফলের কাছে টেন্ট পিচ করা। শুরুতেই ঘাসের ঢাল বেয়ে একটানা অনেকখানি নেমে চলে এলাম ক্ষীরাও নালার পাশে। আমাদের ডানদিকে, পানপাতিয়া হিমবাহ থেকে উৎপন্ন হয়ে ক্ষীরাও নালা বয়ে চলেছে বাঁ দিকে। ক্ষীরাও গ্রামের পরে ডাকবিয়ানী-র কাছে এই নালা গিয়ে হ্যান্ডশেক করেছে অলকানন্দার সঙ্গে।

একটা সময় দিক পালটে চলা শুরু হল ক্ষীরাও নালার বাঁ তীর ধরে, পশ্চিম দিক বরাবর।

পথে পড়ল পাথরে ঘেরা কয়েকটা ক্যাম্পসাইট। চারদিকে ছড়ানো ছেটানো বেশ কিছু প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ, ফ্রুট জুসের মরচে ধরা কন্টেনার এবং আরও কিছু আবর্জনা। শহুরে শিক্ষিত মানুষ বছরের পর বছর অ্যাডভেঞ্চারের অছিলায় পাহাড়ে ঢেলে দিয়ে যাচ্ছে সভ্যতার গরল। অনেককেই দেখেছি কলকাতায় বসে উঁচু গলায় পাহাড় নোংরা করার বিপক্ষে কথা বলেন। এবং আশ্চর্যজনকভাবে তাঁদের অনেকেই হিমালয়ের শরীরে ঢেলে আসেন এইসব সভ্যতার মেদ। সভ্যতা এবং হিপোক্রেসি এখন সময়ের সঙ্গে হাতে হাত রেখে চলেছে। কিছু বছর আগে ঘটে যাওয়া উত্তরাখণ্ডের ভয়াবহ বিপর্যয়ও তাঁদের চিত্তের চৈতন্য ঘটাতে সক্ষম হয়নি।

আরও এক ঘণ্টা বোল্ডারের রাজত্ব পেরিয়ে চলে এলাম ক্ষীরাও নালার স্নাউট বা উৎসমুখে। উচ্চতা ৩৮৪০ মিটার। পানপাতিয়া হিমবাহের প্রান্তীয় অঞ্চলে একটা চওড়া ফাটলের মধ্যে থেকে প্রচণ্ড বেগে বেরিয়ে আসছে ক্ষীরাও নালা। জল এখানে প্রচণ্ড ঘোলা।

বেশ গরম লাগছে। আসলে বোল্ডারিং-এর একটা ধকল থাকে। সবাই একটু বিশ্রাম নিয়েছি। সঙ্গে জলপানের বিরতি। গায়ের গরম জামাটা চালান করেছি স্যাকে। একটা পাথরের গায়ে হেলান দিয়ে আয়েস করে বসে, মুখে খেজুর পুরতে পুরতে তাকিয়েছি ক্ষীরাও নালার স্নাউট পয়েন্টটার দিকে। বরাবরই কোনো নদীর উৎসমুখ আমাকে টানে। কলকাতার হসপিটালে লেবার রুমে ডিউটি করার সময় শিশুর জন্ম মুহূর্তের সাক্ষী থাকার মতোই অনুভূতি হয়

যে-কোনো নদীর স্নাউট পয়েন্ট দেখলে। মনে হয় এও তো এক সদ্যোজাত। সদ্য ভূমিষ্ঠ হল প্রকৃতির বুকে। মায়ের গর্ভে মানবশিশুর ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠার মতো, হিমবাহের গর্ভে বেড়ে উঠছিল নদী। এরপর সে ক্রমাগত আকারে বড়ো হবে, আয়তনে চওড়া হবে। ঠিক মানুষের মতোই। আবার সে তার সঙ্গে বয়ে নিয়ে চলবে পলিমাটি, গাছপালা, দু-ধার থেকে নিক্ষিপ্ত আবর্জনা। সেও তো ঠিক মানুষের মতোই। মানুষও বয়স বাড়ার সঙ্গেই দায়িত্বশীল হয়। বয়ে নিয়ে চলে তার সাধের সংসার। আবার একসময় নদী ভোগে গতিমন্থরতায়। মিশে যায় সাগরে, এক অনন্তযাত্রায়। আমরাও বার্ধক্যে পৌঁছই গতিমন্থরতার হাত ধরেই। তারপর একদিন সেই ... অন্তিমযাত্রা। সেও তো একধরনের অনন্তযাত্রাই।

এইবার পানপাতিয়া হিমবাহের মোরেনের ডানদিকের স্ক্রি জোন ধরে আমাদের ওঠা শুরু হল। এই মোরেন শব্দটার সঙ্গে যাঁরা কিঞ্চিৎ অপরিচিত তাদের অবগতির জন্য জানাই, মোরেন বা মোরেইন হল হিমবাহবাহিত পাথর, মাটি বা এককথায় DEBRIS এর বিশাল স্তূপ। বাংলা চলতি প্রতিশব্দ গ্রাবরেখা। এই মোরেন আবার নানা ধরনের হয়। পাহাড়ের ঢাল থেকে খসে পড়া পাথরের স্তূপ যখন হিমবাহের পাশে পাশে জমে যায় তাকে LATERAL MORAINE বলে। একাধিক হিমবাহের সঙ্গমে (CONCORDIA), হিমবাহের মাঝখানে MEDIAL MORAINE এর সৃষ্টি হয়। হিমবাহের মুখে (SNOUT) জমা হওয়া স্তূপ TERMINAL MORAINE নামে পরিচিত। এ ছাড়াও অন্তস্থঃ মোরেন (En-GLACIAL MORAINE), ভূমিস্থ মোরেন (GROUND MORAINE) প্রভৃতি বিভিন্ন মোরেন পাহাড়ের বুকে দেখা যায়। আর এক ধরনের মোরেনও অবশ্য দেখা যায় যদিও তার উপস্থিতি তুলনামূলক কম। তাকে বলে PUSH MORAINE. কোথাও কোথাও হিমবাহ LATERAL MORAINE সৃষ্টি করে পিছিয়ে যায় এবং পরে আবার এগিয়ে এসে পুরোনো LATERAL MORAINE-এর ওপরেই একটা নতুন স্তর জমা করে। এভাবেই তৈরি হয় PUSH MORAINE.

চারদিক জুড়ে শুধু পাথর আর পাথর। যেদিকেই তাকাই, যতদূর অবধি ভিসিবিলিটি যায়, ততদূর অবধিই ছোটো বড়ো নানা আকৃতির পাথর। পুরো অঞ্চলটাই যেন প্রকৃতির রুদ্ররূপের শিকার। প্রকৃত তার ইচ্ছেমতো ধ্বংসলীলা

চালিয়েছে পুরো অঞ্চলটা জুড়ে। বিভিন্ন ধরনের ব্যাসযুক্ত এই পাথরগুলোরও আবার বিভিন্ন নাম আছে। যেমন — বোল্ডার (BOULDER), কোবল (COBBLE), পেবল (PEBBLE), স্যান্ড (SAND), শিল্ট (SILT) প্রভৃতি।

এতক্ষণ আমরা ডানদিক ধরে উঠছিলাম। কিন্তু এবার আর ডানপন্থী থাকা গেল না। শুরু হল MEDIAL MORAINE ধরে পশ্চিমদিকে এগিয়ে চলা। প্রকৃতির এই ধ্বংসযজ্ঞের মাঝে সূর্যদেবেরও বোধহয় তেজ দেখানোর ইচ্ছে হল। এককথায় যাকে বলে — "প্রখর দারুণ অতি দীর্ঘ দগ্ধ দিন"। রূপকথার গল্পে যেমন অপরাধীদের ওপরে কাঁটা নীচে কাঁটা দিয়ে শাস্তিবিধান করতেন তৎকালীন রাজারা, এখানেও যেন আমাদের জন্য সে ব্যবস্থাই রাখা হয়েছে। পায়ের নীচে এবড়োখেবড়ো বোল্ডার, মাথার ওপর গনগনে সূর্য। সঙ্গে আবার বোতলের জলটাও ফুরিয়েছে। একটু জল রাখা ছিল বাকি পথের জন্য। মাঝে একবার স্যাক নামিয়েছিলাম ওয়েস্ট পাউচটা ঠিক করার জন্য। সেই ফাঁকে কোন মক্কেল নিশ্চুপে বোতলটা ফাঁক করেছেন। সব মিলিয়ে এক কথায় ত্র্যহস্পর্শযোগ।

একটা সময় MEDIAL MORAINE ধরে চলাটাও অসম্ভব হয়ে পড়ল বরফের ফাটল আর ছোটো ছোটো গ্লেসিয়াল পন্ড-এর জন্য। অগত্যা আবার উঠে আসা LATERAL MORAINE-এর বোল্ডার বন্ধুর পথে।

বোল্ডারিং ভীষণ মনোযোগের কাজ। বোল্ডার যতই বড়ো হোক, যতই 'স্ট্যাটিক' দেখাক, বিশ্বাস নেই। টলে যেতে পারে। প্রতিটা পাথরে পা জমাবার আলাদা 'গ্রিপ', ধুলো জমে থাকা বিপজ্জনক তল, দুটো বোল্ডারের মাঝখানে পা মচকে বা ভেঙে যাবার মতো ফাঁক ভীষণ যত্নে খেয়াল রাখতে হয়।

বোল্ডার বন্ধুর পথে তাই ট্রেকিং একটা শিল্প। ছোটোবেলায় ঠাকুমার মুখে নানা গল্প শুনতাম। তারই মধ্যে একটা শুনেছিলাম যে নারদের ভক্ত হবার অহঙ্কার মুছে দিতে একবার নাকি নারায়ণ নারদকে একবাটি ভরা তেল দিয়ে বলেছিলেন কৈলাসে দেবাদিদেবকে দিয়ে আসতে। শর্ত ছিল একফোঁটা তেলও যেন মাটিতে না-পড়ে। নারদ ওই পুরো পাহাড়ি পথ একবারও কেন বিষ্ণুনাম স্মরণ করেননি, সেটা ট্রেকাররা হাড়ে হাড়ে বোঝে।

তবে বোল্ডারিং এর সময় ট্রেকিং কার্যক্ষেত্রে অনেক দ্রুত হয়। দ্রুত ট্রেক

করবার অন্তত একটা সুবিধে হচ্ছে কোনো পাথর টলে যাবার বা উলটে যাবার আগেই পা নিরাপদ বোল্ডারের আশ্রয়ে চলে যায়। টোটাল ব্যাপারটায় ধারালো ইনস্টিংকট, রিফ্লেক্স আর অনুশীলনের গভীর যোগাযোগ। আমাদের টিমে সলিলদা আর স্বর্ণেন্দুর বোল্ডারিং ঈর্ষা করার মতোই ছন্দিত সুন্দর, অন্তত আমার কাছে। আমার বোল্ডারিং মোটেও ভালো বলা যাবে না। কারণটা ফিটনেসজনিত নয়, নিতান্তই অমনোযোগিতা ও ছটফটানির যোগফল।

বোল্ডারিং নিয়ে জ্যাক কোরোয়াক এর বক্তব্যটা আমার বেশ মনে ধরে—
"Jumping from boulder to boulder & never falling, with a heavy sack, is easier than it sounds, you just can't fall when you get into the rhythm of the dance."

এহেন বোল্ডার ট্রেকিং-এ নারদ যে বিষ্ণুনাম স্মরণ করতে ভুলে যাবেন এতে আর আশ্চর্যের কি আছে। তার ওপর যত এগিয়েছি দেখেছি মোরেনের অনেক বোল্ডার শক্ত পিছল বরফের অনিশ্চিত শয্যায় দাঁড়িয়ে আছে। যে কোনোটাই বিচ্ছিরিভাবে স্লিপ করতে পারে। আর তাতে হাত পা মচকানোর সঙ্গে রেপুটেশানটাও মচকে যাবেই। অন্তত নিজের কাছে।

চলেছি তো চলেইছি। রুক্ষ মোরেন রাজ্যে দৈত্যাকৃতি পাষাণ তরঙ্গের মাঝে আমরা মাত্র কজন মানুষ এক ক্লান্তিকর প্রয়াস চালাচ্ছি রাতে থাকার মতো একটা জায়গায় পৌঁছনোর তাগিদে। টিম মেম্বারদের কারও কারও সঙ্গে দূরত্ব অনেক বেড়েছে। ঘড়িতে প্রায় চারটে বেজেছে। সূর্য ধীরে ধীরে পশ্চিমের পথে। আকাশের নীল সামিয়ানা সরে ঘোলাটে রং ধরেছে। দুপুরের প্রচণ্ড খরতাপের জায়গা নিয়েছে তীব্র ঠান্ডা হাওয়ার বৈঠকি আড্ডা।

লক্ষ করলাম দূরে বাঁ দিক থেকে নেমে এসেছে এক আইসফল।

ক্ষীরাও নালার শেষপ্রান্তে পানপাতিয়া হিমবাহ পশ্চিম দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় বিষ্ণুগড় ধারের উত্তরগাত্র থেকে ২-৩টি উপহিমবাহ নেমে এসেছে। আমাদের ঠিক দক্ষিণদিকে প্রথম উপহিমবাহের শেষ অংশে রয়েছে একটি হিমপ্রপাত।

সামনে পড়েছে মোরেনের এক বিশাল চড়াই। লুজ বোল্ডারে হোল্ড রাখাই সমস্যার। একসময় চড়াই-এর ওপরে উঠে চোখে পড়ল ওই বিষ্ণুগড় ধার থেকে নেমেছে আরও একটি আইসফল।

আমার থেকে হাত দশেক দূরে মঙ্গল সিং হঠাৎই থেমেছে। ডায়াগোনালি তাকিয়ে কী যেন খুঁজছে।

"কেয়া দেখ রহে হো", আমি মঙ্গল দৃষ্টি অনুসরণ করে প্রশ্ন করেছি।

"উঁহাপে ক্যাম্প সাইট হো সাকতা হ্যায়", দূরে সেকেন্ড আইসফলের একটু আগে অল্প কিছুটা জায়গা জুড়ে প্রায় এক সমতল তুষারক্ষেত্রের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছে মঙ্গল।

ও আর দাঁড়ায়নি। দ্রুত পা চালিয়েছে। আকাশের ভাবগতিক সুবিধার নয়। আমিও আর দাঁড়াইনি। প্রায় আট ঘণ্টা বোল্ডার মার্চ হয়ে গেছে। পরিশ্রান্ত শরীর খুব স্বাভাবিক ভাবেই বিশ্রাম চায়। তার ওপর ক্যাম্প সাইট দেখা গেছে। শরীর যেন আরও ছেড়ে দেয়। ব্যাপারটা সাইকোলজিক্যাল। মনে হয় এই তো এসে গেছি। দু-দণ্ড দাঁড়ালেই বা ক্ষতি কি? কিন্তু এই সময় বিশ্রাম মানেই শরীর আর মন জুড়ে নেমে আসবে অবসাদ। ভারী হয়ে যাওয়া দুটো পা আর টাটানো কোমর নিয়ে ধীরে হলেও এগিয়েছি গন্তব্যে। সারাদিনের পরিশ্রম, সূর্যের তাপ আর উচ্চতাজনিত কারণে দেখা দিয়েছে মাথার যন্ত্রণা।

এই সময় আমি নিজের সঙ্গে একটু 'মাইন্ড গেম' খেলি। ভাবার চেষ্টা করি, এই তো এসে গেছি। আর একটু গেলেই তাঁবু। ওখানে পৌঁছলেই জল, গরম চা পাব। এককথায় এই মুহূর্তে মন যা চাইছে অর্থাৎ শারীরিক স্বাচ্ছন্দ, তার একটা যতটা পারা যায় বাস্তবসম্মত ছবি আঁকি মনে মনে। পদ্ধতিটায় অল্পবিস্তর কাজও হয়।

আরও একটা চড়াই ভেঙে যে জায়গাটায় উঠে এসেছি সেখান থেকে মূল পানপাতিয়া হিমবাহের আসল চেহারাটা অনেকটাই নজরে আসে। বাঁদিকের ওই উপহিমবাহগুলো মূল পানপাতিয়া হিমবাহের সঙ্গে মিশে হিমবাহের বিস্তার এবং বীভৎসতা দুই-ই বাড়িয়েছে। চারদিক জুড়ে প্রকৃতি তার নিজস্ব তুলিতে এঁকে গেছে ক্রিভাসদীর্ণ এক হিরণ্ময় জ্যামিতি। যা একসঙ্গে ভয় এবং সম্ভ্রম উদ্রেককারী। যদিও পানপাতিয়া হিমবাহ শেষ হয়েছে মেন আইসফলে যা এখনও আমাদের অগোচরে। এরই উত্তরপূর্ব কোণে আছে মাউন্ট চৌখাম্বার জায়ান্ট ম্যাসিফ। সেই অধরা মাধুরী ধরা দেবে আপার আইসফিল্ডে ওঠার পর। খুব সম্ভবত কালকেই।

চড়াইটার মাথা থেকে আমাদের ক্যাম্পগুলোও দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট। দুটো

ক্যাম্প অলরেডি পিচ করা হয়ে গেছে। এখান থেকে একটু আঁকাবাঁকা পথে পাঁচশ-ছশো ফুট মতো রাস্তা ক্রিভাস এড়িয়ে মধ্য গ্রাবরেখা ধরে এগোতে হবে। তারপর একটা ছোট্টো হাম্প ক্রশ করলেই পৌঁছে যাব আজকে রাতের আস্তানায়।

ঠিক এইসময়ই এসে পৌঁছেছে সুমন। স্বভাবতই বেশ ক্লান্ত আমাদের সবার মতোই। ঠান্ডা হাওয়ার মধ্যেও বেচারার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘামের ফোঁটা। মলয়দা কিছুক্ষণ আগে পৌঁছে রেস্ট নিচ্ছিল। সুমনকে দেখেই ইচ্ছাকৃভাবে ধমকের সুরে বলে উঠেছে — "এই সুমন, রেস্ট নিতে হবে না, চল"। জ্যাঁ মুক্ত তীরের মতো সুমনের মুখ থেকে ছিটকে এল চার অক্ষরের ছাপার অযোগ্য একটা বেদবাক্য, একদম স্পনটেনিয়াসলি। আমার পেটের ভেতর গুলিয়ে ওঠা হাসি ঢাকতে চট করে মুখ ফিরিয়েছি অন্যদিকে। তখনই সুমনের খেয়াল হয়েছে যে বেদাতী বউদিও এসে পৌঁছেছে। ছেলেটা বেসিক্যালি ভীষণ ভদ্র ও ঠান্ডা মাথার। মলয়দা ইচ্ছে করেই ওই কথাটা বলেছে। একজন অত্যন্ত পরিশ্রান্ত মানুষের খুব স্বাভাবিক ভাবেই ব্রেন সারকুলেশান কম থাকবে। ল্যাক অব ব্রেন সারকুলেশান এবং এতক্ষণ পথ চলার জন্য অ্যাড্রিনালিন সিক্রিয়েশান্, সব মিলিয়ে সুমনের ওই রিয়্যাকসান। কিন্তু বউদিকে দেখেই এবার ওর রিপারকেশানটাও দেখবার মতো। "সরি বৌদি, আমি খেয়াল করিনি গো তোমাকে", কথাটা ঝড়ের বেগে কয়েকবার উচ্চারণ করে গেল। বৌদিও সমস্ত পরিস্থিতিটা বুঝে, "ঠিক আছে, ঠিক আছে" বলে হাসি চাপতে মুখ লুকোল। পুরো সিন্‌টা বোধহয় এক মিনিটও হবে না। কিন্তু এতক্ষণ ধরে বয়ে নিয়ে চলা শারীরিক ও মানসিক ক্লান্তিটা অদ্ভুতভাবে অনেকটাই প্রশমিত করে দিল। আর বাকি পথের জন্য করে দিল রিচার্জ। পর্বতারোহণ নামক খেলাটার এটাই মজা। যদি একটা টিমে বিভিন্ন বর্ণময় চরিত্রের সমাবেশ ঘটে, তবে 'বোর' শব্দটা টোটাল রুটের চিত্রনাট্য থেকে বিলকুল হাপিস হয়ে যায়।

এই হাসি আর হুল্লোড়-এর ধরতাই এর মাঝেই প্রচণ্ড শব্দে বাঁদিকের গিরিশিরা ধরে নেমে এসেছে সশব্দ অ্যাভালাঞ্চ। ব্যাপারটা অনেকটা ফিল্মে যেরকম অনেকসময় একটা 'রিলিফ সিন্'-এর পরে 'একটা সিরিয়াস সিন্' আসে, সেরকমই। হাসি থেমে গেছে সবার। 'সাডেন মাইন্ড চেঞ্জিং সিচুয়েশন' হলে যা হয় আর কী! প্রচণ্ড শব্দে তুষারের ধোঁয়া উড়িয়ে অ্যাভেলাঞ্চের ক্রাউন

পয়েন্ট থেকে ট্র্যাক ধরে নেমে এসেছে টন টন তুষার। কানে তালা ধরিয়ে দেওয়া শব্দের প্রতিধ্বনি ফিরেছে পাহাড় থেকে পাহাড়ে। 'ভয়ংকর সুন্দর' বলে না, এও তাই। তবে সরাসরি অ্যাভেলাঞ্চের মধ্যে পড়ে গেলে ব্যাপারটা শুধুই 'ভয়ংকর', 'সুন্দর'-এর সেখানে কোনো জায়গা নেই।

একসময় থেমেছে অ্যাভেলাঞ্চ। প্রচণ্ড শব্দময়তার পর এক নিথর নীরবতা। মনে হয়েছে পৃথিবীটা এখানেই থেমে গেল।

আরও প্রায় তিরিশ মিনিট পর ক্রিভাস আর MEDIAN MORAINE পেরিয়ে পৌঁছে গেছি ক্যাম্প সাইটে।

প্রায় সমতল তুষারক্ষেত্রটার বাঁদিকে দু-তিনটে হিমবাহ সরোবর। আমাদের ঠিক সামনেই দিনের পড়ন্ত আলোয় ভয়ধরানো মেন আইসফল। ডানদিক ধরে পার্বতী রিজের কালো পাথর আর তার ঠিক উলটোদিকেই রয়েছে সেকেন্ড আইসফল। এরাই আজকে আমাদের মূল প্রতিবেশী।

ক্যাম্পসাইটের উচ্চতা ৪৩০০ মিটার। খোলা জাগায় ক্যাম্প হওয়ার দরুণ চারদিক থেকে ধেয়ে আসছে তীব্র ঠান্ডা হাওয়া। বিকেলের রং গাঢ় হয়ে সন্ধে নামছে। কফি তৈরি করতে গিয়ে দেখা গেল ডিজেল ব্যবহারের ফলে তিনটে স্টোভের দুটোই কার্যত অকেজো হয়ে পড়েছে। একটা স্টোভেই কোনোমতে রাতের খাবার তৈরি করে, তাড়াতাড়ি খাওয়ার পর্ব চুকিয়ে টেন্টে ঢুকে যাওয়া হল। মাঝরাতে সুমনের অ্যালকোহল থার্মোমিটার জানান দিল তাপমাত্রা নেমে গেছে মাইনাস ৮° সেন্টিগ্রেডে।

রাতে মাঝেমধ্যেই ভেসে এসেছে অ্যাভেলাঞ্চের ক্রুদ্ধ আর্তনাদ।

ষষ্ঠ দিন
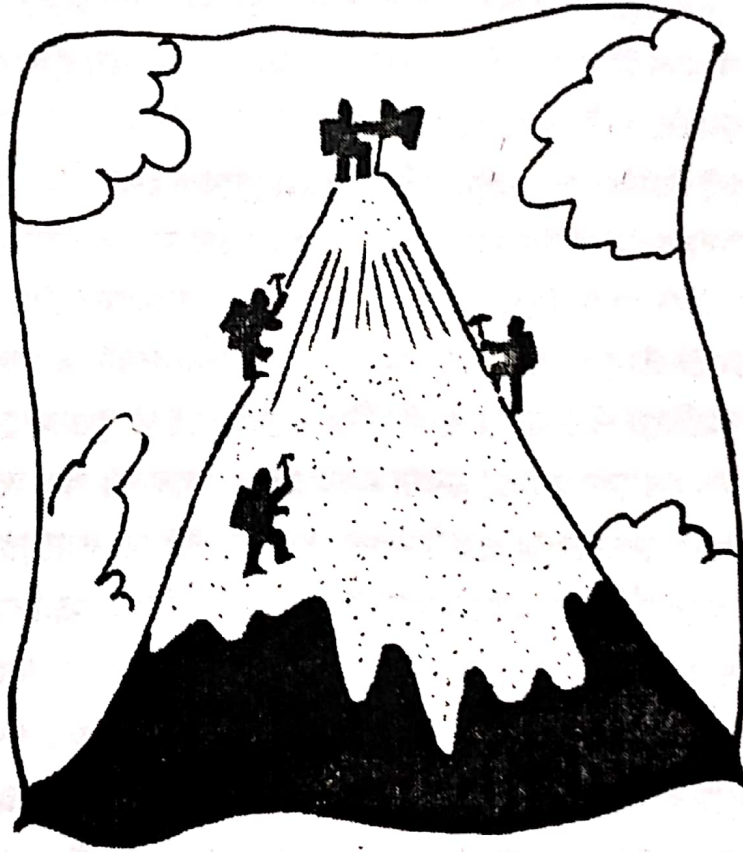
"চরিত্রবল সৃষ্টি করতে হলে জনসমাজে মেশ, কিন্তু যদি প্রতিভার সম্যক স্ফুরণ তোমার কামনা হয়, তবে সাধনা কর নির্জনে।"

— গ্যোটে

গ্যোটের কথাগুলো আমি কোথাও পড়িনি। শুনেছিলাম। আর এমন মুহূর্তে শুনেছিলাম যে আজও ভুলিনি। প্রায় বছর বারো আগের কথা। পাঁচ বন্ধু চলেছি অন্নপূর্ণা বেস ক্যাম্পের পথে। একেই অর্থের সংকুলান তার ওপর নেপাল রিজিয়ন এমনিতেই কস্টলি। পৃথিবীর চোদ্দোটা 'এইট থাউজ্যান্ডার'-এর মধ্যে বেশ কয়েকটা নেপালে। ফলত এই পিকগুলো ঘিরেই চলে ওদের ব্যবসা। দেশটায় কৃষি, শিল্প কোনোটাই পাতে দেওয়ার মতো নয়। তার ওপর মাওবাদী আন্দোলনে সেসময় দেশজুড়ে অস্থিরতা। ওই পিকগুলো নিয়ে ওদের পর্যটন ব্যবসাই ছিল দেশের অর্থনীতির প্রধান মেরুদণ্ড। ট্রেকিং, ক্লাইম্বিং যাই হোক না কেন শেরপা, হ্যাপ, গাইড, পোর্টারদের রেট তখনই রীতিমতো চড়া। তার সঙ্গে খাবারের দাম। বাপরে, সেও আকাশছোঁয়া। মনে আছে সেই সময়ই মচ্ছপুছারে বেস ক্যাম্পে এককাপ চায়ের দাম ছিল ভারতীয় মুদ্রায় ষাট টাকা।

তাই আমরা ঠিক করেছিলাম পোর্টার নেব না। নিজেরাই খাবার দাবার, স্টোভ, বাসনপত্র, টেন্ট ভাগ করে বইব।

অন্নপূর্ণা বেসক্যাম্পে যখন পৌঁছই তখন বিকেল শেষ সীমান্তে। চারদিক জুড়ে মেঘ কুয়াশার খেলাঘর। কিছুই প্রায় দেখা যাচ্ছে না। পরদিন ভোর হবার আগেই সানরাইজ দেখব বলে তাঁবুর বাইরে এসেছি। আমাদের তাঁবুর চারপাশে আরও কয়েকটা তাঁবু পড়েছে বেসক্যাম্পের অ্যাম্পিথিয়েটারে। জার্মান, ডাচ আর ব্রিটিশ মিলিয়ে পাঁচজনের একটা টিম রয়েছে ওই তাঁবুগুলোতে। তখনও সূর্যোদয় হয়নি। ভোরের আবছা একটা নরম আলো সবেমাত্র পড়েছে আকাশের গায়ে। দূর থেকে দেখছিলাম এক দীর্ঘদেহী অবয়ব, স্ট্যান্ডে ক্যামেরা ফিট করে খাদের প্রায় ধারে দাঁড়িয়ে আছেন মাউন্ট অন্নপূর্ণার বিশাল ম্যাসিফটার দিকে চেয়ে। ক্রমশ অংশুধর রং ছুড়েছেন মাউন্ট অন্নপূর্ণার তুষার ধবল শরীরে। আগুনের মতো ঝলসে উঠেছে পৃথিবীর টেন্থ হায়েস্ট পিক। খুব স্বাভাবিক ভাবেই মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাকিয়ে ছিলাম সে দিকে। আর শুধু অন্নপূর্ণা কেন! চারদিকে ঘিরে থাকা মচ্ছপুছারে, গঙ্গাপূর্ণা, হিউনচুলি সবাই তখন বৈধব্যের পোশাক ছেড়ে যৌবনের দিপ্তীতে দীপ্যমান।

হঠাৎ-ই নজর গেছে ওই দীর্ঘদেহী অবয়ব-এর দিকে। সবার ছটফটানির মাঝেও অদ্ভুত সমাহিত, নিস্পন্দ ভঙ্গী। সবার থেকে নিজেকে আলাদা করে এক আত্মমগ্ন ঋষি। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেছি। কয়েক পা তফাতে প্রায় পাশাপাশি

দাঁড়িয়েছি। কাঁধ ছাড়িয়ে যাওয়া ব্লন্ড চুল আর একমুখ দাড়ির মাঝে অদ্ভুত শান্ত দুটো নীল চোখ। প্রশান্ত মুখটা জুড়ে ছড়িয়ে আছে প্রথম সূর্যের নরম আলো। আমার দিকে ফিরে অল্প হেসেছেন। বড়ো হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়া আন্তরিক সে হাসি। তারপর আমাকে কিছুটা চমকে দিয়েই অন্নপূর্ণার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে মেঘমন্দ্রিত স্বরে সেই ঋদ্ধিমান পুরুষ বলে উঠেছেন — "মাই হেভেন্, মাই পিস"। তীব্র ঠান্ডা হাওয়ার ঝাপটায় নয়, ওই চারটে শব্দ আর গুরু গলার আওয়াজ আমার ভিতরে এক অদ্ভুত শিরশিরানি এনে দিল। সাহেবি কায়দায় প্রথাগত 'হাই', 'হ্যালো', 'গুড্‌মর্নিং' নয়, অন্তরের সেই কোন অন্দরমহল থেকে উঠে আসা "মাই হেভেন মাই পিস্"-এর স্বীকারোক্তিই আমাদের কোথাও এক সুতোয় মিলিয়ে দিল। তারপর ধীরে ধীরে আলাপপর্ব। ভদ্রলোক জার্মান। মিউজিক আর পাহাড়পর্বতে ঘুরে বেড়ানোই ওনার নেশা। জার্মানিতে একটা মিউজিক স্কুলও চালান। সুরের সাধনা আর পাহাড়ের আরাধনা যাঁর জীবন, তাঁর মুখে এহেন কথা মানায় বইকি।

একসময় উনিই বলে উঠলেন গ্যোটের ওই কথাগুলো। ওনার বক্তব্য ছিল যে আমরা হয়তো সন্ন্যাসী নই, হয়তোবা বাউন্ডুলেই। তবু ওই বাউন্ডুলেপনার মধ্যেই এই নির্জনে জীবনের সাধনা করি, খুঁজে পাই সারসত্য, খুঁজে পাই নিজেদের। সেই প্রৌঢ় জার্মান বন্ধুর সঙ্গে আর আমার দেখা হয়নি। হবেও না কোনোদিন হয়তো। তবু তাঁকে ভুলতে পারিনি আজও। ওই আলাপচারিতা, ওই দুটো সাগর গভীর নীল চোখ, আজও আমার মধ্যে কেমন যেন বৈরাগ্য আনে। অপার শান্তি দেয় খাপছাড়া জীবনের কমা, সেমিকোলনের ফাঁকে ফাঁকে।

ভেবে দেখেছি নানা দেশের নানা মানুষ, নানা সমাজবন্ধন, গাদা গাদা ধর্মাচারণ, প্রচুর ভাষা, নানা গ্রন্থ হয়তো আমাদের চিত্তের প্রসার ঘটায় ঠিকই। কিন্তু সেই সঙ্গে সেই প্রসারতাই আমাদের দেশের রীতিনীতি সম্বন্ধে একদিক দিয়ে করে দেয় উদাসীন, আপন মাটি আপন শিকড় সম্পর্কে নিস্পৃহ। ইংরেজিতে একেই বলে 'জেডেড', ফরাসিতে 'ব্লাজে'। এই অবস্থার কথা কল্পনা করেই জার নিকোলাস বলেছিলেন, "পরের বেদনা বুঝিতে না পারে, না ভাবে আপন সুখ"। আজ এ বয়সে এসে মনে হয় অনন্ত হিমালয়ের গহীনে, নির্জনে নিভৃতে এই যে এতগুলো বছর নিজের সঙ্গে নিজের একান্ত আলাপচারীতা, প্রকৃতির সঙ্গে অনায়াস কথোপকথন, তা সমৃদ্ধ করেছে আমার আত্মার চোরাগলি। গেরুয়া

ভেক না ধরেও দিয়েছে সহজিয়া জীবনের সনাতনী রং। জীবনের মূল মন্ত্রই বোধ হয় জীবনের যে-কোনো পরিস্থিতিতে বেঁচে থাকা, সততার হাত ধরে। শুধু চার দেয়ালের মধ্যে বসে ভারী ভারী বই পড়ে আমাদের এই সমাজ, পৃথিবী, মানুষগুলোকে চিনতে গেলে হয়তো হারিয়ে ফেলতাম নিজেকেই। ভুলে যেতাম প্রকৃত 'বেঁচে থাকা' কাকে বলে।

কনফুসিয়াস তাঁর 'নামকরণের সমন্বয়বাদ'-এ সমাজে পাঁচটা সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেছেন — স্বামী ও স্ত্রী, পিতা ও পুত্র, জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং বন্ধু ও বন্ধু। এ ছাড়াও আরও একটা সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেছেন যা এই মুহূর্তে ঠিক মনে নেই। তবে তাতে বিন্দুমাত্র খেদ নেই আমার। কারণ সেই জার্মান সাহেবের নামটা জানা না হলেও তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা যে ওই 'বন্ধু ও বন্ধু'-র, হয়তোবা পৃথিবীর সবচেয়ে সহজ সম্পর্কের নাম। অতন্দ্র কর্ডিলেরা ঘেরা অন্নপূর্ণা বেসক্যাম্পের সেই অ্যাম্ফিথিয়েটারে ভিনি ভিনি ভোর হয়েছিল এক অনুপম বীজমন্ত্রে ... ''মাই হেভেন্ মাই পিস্'', আমার বেঁচে থাকার ''ওম্ মণি পদ্মে হুম্''।

তখন মেডিক্যাল কলেজের খুব সম্ভবত ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি। এক বন্ধু প্রায় জোর করেই নিয়ে গিয়েছিল একটা ক্লাসিকাল মিউজিক কনফারেন্সে। প্রায় শেষ রাতে মঞ্চে উঠলেন পণ্ডিত রবিশংকর। বুঁদ হয়ে শুনছিলাম। শাস্ত্রীয় সংগীতের চলন সেভাবে আমাদের বাড়িতে ছিল না। রবীন্দ্রসংগীত, আধুনিক শোনার অনায়াস অভ্যেস থাকলেও ক্লাসিকাল মিউজিক-এর কান সেভাবে তৈরি হওয়ার সুযোগ পায়নি কখনও। তখন প্রায় ভোর হতে চলেছে। শীতের কুয়াশা মুড়ে রেখেছে গোটা শহর। পণ্ডিতজী 'ভীমপলাশী' ধরলেন। একটু একটু করে মীড়-এর মোচড়ে জেগে উঠেছিল হাজার হাজার শ্রোতা। তবলায় অনবদ্য সঙ্গত আর পিছনে তানপুরার সুর ... হল থেকে বেরিয়েছিলাম কুয়াশামাখা এক মায়াবী ভোরে, ভালোলাগার চাদরে নিজেকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে। এভাবেই ছোটো থেকে 'ভোর' হয়েছে আলোর দিশারি হয়ে কিংবা প্রাত্যহিকীর হাত ধরে। মায়ের হাতের চুড়ির রিনরিন শব্দে জেগে ওঠো 'ভোর' আকাশবাণীর কলকাতা 'ক'-এর আধুনিক গানের সুরেলা 'ভোর', বর্ষায় জানলা দিয়ে ছিটকে আসা বৃষ্টি রেণুর হিমেল 'ভোর' ... ভোলা যায় না।

ঠিক যেরকম ভোলা যায় না আজকের ভোর। ১৬ জুন। তমিস্রার জাল

ছিড়ে আলোর আভাস জেগেছে ধীর পদক্ষেপে। সদ্যস্নাতা পাটরানি সিঁদুর ছড়িয়েছেন আকাশের সিঁথিতে, এ মেঘে ও মেঘে হাতের চঞ্চল পরশ বুলিয়ে। পৃথ্বী জেগে উঠেছে আলমোড়া ভেঙে। সারা প্রকৃতি জুড়ে প্রথম চুম্বনের অব্যক্ত লোহিমা। তাঁবুর বাইরে এখন একলা আমি, জনহীন এই অনন্ত চরাচরে হাঁ করে হাঁদার মতো সাক্ষী থাকছি পৃথিবী মাটির এক খুনসুটি ভরা রং মিলান্তির।

আনাতোল ফ্রাঁস একবার দুঃখ করে বলেছিলেন, "হায় আমার মাথার চতুর্দিকে যদি চোখ বসানো থাকত, তাহলে আচক্রবালবিস্তৃত এই সুন্দরী ধরণীর সম্পূর্ণ সৌন্দর্য একসঙ্গেই দেখতে পেতুম।"

আমার বা আনাতোল, কারোরই মাথার পিছনে চোখ নেই। কিন্তু এখানেই ওনার সঙ্গে আমার তফাৎ। উনি নিজেই নিজেকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছেন, "কিন্তু আমার মনের চোখ তো আর একটি বা দুটি নয়। মনের চোখ বাড়ানো বা কমানো তো সম্পূর্ণ আমার হাতে। নানা জ্ঞানবিজ্ঞান যতই আমি আয়ত্ত্ব করতে থাকি, ততই এক একটা করে আমার মনের চোখ খুলতে থাকে।" আমার আনাতোল বাবুর মতো জ্ঞান বিজ্ঞানে অতশত পারদর্শীতা নেই। সারাদিনে দুচারটে রুগী মেরে দু-বেলা পেটের ভাত যোগাই। সুতরাং নিজের দুটো চোখ আর তার জন্য কাকস্য পরিবেদনা ছাড়া আমার গত্যন্তর নেই।

অবনীন্দ্রনাথের একটা কথা আছে, "ছবি দেখে যদি আমোদ পেতে চাও তবে আকাশে জলে স্থলে প্রতি মুহূর্তে এত ছবি আঁকা হচ্ছে যে, তার হিসাব নিলেই সুখ দুখে চলে যাবে বাকি দিনগুলো।" সঙ্গে এও বলেছিলেন, "আর যদি ছবি লিখে আনন্দ পেতে চাও তবে আসন গ্রহণ করো এক জায়গায়, দিতে থাকো তুলির টানে রঙের পোঁচ। এ দর্শকের আমোদ নয়, স্রষ্টার আনন্দ।"

আমি জানি চতুর্দিকে নিজেকে বিক্ষিপ্ত বিকীর্ণ করে দিলে আজকে ভোরের এ আনন্দ পাওয়া যায় না। আত্মার সংহতি, মননের জমাট সংপৃক্তি প্রয়োজন। কিন্তু এ ক্ষুদ্র আমি-র সে যোগ্যতাই নেই।

তাই শিশুর সরল বিস্ময়ে অশিক্ষিত আবেগে দু-হাত ভরে নিয়েছি বিশ্বপ্রকৃতির এ আজব পরকীয়া।

সকাল থেকেই মহাবীরের সঙ্গে মঙ্গল সিং-এর আবার লেগেছে। মহাবীরের বক্তব্য ওকে ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, ডিনার তৈরি করা থেকে শুরু করে মালবহন, ক্যাম্পসাইটে জল নিয়ে আসা ইত্যাদি প্রভৃতি প্রচুর কাজ করতে

হচ্ছে। কিন্তু দলের কয়েকজন সেভাবে গা ঘামাচ্ছে না। ইঙ্গিতটা মঙ্গলের ছেলে সুমনের দিকে এটা বোঝার জন্য বিশেষজ্ঞ না হলেও চলে। কথাটা যে মহাবীর ভুল বলছে তা বলা যাবে না। আসলে দ্বিতীয় দিন থেকেই মঙ্গল-মহাবীর রসায়নে যে ফাটল ধরেছে তা বোজার নয়। এটা আগেই বুঝেছিলাম। মঙ্গল আদতে সিনিয়র পোর্টার ছিল একসময়। বলবীর সিং আর সুন্দর সিং-ই ছিল এ রুটের মেন গাইড। সময়ের নিয়েমে বলবীরের শরীরে বয়স থাবা বসিয়েছে, ও আর এক্সপেডিশানে বেরোয় না। সুতরাং বাকি রইল গোণ্ডার গ্রমের সুন্দর সিং। এই সুযোগটাই কাজে লাগিয়েছে মঙ্গল সিং। ও উত্তরকাশীর বাসিন্দা। সুন্দরের চেয়ে সামান্য কম রেট নিচ্ছে এক্সপেডিশান টিম পাওয়ার জন্য। আর ওর লোকালিটির কমবয়স্ক কিছু ছেলেকে পোর্টার হিসাবে নিয়ে আসছে যারা এই সমস্ত অলটিট্যুডে কখনও পা-ই দেয়নি। এতে মঙ্গল সিং-এর সুবিধে প্রধানত দুটো। প্রথমত পোর্টার চার্জ বেশ কিছুটা নিজের পকেটে পুরছে আর দ্বিতীয়ত, ওদের কে খাটিয়েও নিচ্ছে সকলের মধ্যে কাজের ভারসাম্য না রেখেই। এর থেকেই বিপত্তি।

সমস্যাটা যদিও ওদের তবুও এক্সপেডিশান শেষ না হওয়া অবধি এসব ঝুটঝামেলা আমাদেরও টেনশনে রাখে বইকি। আর এক অনবদ্য দিনের শুরুয়াৎ এর তাল এভাবে কেটে গেলে মনটাও কিঞ্চিৎ বিক্ষিপ্ত হয়। পাহাড়ের অনন্ত ঔদার্যে কে আর পলিউটেড মানসিকতা দেখতে চায়!

ওয়েদার কিন্তু অসম্ভব ঝকঝকে। অদ্ভুত এক সবজেটে নীল আকাশের বুকে সাদা থোকা থোকা মেঘ এর অনায়াস ধীর স্থির বিচরণ চোখ চেয়ে দেখার মতো। চারপাশে উত্তুঙ্গ সব কর্ডিলেরার গায়ে মাথায় মেঘবালিকাদের মর্নিং ওয়াক স্নায়ুতন্ত্রের জড়তাগুলো এক লহমায় ভ্যানিশ করে দেয়।

আমার কেন জানি না বারে বারে মনে হয় পাহাড়ের গায়ে মেঘ না থাকলে পাহাড়ের গ্ল্যামারটাই যেন খোলতাই হয় না। আমার গলায় স্টেথোসকোপটা যেমন আমার প্রফেশানাল লুক এর সঙ্গে মানানসই, মেঘেরও তেমনি পাহাড়ের সঙ্গে সম্পর্ক। কখনও মনে হয় মেঘ-পাহাড়ের সিরিয়াস কূটনৈতিক বৈঠক চলছে, কখন আবার দুজনের সম্পর্কে কেমন যেন গাছাড়া ভাব, আবার সূর্যোদয় বা সূর্যাস্তের রঙে চলে মেঘ পাহাড়ের ক্লাসিকাল অভিসার। আসলে এ সবই মনোজগতে ভাবনা সুতোর খেয়ালি বিচরণ এর ফসল।

এভাবেই প্রকৃতি ও মানবাত্মার মিলন হয়। পাহাড়ি পথ হয় আরও রমণীয়। যে 'রম্যাণী' কখনও 'অলটিট্যিউড' দিয়ে মাপা যায় না।

ব্রেকফাস্টের পর আজ তাড়াতাড়িই চলা শুরু করেছি। সঙ্গে রয়েছে প্যাকেট লাঞ্চ। আজ আমাদের লক্ষ্য মেন আইসফল এড়িয়ে লোয়ার থেকে আপার পানপাতিয়া আইসফিল্ডে পৌছন। ধরেছি Median Moraine এর বোল্ডার বিধ্বস্ত পটভূমি। সোজা এগিয়ে চলেছি পশ্চিমদিকে মেন আইসফল বরাবর।

একসময় বোল্ডারের রাজত্ব কমেছে। বেড়েছে বর্ফিলি পথের আরামদায়ক আতিথ্য। মাঝেমধ্যে চোখের একঘেঁয়েমি কাটাতে সাদা তুষারে মাথা উঁচিয়ে রয়েছে নানা আকারের কালচে বোল্ডার। চড়াই বা উৎরাই কোনোটাই বিশেষ নেই। প্রায় নিরুত্তাপ রোদ্দুর গায়ে মেখে পথ চলায় কোথাও নেই নাগরিক ক্লান্তি। মাথার ওপর অলস অথচ দৃপ্ত ভঙ্গীতে উড়ে বেড়াচ্ছে কুচকুচে কালো চফ্ (CHOUGH)-রা। এই মিশকালো পাখীগুলো দু-ধরনের হয়। লাল ও হলদে ঠোঁটওয়ালা। এরা নাকি প্রয়োজনে ২৬,০০০ ফিট পর্যন্ত উড়তে পারে। এভারেস্টের ৮০০০ মিটার ছুঁই ছুঁই ক্যাম্পগুলোতে নাকি এই চফ্-দের দস্যুবৃত্তির ভয়েই ডাম্প করা খাবার দাবার ঢাকা দিয়ে রাখতে হয়।

তুষারশৃঙ্গ ঘেরা জায়গাটা জুড়ে অদ্ভুত রকম নিস্তব্ধতা। মাঝে মাঝে এলোপাথাড়ি ভেসে আসা হাওয়ার শব্দ আর বরফের বুকে জুতোর আওয়াজ ছাড়া আর কোনো শব্দের অস্তিত্ব নেই।

ভুল বললাম। মলয়দা আজ বেজায় স্ফুর্তিতে। দুটো হাঁটু অল্প বাইরের দিকে তেরছা করে বার করে ভালুকের মতো হেলেদুলে দিব্যি হেঁটে চলেছে। আর তার সঙ্গে শ্রীযুক্ত বকবকেশ্বরের অনর্গল বকবক করে যাওয়ার বিরাম নেই। অবশ্য মলয়দার সব কথা আমরা সবসময় বুঝতে পারছি না। বীভৎস ঠোঁট ফাটার কারণে পুরো ঠোঁট খুলে বেচারি কথাও বলতে পারছে না। ফলে মাঝেমধ্যেই দাদার মুখনিঃসৃত শব্দ আমাদের কানে ঢুকছে হিব্রু হয়ে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক চলার পর বাঁ দিকে সেকেন্ড আইসফলের একদম সামনে এসে পড়লাম। এর ঠিক উলটোদিকে অর্থাৎ উত্তর দিকে দেখা মিলেছে সেই পিছিয়ে পড়া উপহিমবাহের। এই উপবিহমাহ আর আমাদের মধ্যে রয়েছে ক্রিভাসদীর্ণ এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল। বোঝাই যাচ্ছে বহু পুরোনো হয়ে যাওয়ার

কারণে বরফের রং-ও আলাদা। সঙ্গে এয়ার প্রেশার আর হিমবাহের দু-পাশের দেয়ালের চাপের তারতম্যে তৈরি হয়েছে বিভিন্ন ধরনের জ্যামিতিক আকারের এক অদ্ভুত সমন্বয়।

একটা সরু ফিতের মতো জলধারা নেমে এসেছে ওই উপহিমবাহের গা বেয়ে। যদিও দূর থেকে দেখার কারণেই জলধারার ওই ক্ষীণ কলেবর। কাছে গেলে আকার এবং আয়তনে জলধারার এই ক্ষীণতনুটি থাকবে না তা নিশ্চিত। বিগত দিনে এই পথ ধরেই তপন পণ্ডিত, রতনলাল বিশ্বাস-রা উঠে গিয়েছিলেন পানপাতিয়ার উচ্চ প্রান্তরে।

এখান থেকে আর পশ্চিমে নয়, আমরা যাব উত্তরদিকে পার্বতীশৃঙ্গের কাছে ওই উপহিমবাহ বরাবর। এখনও টিমের কিছু সদস্য এবং মালবাহক পেছিয়ে রয়েছে। তাদের জন্যই কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছি আমরা কয়েকজন। সুমন, মঙ্গল সিং-এর সঙ্গে কথা বলছে আপার আইসফিল্ডে ওঠার রুট রিলেটেড ব্যাপারে। মঙ্গল-এর কথামত প্রথমে ঝরণার পাশ দিয়ে উঠে যেতে হবে। তারপর বরফের হাম্পটার ওপর উঠে নর পর্বতের কানেক্টিং রিজ বরাবর আরও উঠে গিয়ে, ওই ওপরে আমাদের বাঁ দিকে আর একটা যে ঝরণা দেখা যাচ্ছে, তার পাশে দুটো কালো পাথরের মাঝখানের গ্যাপটায় রোপ ফিক্স করে উঠে যেতে হবে আপার পানপাতিয়া আইসফিল্ডে।

এখনও সকলে এসে পৌঁছয়নি। সঙ্গত কারণেই মঙ্গল সিং আর এগোতে চাইছে না। আগামী পথ যথেষ্ট কঠিন এবং বিপদসঙ্কুল। এখান থেকে আপার আইফিল্ডে ওঠার টেকনিক্যাল পথটা ও সবাইকে নিয়েই এগোতে চাইছে।

চওড়া একটা কালো বোল্ডারে সলিলদা আর মলয়দা পাশাপাশি বসে। আমি ওদের থেকে একটু নীচে একটা বোল্ডার বেছে বসেছি। নিবিষ্ট মনে তাকিয়েছি আগামী পথের দিকে। ছকে নিতে চেয়েছি পথের টেকনিক্যাল জায়গাগুলো। কিন্তু বুঝতে পারছি মন পথের থেকে পথের ইতিহাস-এর প্রতি আগ্রহী হয়ে পড়ছে বারে বারে। ১৯১২ সালে সি.এফ.মিড-এর হাত ধরে যে অন্বেষণের শুরু তার থেকে ঠিক একশো বছর বাদে আমরা দাঁড়িয়ে আছি পানপাতিয়া আপার আইসফিল্ডের দোরগোড়ায়। মাঝে এরিক শিপটন, জন মোরেন, বিল টিলম্যান, হরিশ কাপাডিয়ার মতো অভিযাত্রী খুঁজে ফিরেছেন পরশপাথর। কেউ ব্যর্থ, কেউ আংশিক সফল। কলকাতার রণজিৎ আর অরুণ

নিশ্চিন্তে শুয়ে আছে কোনো বরক কাটলের অনন্ত শয়ানে। এদের সবার লক্ষ্য ছিল এক। সেই লক্ষ্যে আজ আমিও। জীবনের আর সব ক্ষেত্রের মতো পাহাড়ী পথে আসার জন্যও ভাগ্য থাকতে হয়। আমি ভাগ্যবান। ঝাপসা হয়ে আসা রোদ্দুর আর ধূসর নীলিমায় মাখামাখি, অদিতির এই রহস্যময় অঞ্চলে না হলে আমার পা-ই পড়ে না।

আপার আইসফিল্ড থেকে বয়ে আসা ঐতিহাসিক হাওয়া সমর্থন জানিয়েছে আমায়। যে হাওয়ায় মিশে আছে অরুণ আর রণজিৎ-এর ব্যর্থতা ঘেরা সাহসিকতার টাটকা ঘ্রাণ।

— "সামহালকে এক সাথ আও মেরে পিছে পিছে", মঙ্গল স্টার্ট নিয়েছে।

নেমে এসেছি শক্ত বরফের জমিতে। পায়ের নীচে কঠিন বরফে আইস অ্যাক্স সহজে গাঁথছে না। প্রাক বর্ষা হওয়ার জন্য হিমবাহের বেশির ভাগ ক্রিভাস-ই এখন তুষারে ঢাকা। তাও বেশ কিছু বড়ো ক্রিভাস এড়িয়ে আমরা এগিয়েছি উপহিমবাহটির দিকে।

সোজা বরফের জমিটা পেরিয়ে উপহিমবাহের দিকে যাবার পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে অসংখ্য ফুটিফাটা ক্রিভাস। তাই বাধ্য হয়েই বাঁ দিক দিয়ে ডিট্যুর করতে হচ্ছে।

একসময় নেমে এসেছি কম ঢালের প্রায় অনেকটা সমতল প্রান্তে। এখানে অতীতে যে হিমবাহ ছিল তা মিলিত হয়েছিল পানপাতিয়া হিমবাহের সঙ্গে।

কম ঢালের অঞ্চলটা পেরিয়ে একসময় যেখানে এসে দাঁড়ালাম সেখান থেকে খাড়া একটা রিজ উঠে গেছে পার্বতীর দিকে আর বাঁ দিক থেকে সশব্দে পাথরের বুকে ধাক্কা খেয়ে ফেনিল জলরাশি নিয়ে নেমে আসছে হিমবাহ জলে পুষ্ট এক উন্মত্ত জলধারা।

১৯৮৯ সালে ডানকান টাংস্টেন ভয়ংকর প্রধান আইসফলের মধ্য দিয়েই উঠে গিয়েছিলেন পানপাতিয়ার উচ্চ তুষার অঙ্গনে। কিন্তু উলটোদিকে না নেমে ফের উত্তরদিক ঘেঁষে পাথর বরফের উৎরাই ধরে নেমে এসেছিলেন এই লোয়ার আইসফিল্ডে। ওনার নেমে আসার পথ ধরেই আমরা উঠে যাব আপার আইসফিল্ডে।

এরই দক্ষিণ দিক থেকে আরোহণের চেষ্টা করেছিলেন মুম্বাই-এর হরিশ

কাপাডিয়ার টিম ১৯৯৭ সালে।

পুরো অঞ্চলটা জুড়ে এক অদ্ভুত আদিম নিস্তব্ধতা। ঘড়ির কাঁটা তিনটে ছুঁই ছুঁই। সীমাহীন জমাট তুষারের পটভূমি জুড়ে মেঘ কুয়াশার বিষণ্ণ খেলাঘর। মাঝেমধ্যেই তীব্র ঠাণ্ডা হাওয়ার দাপট টের পাচ্ছি।

— "লাঞ্চ কর লো, বাদ মে লাঞ্চ করনে কা জাগা নেহি মিলেগা", মঙ্গল বলে উঠেছে।

ঠিকই, আপার আইসফিল্ডে ওঠার পরবর্তী পথটুকু টানা চড়াই, সঙ্গে টেকনিক্যাল। সুতরাং ও পথে খাবার প্রশ্নই ওঠে না।

নেমে আসা জলাধারের একটু তফাতে ছড়ানো ছিটোনো বোল্ডারে আমরা হাত পা ছড়িয়ে বসেছি প্যাকেট লাঞ্চ হাতে। লক্ষ্য করেছি মহাবীর প্রায় কিছুই খাচ্ছে না। খাবারটা নিয়ে আঙুলের ফাঁকে নাড়াচাড়া করে যাচ্ছে। বোঝাই যাচ্ছে মনটা ওর বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে মঙ্গল-এর সঙ্গে ঝামেলায়। সান্ত্বনার হাত রেখেছি ওর পিঠে। ফিরে তাকিয়েছে মহাবীর। ক্রমশ ওর মুখ থেকে বিরক্তি আর রাগের কঠিন রেখাগুলো সরে গিয়ে জায়গা নিয়েছে মনখারাপের নরম রেখাগুলো।

— "খা লে ইয়ার", আমি আন্তরিক ভাবেই বলেছি। ধীরে ধীরে মুখে খাবার তুলেছে মহাবীর।

তীব্রবেগে নেমে আসা জলাধারের পাশ দিয়ে উঠে যাওয়া ঝুরো মাটি আর বোল্ডারের প্রায় ৬০-৬৫° ডিগ্রির খাড়া দেয়ালটা চড়া কিন্তু সহজ হল না। মাঝে মধ্যেই ওপর থেকে তীব্র বেগে নেমে আসছে বিভিন্ন সাইজের পাথরের টুকরো। ঝুরো মাটি আর গুঁড়ো হয়ে যাওয়া পাথরে ফুটহোল্ড রাখাই দায়। তার ওপর গড়িয়ে আসা পাথরের সামনে পড়লে সোজা ছিটকে পড়তে হবে নীচে অথবা বাঁ দিক দিয়ে নেমে আসা জলাধারের সলিল সান্নিধ্যে খুঁজে নিতে হবে অন্তিম অবগাহন। বিশুর ফ্ল্যাট ফুটের দরুণ ওর ক্ষেত্রে সমস্যাটা বাকিদের তুলনায় বেশি। কোনো একজায়গায় বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা যাচ্ছে না। দ্রুততার সঙ্গে পায়ের নীচের জমি পরিবর্তন না করলে হড়কে যাচ্ছে হোল্ড। বিশু বারবার পাথর গড়িয়ে ফেলছে। আমি ওর লাইন থেকে সরে এসেছি। বোল্ডারগুলো একটাও শক্তভাবে জমি কামড়ে নেই গ্র্যাডিয়ান্টের কারণে।

জলাধার-এর ধার ঘেঁষে সরু জমিটা তুলনামূলক সহজ মনে হয়েছে আমার। বিশুকে ক্রশ করে কিছুটা জমি ট্রাভার্স করে চলে এসেছি বাঁ দিকে। জায়গাটায় তবু ফুট হোল্ড-টা মোটামুটি রাখা যাচ্ছে। তবে ছিটকে আসা জলের কারণে পাথর বা মাটি দুটোই পিচ্ছিল। ন্যূনতম অন্যমনস্কতায় বডি ব্যালেন্স লুজ হলে পড়তে হবে সগর্জনে নেমে আসা খরস্রোতায়।

সাবধানে পেরিয়ে এসেছি অনেকটাই। তবে শেষ পর্যায়ে জায়গাটা অসম্ভব পিচ্ছিল। কিছু পাথরের গা তো যাকে বলে বেলোয়ারী মসৃণ। একটু যে ভেতরের দিকে ঢুকে আসব তারও কোনো উপায় নেই। কারণ পথ জুড়ে রেখেছে প্রায় আমার কাঁধ সমান উঁচু বোল্ডার। দুটো বোল্ডারের মাঝখান দিয়ে গলে যাবার মতো ফাঁকও নেই। একমাত্র উপায় আবার কিছুটা নেমে এসে মাঝখানের রাস্তা ধরা। আমার অসহায়তা বুঝতে পেরেছে মহাবীর।

—"মেরা হাত পাকড়ো দাদা", ওপর থেকে কয়েক পা নেমে এসে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছে ও। মুখে আস্থা যোগানোর হাসি।

মহাবীর কিন্তু ৬০০ ফুটের চড়াইটা শেষ করে একটা পাথুরে জায়গায় উঠে রেস্ট নিচ্ছিল। সঙ্গে মঙ্গল এবং আরও কয়েকজন। খুব স্বাভাবিক ভাবেই প্রায় ঘন্টাখানেকের দম বারকরা খাটুনির পর কেউ আর নীচের দিকে নামতে চায়নি। বুঝতে পেরেছে আমার অসুবিধা হলেও কোনোভাবে উঠে যাব। কিন্তু মহাবীর জায়গাটা বিপদজনক বুঝে আর দেরি করেনি। নেমে এসেছে প্রায় পনের ফুটের বোল্ডার বিক্ষত পিচ্ছিল জায়গাটা।

হিমালয়ের ঢালে এমন মানুষ আমি অনেক দেখেছি। চরিত্র এবং স্বাদে এরা একটু অন্যরকম। সূর্যের ইউ ভি রে আর আইস বার্ণের কারণজনিত এদের পোড়ামুখে থাকে পথচলার অমলিন হাসি আর বুকজুড়ে উদার ঔদার্যের পাহাড়ি জলছবি।

একে একে সবাই উঠে এসেছে রক বেড টায়। বিশুই কেবল পিছিয়ে। আমাকে দেখে বাঁ দিকের রাস্তাটাই ধরেছিল। কিন্তু আমার মতোই পিচ্ছিল জায়গাটায় এসে আটকেছে।

— "হাতটা একটু বাড়াত ডাক্তার", বিশু শরীরের ব্যালেন্স রাখতে রাখতেই পায়ের দিকে তাকিয়ে বলে উঠেছে। আমি কয়েক পা নীচে নেমে যেতে যেতেই দেখলাম পাশ দিয়ে দ্রুতবেগে নেমে গেছে বিজেন্দ্র। বিশুকে

নির্বিঘ্নে রক বেডটায় পৌঁছে দিয়ে তবেই হাত ছেড়েছে।

— "ইধাঁপে রুক না নেহি", মঙ্গল-এর কোফলাশ ছাপ ফেলেছে নিষ্কলঙ্ক তুষারের বুকে। ও আর দেরি করতে রাজি নয়। আপার আইসফিল্ড এখনও বেশ কিছুটা ওপরে। ওয়েদার এখনও ঠিকঠাকই। তবে এই অলটিটিউড্-এ "রসময়ীর রসিকতা" সম্পর্কে মঙ্গল সিং বা আমরা যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। তাই কেউই আর দাঁড়ায়নি।

রক বেড থেকে ৩০-৩৫ ডিগ্রির একটা হালকা তুষার চড়াই উঠে গেছে অনেকটা ওপরে। তারপর আরও বেশ কিছুটা বাঁ দিকে প্রায় ৫০ ডিগ্রির একটা চড়াই ভেঙে তবে ওই দুই পাথরের গ্যাপ।

রক বেড থেকে হালকা চড়াইটা উঠতে উঠতেই একবার পিছন ফিরে তাকিয়েছি। চওড়া পথটা ধরে একে একে উঠে আসছে গোটা টিম। আর পিছনে অনেক নীচে দিকচক্রবাল জুড়ে সুবিশাল পানপাতিয়া লোয়ার আইসফিল্ডের নিঃসঙ্গ প্রান্তর আর সেকেন্ড আইসফল। মুখগহবর থেকে ঝুলে থাকা জিভের মতো ঝুলে আছে ত্রিভাসদীর্ণ আইসফলটা। আর যার দু-পাশে মাড়ির মতো ফুলে আছে কালচে অমসৃণ "রক বাট্রেস"। বিদায়ী সূর্যের চিমনির মরা হলুদ আলোয় পুরো অঞ্চলটা জুড়ে যেন নিস্তব্ধতার মহাভোজ।

আকাশ ক্রমশ মেঘে ঢাকছে। কুয়াশার পাতলা চাদর অনায়াস স্বাচ্ছন্দে ঢেকে ফেলছে গোটা অঞ্চল। 'কোহরা' বা কুয়াশা পাহাড়ের বেশ কিছু 'খতরা'-র মধ্যে প্রথম সারিতে থাকবে। 'কোহরা' যতটা ফাস্ট এগিয়ে আসছে টিমের কেউ কেউ ততটাই স্লো। সবার কথা ভেবেই মঙ্গল আর একটু উঠে মোটামুটি সমতল জায়গায় ক্যাম্প 'মেন্টল' করার কথা সুমনকে জানাল। সেক্ষেত্রে কাল সকালে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আপার আইসফিল্ডের ক্লাইম্ব পর্বটা সারা যাবে। সুমন কিন্তু রাজি নয়। ও আরও এগোতে চাইছে। মঙ্গল-ও সায় দিয়েছে, সঙ্গে দলনেতা বিশু।

প্রচুর গ্লেসিয়াল টেবিলের পাশ দিয়ে যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি উঠে চলেছি দুই পাথরের গ্যাপটাকে লক্ষ্য করে। চড়াই ক্রমশ বাড়ছে। পেশীর সঙ্গে এবার মস্তিষ্কেও ক্লান্তির থাবা চওড়া হচ্ছে।

তুষারাবৃত রিজটা ধরে এগোতে গিয়ে সামনে পড়েছে কালচে পাথরের এবড়োখেবড়ো 'জাঁদেরমা'।

পৌঁছেছি পাথরের গ্যাপটার কাছে। বলা যেতে পারে এটা এক ধরনের 'গালিপথ'। বাঁ দিক থেকে ডানদিকে ঢালু হয়ে যাওয়া জায়গাটায় কঠিন তুষারে পা ক্রমাগত স্লিপ করছে। বাঁ দিকের বিশাল বোল্ডার দেয়ালটায় 'হোল্ড' প্রায় নেই। শরীরের ভর মসৃণ বোল্ডারে রেখেই পেরিয়ে এসেছি গালিপথ।

ডানদিকের পাথর আর খাড়া পাহাড়ের দেয়ালের মাঝের অংশে বরফের মধ্যে দিয়ে রোপ লাগিয়েই আমাদের পূর্ববর্তী অভিযানের সদস্যরা উঠে গিয়েছিলেন আপার আইসফিল্ডে। যাকে ২০০৭-এ প্রথম সফল পানপাতিয়া অভিযানের টিম লিডার শ্রীযুক্ত তপন পণ্ডিত 'পার্বতী গালি' নামে অভিহিত করেছিলেন।

আমরা কিন্তু ও পথে উঠব না। মাঝখানের বড়ো পাথরের ওপরে উঠে সেখান থেকে রকফেসগুলো ব্যবহার করে রোপ লাগিয়ে উঠে যাব শেষ পর্যায়ে।

পাহাড়ি লোকজনের মধ্যে একটা কথা চালু আছে — "মুম্বাই কা ফ্যাসন ঔর পাহাড় কা মওসম একহি জ্যায়সা হোতা হ্যায়।" কাঁহাবত টার পূর্ণ মর্যাদা দিয়ে আবহাওয়া কিন্তু আবার ক্লিয়ার। কুয়াশা সরে গেছে।

কয়েকজন পোর্টার পাশের রক ওয়াল ধরে ক্লাইম্ব করে উঠে গেছে আপার আইস ফিল্ডে। স্বর্ণেন্দুও ওই পথ ধরেছে। মলয়দাও স্বর্ণেন্দুর দেখানো পথে অ-ব্যকরণসম্মত এক আজব রক ক্লাইম্বিং-এ ছুঁয়েছে উচ্চ প্রান্তরের তুষার জমি।

আমি আর বিশু দুটো রাস্তাই মনোযোগ দিয়ে দেখেছি। এই রক ক্লাইম্বিং-টাই দুজনের মনে ধরেছে। তুলনায় কম রিস্কি। মানসিক প্রস্তুতিও নিয়ে নিয়েছি।

— "এদিকটা দিয়ে নয়, পাশের দিকটা দিয়ে আয়", হঠাৎ মলয়দা ওপর থেকে চেঁচিয়ে উঠেছে।

বাঁ পাশের একটা সংকীর্ণ বরফের ঢাল ও নির্দেশ করছে। ঢালটা রীতিমতো বিপজ্জনক। ডানদিকে কয়েকটা পিচ্ছিল বোল্ডারের গা থেকে বরফের ঢালটা ক্রমশ গড়িয়ে গেছে বাঁ দিকে। নীচে অতলান্ত খাদ। পা হড়কালে এ জীবনের মতো দুনিয়াদারি ছাড়তে হবে এটা নিশ্চিত। মঙ্গলও ওর কথায় সায় দিয়েছে। আমি আর বিশু বারবার বোঝানোর চেষ্টা করেও হার মেনেছি। মলয়দার বক্তব্য ও নাকি ওপর থেকে বেশি ভালো বুঝতে পারছে।

দু-কয়েল রোপ লাগানো হল, প্রথম বরফের ঢালটা অতিক্রম করার

জন্য। 'ফিগার অব এইট' নটে ক্যারাবিনার-এর সঙ্গে রোপ লাগিয়ে সকলেই রেডি। বিজেন্দ্র প্রথমে পেরিয়েছে জায়গাটা। ওর পাহাড়ি পা-ও স্লিপ করেছে। তবে ও ঠিকঠাকই পৌঁছেছে।

— "ডাক্তার যা", দলনেতার নির্দেশ।

আমি আর মহাবীর এগিয়েছি। রোপ-এ ভর করে যতটা সম্ভব সাবধানে পা ফেলেছি। আগে মঙ্গল, সলিলদা আর সুমন পেরোনোয় কিছু ফুট স্টেপ 'হোল্ড' এর কাজ করছে। এটুকু 'পিচ' এতটাই বিপদজনক যে ডানদিকের বোল্ডারের হালকা সাপোর্ট কিছুটা হলেও সুবিধাজনক। পুরোটা সুবিধাজনক নয় এই কারণে যে ডানদিকে বেশি হেলে বোল্ডারের গায়ে রুকস্যাকের ধাক্কা লাগলে 'নিউটনস থার্ড ল' অনুযায়ী খাদের দিকে গড়িয়ে যাবার সম্ভাবনা প্রবল। একসময় রোপ ধরে উঠে এসেছি বরফের বুকে জেগে থাকা একটা বোল্ডারের ওপর।

এখান থেকে আপার রিজিয়নে উঠতে গেলে আমার আন্দাজে পঞ্চাশ ফুটের একটা চড়াই পেরোতে হবে। যার গ্র্যাডিয়ান্ট আরও বেশি। সোজাসুজি প্রায় ৮০ ডিগ্রির কাছাকাছি। সঙ্গে বাঁ দিক থেকে ডানদিকে প্রায় ৫০ ডিগ্রির গ্র্যাডিয়ান্ট।

আবার রোপ ফিক্স করা হয়েছে। সুমন, বিশু, শঙ্খদা আর প্রায় সব পোর্টার উঠে গেছে। সঙ্গে মঙ্গলও। নীচে রয়েছি সলিলদা, বেদাতী বউদি আর আমি।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে নামছে। ভুলবশত তিনটে হেডটর্চের সবগুলোই রুকস্যাকের নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে। এই গ্র্যাডিয়ান্টে দাঁড়িয়ে স্যাক খোলা প্রায় অসম্ভবের পর্যায়ে পড়ে।

আমি স্টার্ট করেছি।

কেন জানি না লাস্ট ল্যাপটা পার হবার সময় প্রথম থেকেই নিজেকে নড়বড়ে লেগেছে আমার। এতক্ষণের পথশ্রমের ক্লান্তি, খাবার জল ফুরিয়ে যাওয়া আর আগের ওই বিপদজনক খাড়াই 'পিচ' পেরোনোটা বোধহয় নিঃশেষ করেছিল আমায়। তার ওপর আবার এতজনের পরে জায়গাটা পেরোনোটাও একটা ফ্যাক্টর হয়েছে। প্রথম দিকে যারা পেরিয়েছে আইস অ্যাক্স দিয়ে তৈরি করা STAIRCASE HOLDটা ভালোমতো পেয়েছে। কিন্তু তারপর পরপর বারোজন পেরোনোর পর জায়গাটা পুরো খাটাল হয়ে গেছে। অপয়া 'তেরো'-

নম্বরের জন্য যা মোটেও স্বাস্থ্যকর নয়।

প্রায় তিন চতুর্থাংশ রাস্তা পেরিয়েও গেছি। আর তারপরই বিপত্তি। খাড়াই ‘পিচ’টা ভেঙে শরীরটা হাঁটু অবধি ঢুকে গেল বরফের মধ্যে। বরফ ভেঙে আচমকা ঢুকে যাওয়ায় হুমড়ি খেয়ে পড়েছি সামনে। ডায়াগোনালি শুয়ে আছি বরফের সাদা ধপধপে কার্লোপিলোর গদিতে। গোদের ওপর বিষফোড়ার মতো শরীরের যে অংশটা বরফে ঢুকে গেছে, সেই অংশটুকু তলা দিয়ে বয়ে চলা হীমশীতল জলধারার স্পর্শে ক্রমশ অসাড় হয়ে পড়ছে। বাইরে বেরিয়ে থাকা শরীরের বাকি অংশটুকু আমার বরফশয়ান-এর ফলে রীতিমতো বেকায়দায়। যতবার দু-হাতের চাপে ওঠার চেষ্টা করছি জায়গাটা তত ভেঙে ঢুকে যাচ্ছে। আঙুল দিয়ে বরফ খামচে ধরার কারণে নেল ব্লেড ফেটে হালকা রক্তের রেখা পড়েছে বরফের শুভ্র কাঠিন্যে।

সন্ধে হয়ে গেছে। আবছা একটা আলো পড়ে রয়েছে ধু ধু বরফের অনন্ত রাজ্যে। হাওয়ার বেগ বেড়েছে, সঙ্গে ঠান্ডার প্রকোপও। স্বাভাবিকভাবে পুরো টিম ঘটনার আকস্মিকতায় হতচকিত। এত কাণ্ডের পরেও কপাল ভালো বলতে হবে যে রোপটা ছাড়িনি। ওপর থেকে স্বর্ণেন্দু আর কয়েকজন পোর্টার রোপ টেনে গায়ের জোরে তোলার চেষ্টা করছে আমায়। ফলস্বরূপ রোপ যেন ক্রমশ গেঁথে বসেছে কোমরে। কোমর থেকে পায়ের আঙুল পর্যন্ত ভীষণ অসাড় লাগছে বরফের হিম আতিথ্যে। এটুকু মনে আছে যন্ত্রণায় চিৎকার করে বলে উঠেছিলাম, “টানিস না, কোমরে প্রচণ্ড লাগছে।” স্বর্ণেন্দু কী যেন একটা বলে উঠেছিল। তাতে নীচ থেকে সলিলদার মতো ঠান্ডা মানুষও ক্ষেপে গিয়ে গাল পেড়েছিল।

একসময় উঠে এসেছি ওপরে। উঠে এসেছি না বলে দড়ি টেনে তোলা হয়েছে বলাটাই যুক্তিযুক্ত। ক্লান্তি, তেষ্টা, ঘটনার আকস্মিকতা আর ঠান্ডার দাপটে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় যাকে বলে ‘সাইকোমোটর স্কিলস’ অর্থাৎ ‘হ্যান্ড আই কো-অর্ডিনেশন’, ‘রিয়্যাকসান টাইম’, ‘অ্যাকিউরেসি’ ইত্যাদি অদ্ভুত ভাবে নড়ে গিয়ে মেন্টালি ডিসব্যালান্স করে দিয়েছিল আমায়। ফলত এই সময়টুকুর বর্ণনা দেওয়া আমার পক্ষে বেশ কঠিন। মনে আছে পরে বিশু বলেছিল, “প্রথমবার ওঠার চেষ্টা করে যেই তুই আরও বরফে ঢুকে গেলি, তোর ফেসিয়াল এক্সপ্রেশনটা চেঞ্জ হয়ে গিয়েছিল।”

নীচে রয়ে যাওয়া বেদান্তী বউদি আমার ঘটনাটায় রীতিমতো নড়ে গেছে। নড়ে যাওয়াটাও খুবই স্বাভাবিক। আমি ওপর থেকে দেখতে পাচ্ছি বউদি উবু হয়ে মাথা নীচু করে বসে পড়েছে। সলিলদা হাত ধরে খাড়াই 'পিচ' টা পার করে দিতে চাইলেও বউদি ভরসা রেখেছে মঙ্গল সিং-এর ওপর।

কিন্তু মঙ্গল ততক্ষণে বেশিরভাগ পোর্টারকে নিয়ে আরও একটা চড়াই ক্রশ করে পৌঁছে গেছে ক্যাম্পসাইটে। এমনকি আমার অ্যাকসিডেন্ট-এর সময়ও মঙ্গল ছিল না। বউদির জন্য বিজেন্দ্র প্রায় দৌড়ে চড়াইটা পেরিয়ে ডেকে এনেছে মঙ্গলকে।

মঙ্গল এর সাহায্যে বউদি যখন প্রায় আঠারো হাজার ফিটের পানপাতিয়া আপার আইসফিল্ডে উঠে এসেছে তখন চারপাশ জুড়ে অন্ধকারের রাজত্ব। মঙ্গল বকুনি খেয়েছে সলিল দার কাছে, টিমকে ছেড়ে টেন্ট পিচ করতে চলে যাওয়ার জন্য। কাজটা পোর্টারদের ওপর ছেড়ে ও আমাদের সঙ্গে থাকতেই পারত। জানি না কেন, হয়তো ঠান্ডার হাত থেকে বাঁচতে ও তাড়াতাড়ি টেন্ট-এর আশ্রয়ে ঢুকতে চেয়েছিল।

শেষ চড়াইটা যখন পেরোচ্ছি তখন মঙ্গল আমার পাশে। খুব সম্ভবত অনুতাপের কারণেই ও বারবার আমাকে বলেছে, "ঠিক হ্যায় না ডক্টর সাব?"

হাতের গ্লাভস ছিঁড়ে ফর্দাফাই। জ্বালা করছে তালুটা। এতক্ষণে খেয়াল হল। অন্ধকারে ঠাহর করতে না পেরে তালুতে জিভ ঠেকাতেই নোনতা স্বাদ পেলাম।

শেষ চড়াইটা সবাই দিব্যি পেরিয়েছি। এখান থেকে একটা প্রায় সমতল প্রান্তর গিয়ে মিশেছে টেন্টগুলোর সামনে। দিব্যি যাচ্ছিলাম। হঠাৎ একটা তীব্র কাঁপুনি দিল আমার সারা শরীর জুড়ে আর তারপরই পারশিয়াল আনকনসাস্‌নেস এর একটা ফেজ। এখান থেকে তাঁবু অবধি স্মৃতি ভীষণ ঝাপসা। কী ঘটেছিল মনে নেই পরিষ্কারভাবে। একদিন কলকাতায় বিশুর ঘরে বসে শুনেছিলাম ঘটনাটা। চায়ের কাপে সশব্দে আমেজ ভরা একটা চুমুক দিয়ে বিশু বলেছিল, "চড়াইটা তুই ঠিকঠাকই পেরোলি। আমি তোর পিছনে ছিলাম। হঠাৎ দেখলাম তুই মুখ থুবড়ে বরফের ওপর পড়লি। নড়াচড়া কিচ্ছু নেই। ডাকাডাকিতেও সাড়া নেই। এভাবে কিছুক্ষণ কাটার পর লোকজন ধরে নিয়েছে তুই মরে গেছিস। স্বর্ণেন্দু তো কেঁদেই ফেলল। মঙ্গল তো তোর বডি নামানোর জন্য

হেলিকপ্টার আনার জন্য বদ্রীনাথ যাবে ঠিক করে ফেলেছিল। যাইহোক তোকে ধরাধরি করে তাঁবুতে আনা হল। তারপর তাঁবুর গরম আর সঙ্গে গরম চা টা পেয়ে তোর জ্ঞানটাও ফেরত এল আর কিছুক্ষণের মধ্যে বেশ চাঙ্গা হয়েও উঠলি।''

— ''আভি তো ঠিক হ্যায় ডক্টরসাব?'' মঙ্গল সিং জুলজুল করে আমার দিকে চেয়ে প্রাণপণে পায়ের তলা ঘষছে।

আমি উঠে বসেছি। মাথাটা ভারী লাগলেও শরীর অনেকটাই চাঙ্গা। আমি 'বডি' হয়ে যাইনি এটা দেখে মঙ্গল সিং-ও বেশ স্বস্তিতে। বাকিরাও ছন্দে ফিরেছে। জলের সমস্যাও মিটেছে। ক্যাম্পের বাঁ দিকে কিছুটা নীচে রয়েছে একটা হিমবাহ সরোবর। হেড টর্চ লাগিয়ে কয়েকজন পোর্টার রোপ ধরে নেমে গেছে সেখানে।

আমাদের তাঁবুতে একে একে জড় হয়েছে সবাই। বউদি বাদে বাকি ছজনই এখন ফোর মেন টেন্টটায় জড়াজড়ি করে বসেছি। শুরু হয়েছে তুমুল আড্ডা। সলিলদার নানা অভিজ্ঞতার গল্পে কেটে গেছে কিছু প্রাণবন্ত সময়। দাদার বলার ভঙ্গিটা অতটা মুখরোচক না হলেও, গল্পের ঝুলিটা কিন্তু বেশ ঠাসা। পঁয়ত্রিশ-টা বছর মানুষটা পাহাড়ের আনাচে কানাচে ঘুরছে। পাহাড়ের গাছপালা, পশুপাখি, জনজীবন, টেকনিক্যাল জ্ঞান, এরকম নানাবিধ বিষয়ে জ্ঞানভান্ডার প্রচুর। যথেষ্ট শিক্ষণীয়।

সন্ধে বয়ঃসন্ধি পেরিয়ে রাতের দিকে হাঁটা দিয়েছে। তবু টিম মেম্বারদের ক্লান্তি নেই। এক্সপেডিশানের মূল টেকনিক্যাল জায়গাটা পেরিয়ে আসার স্বস্তিতে শারীরিক ক্লান্তি যেন কোথায় উবে গেছে। আরেকপ্রস্থ চা নিয়ে মঙ্গল সিংও হাজির হয়েছে আড্ডায়। প্রথমে একটু চুপ করে থাকলেও কিছুক্ষণের মধ্যেই মিশে গেছে অন্তরঙ্গ আড্ডায়। শুরু করেছে ওর জীবনের গল্প। ওর ছোটোবেলা, পরিবার, উত্তরকাশীর রাজনৈতিক অস্থিরতা সব মিলিয়ে আজই প্রথম মঙ্গল আমাদের কাছে এক 'খোলা খাতা'।

বাইরে থেকে বিজেন্দ্র-র হাঁক শুনে একসময় অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভাঙতে হয়েছে 'সদানন্দের মেলা'। টেন্টের ভেতরেই দিয়ে গেছে ডিনার। গরমাগরম ম্যাগির স্যুপটা অমৃত লেগেছে। আর একবার চেয়ে খেয়েছি।

শোয়ার আগে একবার অল্প সময়ের জন্য বাইরে বেরিয়েছি। চারদিক

নিঝুম। হাওয়ার শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। ঝকঝকে পরিষ্কার আকাশ। হিমেল বাতাবরণে চারদিক জুড়ে শুভ্র তুষার আর অল্পবিস্তর কালচে কঠিন পাষাণের গম্ভীর ঔদাসীন্যের মাঝে, অদ্ভুত বৈপরীত্য আকাশের সামিয়ানা জুড়ে। সেখানে এখন লক্ষ হীরের কুঁচির মতো দীপ্যমান তারাদের সজাগ রাত পাহারা।

প্রকৃতির মকরন্দ আকণ্ঠ পান করে একসময় ঢুকে এসেছি টেন্ট-এ। ক্লান্ত দেহের বিশ্রামে মনে কত সুখ! ওপরে আকাশ ভরা তারা, চারদিকে হিমালয়ের নিবিড় শান্তি। ওয়ার্ডসওয়ার্থের সেই :

"The silence that is in the starry sky,
The sleep that is among the lonely hills."

আমাদের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন কত অল্প। আমরা অভাগা মানুষগুলো কেন যে তা বুঝি না!

সপ্তম দিন

'ভেতো বাঙালি' শব্দটায় আমার প্রবল আপত্তি আছে। কোথাও এ কথাটা বলে বাঙালিকে কুঁড়ে দেখানোর একটা অপচেষ্টা সেই কোন কাল থেকে চলে আসছে। অথচ বাঙালির রক্তে দুটো 'ভ' এর যোগ ওতপ্রোতভাবে জড়িত — 'ভ্রমণ' ও 'ভূগোল'।

'ভ্রমণ'-এ বাঙালি একপায়ে খাড়া। যেরকমই আর্থিক সঙ্গতি থাক না কেন, নিদেনপক্ষে দীঘা বা পুরী যায়নি এরকম বাঙালি মেলা ভার। এর হাতে গরম উদাহরণ আমার বাবা। কেন্দ্রীয় সরকারের সাধারণ কর্মচারী ছিলেন। তবু সংসারের সব দিক সামলেও ভ্রমণ-এর ইচ্ছেতে কখনও ভাঁটা পড়েনি। একটা পাউডারের কৌটোর মাথাটা ব্লেড দিয়ে কেটে টাকা বা পয়সা ফেলার জায়গা করা থাকত। আর সারা বছর বাবা আমি আর মা সেখানে খুচরো পয়সা বা নোট ফেলতাম। বলাই বাহুল্য নোট আমি কখনোই ফেলিনি। ওই পাঁচ পয়সা, দশ পয়সা মায় দু-পয়সাও ফেলেছি টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে। বছর শেষে বেড়াতে যাবার সময় হলে কৌটো খোলা হত আর তিনজনে মিলে হিসাব করতাম কত জমল। ব্যাপারটায় প্রচণ্ড উৎসাহ ছিল আমার। তারপর হোল্ডল-এ বিছানাপত্র বেঁধে বেরিয়ে পড়তাম হাওড়া বা শিয়ালদার দিকে। পরে অবশ্য হোল্ডল-এ বিছানাপত্র বাঁধাছাঁদা করার ব্যাপারটা উঠে গেল। হোটেল গুলোতেই দিব্যি দুগ্ধফেননিভ বিছানাপত্র, কম্বল সবই পাওয়া যেত। কিন্তু ওই 'বাঁধাছাঁদা' আজও আমায় টানে, ঠিক আগের মতোই।

বাবাকে দেখেছি কোনো জায়গায় বেড়াতে যাবার আগে জায়গাটা সম্পর্কে খোঁজ খবর নিতেন যেমন সবাই নেয় আর কী। কিন্তু বিগত বেশ কিছু বছর ধরে বেশ কিছু বাঙালি পরিবারকে দেখেছি যাঁরা বেড়ানোর জায়গাটার 'ভূগোল' সম্পর্কেও যথেষ্ট আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। আগে এ ব্যাপারে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিত ভ্রমণ বিষয়ক বইপত্র এবং ম্যাগাজিনগুলো। এখন তো ইন্টারনেট ঘরে ঘরে। সুতরাং গুগুল সার্চ করলেই হাতের মুঠোয় পৃথিবী। তাই আর বইপত্র খোঁজার ঝক্কিটা নিতে হয় না।

আর ভূগোলের হাত ধরে বাঙালি তো ইতিহাসেও জড়িয়ে। এভারেস্ট-এর উচ্চতা মাপার কাজে বড়ো ভূমিকা ছিল রাধানাথ শিকদার-এর। যদিও সাহেবসুবো হবার সুবাদে স্যার জর্জ এভারেস্ট এর নামেই শৃঙ্গের নামকরণ হয়ে গেল আর শিকদারবাবু চলে গেলেন প্রায় বিস্মৃতির পাতায়।

সেই কোন কালে সুকুমার রায়ের হ য ব র ল-এর ঘামমোছা রুমাল থেকে হয়ে ওঠা বেড়াল বিশ শতকে বলেছিল, "গরম লাগে তো তিব্বত গেলেই পারো"। তিব্বত যাওয়ার পথটা বলতেও কসুর করেনি সে — "কলকেতা, ডায়মন্ডহারবার, রাণাঘাট, তিব্বত, ব্যাস। সিধে রাস্তা, সওয়া ঘণ্টার

পথ, গেলেই হল।"

এমনিতেই হিমালয়ের প্রতি বাঙালিদের বেশ একটা দুর্বলতা আছে। আর সেখানে তিব্বত তো শুধু একটা জায়গার নাম নয়। তিব্বত একটা আশ্রয়, ভাবনা, কনসেপ্ট। তার মধ্যে আবার রহস্য, জটিলতা, রাজনীতি। আর সেই তিব্বতের রহস্যময় অন্দরমহলে শুধুমাত্র সুকুমার রায়-এর সাহিত্যের কল্পনা ছায়া ফেলেনি, ডানপিটে বাঙালির পা পড়েছে সেই কোন কালে।

শরৎচন্দ্র দাস ছিলেন দার্জিলিং-এর ভুটিয়া বোর্ডিং স্কুলের হেডমাস্টার। আঠারোশো শতাব্দীতে তিব্বত ঘুরে এসে তিনি তিব্বত ভ্রমণের ওপর দুটো বই-ও লিখে ফেলেন। যার একটা হল, 'জার্নি টু লাসা এন্ড সেন্ট্রাল টিবেট (১৮৮১)' এবং অন্যটি 'টিবেটান ইংলিশ ডিকশনারি উইথ সিনোনিমস (১৯০২)'।

১৮৮৬ সালে রামকৃষ্ণদেব প্রয়াত হবার পর তাঁর শিষ্যরা অনেকেই একে একে বেরিয়ে পড়লেন ভারত ভ্রমণে। তাঁরই এক শিষ্য গঙ্গারাম ওরফে স্বামী অখণ্ডানন্দ ১৮৮৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বেরিয়ে পড়েন হিমালয়ের পথে। তিব্বত যাওয়া যে সহজ কাজ নয় তা তাঁকে বলেছিলেন এক বাঙালি সাধু। তিনি থাকতেন কেদারের পথে ফাটাচটিতে। শরৎচন্দ্রের থেকে অখণ্ডানন্দের যাত্রাপথ কিন্তু আলাদা ছিল।

ফাটাচটির সাধু তিব্বত গিয়ে কৈলাস আর মানস সবোবর দেখে এসেছিলেন। রাণাঘাট থেকে তিব্বত যে সোজা রাস্তা নয়, সওয়া ঘণ্টার পথও নয়, এ সত্য ফাটাচটির সাধুর বিলক্ষণ জানা ছিল।

অখণ্ডানন্দকে তাই তিনি বলেন, "মান সরোবর কোন পরসে, বিনা বাদর হিম বরসে, উড়ন্ত কঙ্কর জীব তরসে।" অর্থাৎ মানস সরোবরে বৃষ্টি পড়ে না, তুষারপাত হয়। ঝোড়ো হাওয়ায় পাথর উড়ে গিয়ে আঘাত করে যাত্রীদের।

হিমালয়ের পথে পথে বরফময় শৃঙ্গের আনাচে কানাচের মধ্য দিয়ে তিব্বতের দিকে অখণ্ডানন্দের যাত্রা। তাঁর তীব্বত ভ্রমণের কাহিনি 'তিব্বতে তিন বৎসর' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে 'উদ্বোধন' পত্রিকায়। পরে যা সম্পূর্ণ ভ্রমণকাহিনি হয়ে বেরিয়েছিল 'তিব্বতের পথে হিমালয়ে' নামের একটা বই হয়ে।

শরৎচন্দ্র এবং স্বামী অখণ্ডানন্দের জীবন, ধ্যান, ধারণা সবই আলাদা।

একজন সাধারণ মানুষ আর একজন সন্ন্যাসী। তবু দুজনকেই হিমালয়ের বিশালত্বের চৌম্বকশক্তি টেনেছে একইভাবে। হয়তো দেখার চোখ আলাদা ছিল তবে তাতে আত্মার তৃপ্তির বোধ হয় ব্যাঘাত ঘটেনি।

সাধে কী অবন ঠাকুর তাঁর 'বুড়ো আঙলা'-য় বলেছিলেন, "কোনোদিন ভুলো না যে পৃথিবীর সেরা হচ্ছে এই হিমালয়, আর সেইটে ভগবান দিয়েছেন তাঁর কালো ছেলেদের।"

আর ডানপিটে 'কালো ছেলে'-রা না জেনেও অজান্তে অনুসারী হয়ে পড়েছে রামকৃষ্ণদেবের এক গান-এ —

আপনাতে আপনি থেকো মন, যেও নাকো কারু ঘরে,
যা চাবি তা বসে পাবি, খোঁজ নিও নিজ অন্তঃপুরে।"

তাদের এই 'অন্তঃপুর'-এর সেতারে বেজে চলা অন্তঃসলিলা ধরা দিয়েছে হিমালয় নামক এক আপাতকঠিন জায়ান্ট গ্র্যানাইট-এ। সেখানে হৃদয়ের কোমল প্রবৃত্তিগুলো ধরা দেয় বড়ো সহজে, যেখানে ভালোবাসা বড়ো নিঃশব্দে আসে বোধের হাত ধরে, যেখানে আচমকাই কৈশোর ফিরে এসে কাঁধে হাত রাখে অবলীলায়।

আর এই পাষাণ, নির্ঝরিণী, তুষারের আদিম রহস্যময়তায় বিশ্বজনীনতা উপলব্ধীর মোক্ষেই, সেই কবে থেকে হিমালয়ের পথে পড়েছে দামাল বাঙালির পা। শঙ্কু মহারাজ, জলধর সেন, উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, প্রবোধ সান্যালের পাশাপাশি কত নামী অনামী বাঙালির দুর্জয় পদক্ষেপ ইতিহাস হয়ে আছে।

তাঁদের নামগুলো লিখে ভারাক্রান্ত না করে পাঠকের কাছে আমার একটাই প্রশ্ন — এরপরও বাঙালি 'ভেতো'! রাজনীতির লড়াই থেকে পাহাড়ের চড়াই সব জায়গায় অক্লেশে কলার তোলার পর-ও বাঙালির এহেন বদনাম সহ্য হয় না বস্। এইরকম জুনুন আর কটা জাতির আছে বলুন দেখি! তাই প্রাদেশিকতা নয়, এটা আমার যৌক্তিক প্রতিবাদ।

অখণ্ডানন্দের ভ্রমণ কাহিনি শেষ হয়েছে এক 'কাঞ্চনাসক্ত' সাধুর কথায়। লোহার চিমটেকে সেই সাধু ক্রমাগত পাহাড়ের গায়ে ঠোকে আর হাহাকার করে বলে, লোহা কেন সোনা হচ্ছে না। অবাক অখন্ডানন্দ লিখেছেন, "হিমালয় দর্শন করিয়া যে অপার আনন্দ তাহার তুলনায় স্পর্শমণি যে অতি তুচ্ছ।"

লোভী সাধু তা স্বাভাবিক ভাবেই বোঝেননি।

ঠিক যেরকম আমাদের শ্রীযুক্ত মলয় দেবনাথবাবু বুঝছেন না আজ সকাল থেকে। ঘুম ভাঙতেই সুমনের পিছনে লেগেছেন। বক্তব্য অতি পরিষ্কার। খাওয়া দাওয়া স্যার এর মনোমত হচ্ছে না। আসলে মলয়দার মস্তিষ্কটা থাকে উদরে। উদর ঠান্ডা থাকলেই মস্তিষ্ক ঠান্ডা। পাহাড়ি পথে দাদার রোজকার আহার্য মানে ধোঁয়া ওঠা গরম ভাত, ডাল আর ডিমসেদ্ধ মিলছে না। প্রাতরাশে ম্যাগির ময়দা সুতোর তুচ্ছ বন্ধন, দাদার ঋষিতুল্য পাকস্থলীর ধ্যান ভাঙাতে নিতান্তই অক্ষম। ম্যানেজার সুমন কুণ্ডু মহাশয় সার্বিক পরিস্থিতি বুঝে একটা অমলিন হাসি রেখে দিয়েছে ঠোঁটে। ও মলয়দা-কে হাড়ে হাড়ে চেনে। ধারাল যুক্তি যে এইসময় মলয়দার চিন্তাসূত্রকে কাটতে অক্ষম সেটা বেশ কিছু বছর একসঙ্গে পাহাড়ে যাবার সূত্রে ও ভালোমতই জানে। সুতরাং এক্ষেত্রে প্রসন্ন নীরবতাই শ্রেয়।

আসলে মলয়দা মানুষটা সহজ ভাবে বোঝাতে গেলে একটু খ্যাপাটে। মস্তিষ্কের সঙ্গে উদরের প্রেম পিরিতি যতটা, হৃদয় আবার মস্তিষ্কের অতটা আশিক হয়ে ওঠেনি কখনও। ফলত যুক্তি ছাপিয়ে সুকুমার রায়ের 'পাগলা দাশু' চরিত্রটা মাঝে মধ্যেই স্থান কাল পাত্র ব্যতিরেকে বেরিয়ে আসে অনায়াসে।

কিন্তু একবাক্যে মানতেই হবে মানুষটা ভালো। এইসব খাপছাড়া স্বভাবের অসম্ভব 'কালারফুল' চরিত্রগুলো পাহাড়ের পথে না থাকলে পাহাড়ি আকাশে 'রামধনু' দেখাই হত না।

সত্যি ময়লদার সঙ্গে হিমালয়ের পথে হাঁটা এক 'হিমালয়ান অভিজ্ঞতা'।

মলয়দার অভিমান অবশ্য বেশিক্ষশ থাকেনি। ভালোবাসা যেখানে ঝলমলে রোদ্দুর, অভিমানের ছায়া সেখানে বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না।

বিশু তাঁবুর দরজার মুখে চায়ের কাপ হাতে পা এর ওপর পা তুলে বেশ আয়েশ করে বসেছে। চায়ের গ্লাসটাকে দু-হাতে জড়িয়ে ওম্ নিতে নিতে তুরীয় মেজাজে চুমুক দিচ্ছে। পিছনে খোলা স্লিপিং ব্যাগটা এলোমেলো হয়ে পড়ে আছে এখনও। বাবুর হুঁশ নেই। সুমন একবার তাড়া দিয়েছে রেডি হওয়ার জন্য। নির্বিকার টিম লিডার মাথায় অবশিষ্ট সবেধন নিলমণি চুল কটাকে হাত দিয়ে ঝেড়ে বলে উঠেছে — "হবে হবে, সব হবে"।

আমাদের ম্যানেজার সুমন যতটা টেনশনগ্রস্ত লোক, টিম লিডার বিশ্বজিৎ হাজরা ততটাই 'কুল কুল' বেবি। পাহাড়ে নানা সমস্যায় কোনো কিছুতেই

'চাপ' নেয় না। বলা ভালো চাপ নিলেও সেটা টিমের কাউকে বুঝতে দেয় না। বিশুকে দেখেছি শহর কলকাতায় যে ব্যাপারগুলোয় বিরক্ত হতে, পাহাড়ে সেই সব ব্যাপার স্যাপারে বিলকুল বিন্দাস। পাহাড়ের নির্মল নিষ্কলুষ আতিথ্য এইসব মানুষের স্নায়ুতন্ত্রকে অদ্ভুত 'রিলিফ' দেয়।

এক্সপিডিশানগুলোতে সুমন, বিশুর অবস্থা ওই 'বাদাকশ' শাইর-এর মতোই হয়। যিনি লিখেছেন —

"গিন্ গিন্‌কে যো পী ও কুছ ন পী
জো বেখুদী মেঁ পী য়ো কুছ পী"

অর্থাৎ হিসাব করে পাত্রের সংখ্যা গুনে গুনে যে মদ্যপান করে সে আবার কীসের মাতাল? আসল মাতাল তো সে যে আত্মবিস্মৃত হয়ে পান করে।

যে-কোনো এক্সপিডিশনে যথোপযুক্ত সরঞ্জাম, রুট অ্যানালিসিস, পাহাড় সম্পর্কে জ্ঞান এগুলো যেমন জরুরি, ঠিক ততটাই জরুরি একটা 'টিম'। একটা সঠিক টিম কম্বিনেশন যে কতটা জরুরি তা রুটে না নামলে বোঝা যায় না। পাহাড় যেন মনোজগৎ বিশ্লেষণের এক আজব ল্যাবরেটরি। সমতলের স্বাচ্ছন্দে যাদের আদিম মানসিকতাগুলো ঠিকঠাক বোঝা যায় না, প্রকৃতির এই অনন্ত উচ্চভূমির জটিল পথ তাদের কুটিল মনের রসায়নকে সঠিক বিশ্লেষণ করে দেয়।

আমি ভাগ্যবান পাহাড়ের অনন্ত ঔদার্যে শঙ্খদা, সুমন, বিশু, স্বর্ণেন্দুর মতো 'একবুক অক্সিজেন'কে সঙ্গী হিসাবে পেয়ে।

অন্যান্য বিভিন্ন রুটে জুলুদা, ছোটে, শান্তনু, অসীম, প্রমোদ, চন্দনদা আমার কাছে চারপাশের অভ্রলেহী রুক্ষ পাথরের মিনার, দুরন্ত পরিখা আর তৃষিত জমির মাঝে হঠাৎ-ই পাওয়া 'লাশ-গ্রিন' যৌবন।

— "ডাক্তার, তুষার চিতার দেখা পেলে"? সলিলদা বাঁ পায়ে লাল গ্যেইটার-টা লাগাতে লাগাতে প্রশ্ন ছুঁড়েছে আমাকে।

সলিলদা এমন ক্যাসুয়ালি কথাটা বলল যেন তুষার চিতা আর পাড়ার কুকুর 'কালুবাবু'র মধ্যে কোনো তফাৎ নেই। যদিও পাহাড়ে স্নো-লেপার্ডের হাতে মানুষের হেনস্থার সংখ্যা বড়োই কম, তবুও চিতা তো।

— "মঙ্গল সিং বলেছিল বটে যে এই রুটে মাঝে মাঝে দেখা যায়, তবে চোখে তো পড়েনি," আমার কৌতূহলী উত্তর।

পাহাড়ি অঞ্চলে ইল্যুউশান, ডিল্যুউশান আর হ্যালুসিনেশান এর ফলে তৈরি হওয়া ইয়েতি একটা অবাস্তব চরিত্র হলেও স্নো লেপার্ড কিন্তু আদ্যন্ত এক বাস্তব চরিত্র। মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়ার পাহাড়ি অঞ্চলে মূলত এদের বসবাস। বাইনোমিয়াল নেম Panthera Uncia. ৫৫-৬০ কেজি ওজনের এই প্রাণীর শীতকালে ৩৯০০ ফুট থেকে ৬৬০০ ফুট অবধি চলাফেরা সীমাবদ্ধ থাকলেও গ্রীষ্মকালে এদের গতিবিধি ৮৯০০ ফুট থেকে ১৯৮০০ ফুট অবধি। ভারতবর্ষে এদের দেখা যায় মূলত জম্মু ও কাশ্মীর, উত্তরাখণ্ড, অরুণাচল, হিমাচল প্রদেশ ও সিকিমে। ১৯৯০ সালের গণনা অনুযায়ী ইন্ডিয়ান স্নো-লেপার্ড পপুলেশন্ ছিল প্রায় ৬০০। বর্তমানে সভ্যতার হাত ধরে এদের সংখ্যা দিন দিন কমছে। এরা মাংসাশী কিন্তু শীতকালে Myricaria Squamosa নামের উদ্ভিদ-ও এদের খাদ্যতালিকাভুক্ত। দার্জিলিং-এর হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট (HMI)-এর পাশের জু-তে এদের দেখা মেলে।

— "যাই দেখি, যদি তুষার চিতার দেখা পাই", মুচকি হেসে সলিলদা একটু দূরে একটা পাথরের আড়ালে গেল টয়লেট সারতে।

মানুষটা অদ্ভুত। যতক্ষণ রুটের মধ্যে আছে ততক্ষণ অসম্ভব প্রাণবন্ত। গল্প, আড্ডা, জোকস সব মিলিয়ে রীতিমতো প্রাণোচ্ছল। কিন্তু রুটের বাইরে অদ্ভুত চুপচাপ। মনে আছে ফেরার পথে হরিদ্বারে ভারত সেবাশ্রম সংঘে দুটো এসি রুম ভাড়া নিয়ে আমরা ছিলাম। তার মধ্যে একটা ঘরে সলিলদা একা সারাদিন কাটিয়ে দিল। উলটোদিকের ঘরে আমরা তখন সবাই আড্ডায় ডুবে আছি। সন্ধে সাতটার দিকে সুমন আর শঙ্খদা, সলিলদাকে মোটামুটি পাকড়াও করে নিয়ে এল আমাদের ঘরে। তবে একথা মানতেই হবে পাহাড়ে লোকটার পারফরম্যান্স ওই তুষার চিতার মতোই সাবলীল, ছন্দময় এবং ক্ষিপ্র।

আজ ১৭ই জুন, রবিবার। সকাল প্রায় ৮টা বাজে। কলকাতার নাগরিক ঘুম এখনও হয়তো বিছানা বালিশের নিবিড় দাম্পত্যে ওম্ নিচ্ছে। আমাদের তাঁবুগুলো কিন্তু 'ডিসম্যান্টল' করা হয়ে গেছে। হালকা ব্রেকফাস্টের পর চলছে চা পান পর্ব। মলয়দা আর মঙ্গল সিং বেশ সশব্দে চা খায়। দুজনের চা খাওয়ার ভঙ্গি দেখে সলিলদা ফুট কেটেছে, "দ্যাখো ডাক্তার, যেন সাগর শুষে নিচ্ছে, আগের জন্মে বোধহয় অগস্ত্য ছিল।"

দাদার মেজাজ আজ সকাল থেকেই রীতিমতো মস্ত্।

মেজাজ অবশ্য সকলেরই মস্ত। চ্যালেঞ্জিং একটা টেকনিক্যাল ক্লাইম্বের পর গতকাল আমরা উঠে এসেছি লোয়ার থেকে আপার পানপাতিয়া আইসফিল্ডে। রুটের প্রধান বাধা টপকে আসার পর টিমের লোকজন মানসিক ভাবে যে দারুণভাবে চাঙ্গা থাকবে এতে আর আশ্চর্যের কি।

সকাল থেকেই ওয়েদার কিন্তু আমাদের মেজাজের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে একদম 'সানলাইট'-এ ধোয়া ঝকঝকে। কাল যখন টেন্ট পিচ করা হয়েছিল অন্ধকারে ঠিক মতো বোঝা যায়নি। আজ জায়গাটায় ভালো করে চোখ বোলালাম। যথারীতি অসংখ্য তুষারাবৃত রিজ আর পিক এর মেলায় আমাদের সহাবস্থান। কাল যেখান থেকে পোর্টাররা জল নিয়ে এসেছিল সেই গ্লেসিয়াল পণ্ড-টাও চোখে পড়ল। বরফের পাতলা সর জমে আছে জলের উপরিভাগে। বেশ কিছু তুষারাবৃত হাম্প থাকার দরুন জায়গাটা বেশ ঢেউ খেলানো।

সকাল ৮টা ৩০-এ মঙ্গল সিং স্টার্ট করেছে। পিছনে বেদাতী বউদি, আমি আর শঙ্খদা।

ক্রমশ চড়াই বেড়েছে। সূর্যের আলোয় বরফ গলে প্রায় হাঁটু পর্যন্ত ঢুকে গেছে। পিছন ফিরে দেখা যাচ্ছে বিষ্ণুগড় ধার। একসময় মঙ্গল-এর পিছনে আমি আর সলিলদা। উচ্চতা আর খাড়াই এর কারণে দমে ঘাটতি হচ্ছে তবু অন্তত তিরিশ পা এগোব এই হিসাব রেখে এগোচ্ছি।

জায়গাটার ভূ-জ্যামিতিটা কিন্তু দুর্দান্ত। ক্রমশ খাড়া উঠে যাওয়া তুষার অঞ্চলটায় কে যেন চুলে বিলি কাটার মতো অসংখ্য আঙুল চালিয়ে গেছে খাড়াই বরাবর। ফলত অল্প হলদে-শুভ্র তুষারের বুকে সাপের মতো এঁকেবেঁকে সেই কোন ওপরে উঠে গেছে অসংখ্য অগভীর দাগ। আর তার মাঝে আমাদের পায়ের ছাপ যোগ হয়ে যে ক্যানভাসটা তৈরি হয়েছে সেটা তাকিয়ে দেখবার মতো। আর খাড়াইটা যেখানে শেষ হয়েছে বলে মনে হচ্ছে, ঠিক তার পেছন থেকে আচমকাই মাথা তুলে বিরাজমান প্রহরীসদৃশ এক তুষার ঢাকা শৃঙ্গ।

প্রায় দু-ঘণ্টা স্নো-মার্চ এর পর উঠে এসেছি ৫৩০০ মিটার এবং ৫৬০০ মিটারের দুটো শিখরের মাঝে ১৭২১২ ফুট উচ্চতার এক স্যাডেলে। স্যাডেলটায় ওঠার আগের অংশে রয়েছে একটা দমফাটা চড়াই। অনেকটা বার্থ-ডে কেকের ধার থেকে কিছু অংশ কেটে নিলে যেরকম আকৃতি নেয় চড়াইটা অনেকটা ওরকমই। মঙ্গল সিং দু-হাত তুলে চেঁচিয়ে উঠেছে — "জয় বদ্রীবিশাল কী জয়"।

— "আভি তো পানপাতিয়া কল্ নেহি আয়া, তো তুম বদ্রী বিশাল জী কো কিঁউ ইয়াদ কিয়া?" মঙ্গলকে আমার কৌতূহলী প্রশ্ন।

— "ডক্টর সাব, ইয়ে পানপাতিয়া পাস হ্যায়, সমঝ লো পানপাতিয়া কল্ কি তরফ জানে সে যো যো চড়াই হ্যায়, ও হাম সব চড় গ্যায়ে," মুলোর মতো হলদেটে দাঁতগুলো বার করে মঙ্গলের উচ্ছ্বসিত জবাব।

স্যাডেল-এর যে জায়গাটায় আমরা এখন দাঁড়িয়ে সেটা ঘোড়ার পিঠে 'জিন'-এর মতো অপেক্ষাকৃত একটু নীচু জায়গা। এখান থেকে রিজটা ক্রমশ সরু হয়ে একটা শৈল্পিক লেফট টার্ন নিয়ে, সাপের উদ্ধত ফনার মতো ছুঁয়েছে শীর্ষ, প্রায় আকাশের কাছাকাছি।

মঙ্গল প্রথাগত পুজো পাঠ সেরেছে। ছবিও তোলা হয়েছে খানকতক। আমার চোখ আর মন কিন্তু ছুঁয়ে আছে স্যাডেলের ওই শীর্ষভাগ।

— "চড়বে না কি?" সলিলদাকে জানতে চেয়েছি।

— "চলো চলো", আমাকে তাতাবার জন্য সলিল বিচ্ছুর কাল্পনিক উৎসাহভরা উত্তর ভেসে এসেছে তৎক্ষণাৎ।

সলিলদার মোটেও যাবার ইচ্ছে ছিল না। আমার ছটফটানিটা টের পেয়েই, আমি কী করি দেখার জন্যই দাদার এহেন উৎসাহ দান।

— "এই ডাক্তার বাড়াবাড়ি করিস না," পিছন থেকে বিশুর লিডারসুলভ সাবধানবাণী ভেসে এসেছে।

ও আমাকে নব্বই দশকের গোড়া থেকেই চেনে। একসঙ্গে কোচিং ক্লাসে যাওয়া বা সকালে মাঠে ফুটবল খেলা, যৌবনের বেশ কিছু সময় একসঙ্গে কাটিয়েছি। ফলত আমার অ্যাডভেঞ্চার প্রিয়তা মাঝে মাঝেই যে বিপদ আপদের তোয়াক্কা না করে বাঁদরামির দিকে টার্ন নেয় সেটা ও জানে। তাই সঙ্গে সঙ্গেই বাগড়াটা দিয়েছে। দেরি করার বিলাসিতাটা আর দেখায়নি। স্বর্ণেন্দু-ও তাল মিলিয়েছে বিশুর সঙ্গে। সুতরাং আমার শীর্ষ ছোঁওয়ার ইচ্ছেটাকে বরফ চাপাই দিতে হল।

— "ডাক্তার, আকাশের অবস্থা ভালো নয়, এবার হল না তো কি হয়েছে, কখনও হবে। পাহাড় চাইলেই হবে," সলিলদা আমার ভেতরটা বুঝতে পেরেই স্বান্তনা দিয়েছে।

'পাহাড় চাইলেই হবে', কথাটা আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি। অনেক

সমর্থ টিম অনেক সহজ পিক করতে পারেনি, 'পাহাড় চায়নি' বলেই। আমার পিতৃদেবের বড়ো ইচ্ছে ছিল কেদারনাথ দর্শন করার। তিনবার ট্রেনের টিকিট কেটেও ক্যানসেল করতে হয়েছে প্রত্যেকবার, ভিন্ন ভিন্ন কারণে, ওই 'পাহাড় চায়নি' বলেই।

ওয়েদার কিন্তু সত্যিই ক্রমশ ডিপ্রেসড্ হতে শুরু করেছে। আকাশের ক্যানভাস জুড়ে মেঘের মন খারাপের মনোভাব অতি স্পষ্ট। সাদা থেকে ধূসর হয়ে মেঘরাজির ডানায় এখন কৃষ্ণকলির ছোঁয়া। সেই ডানা ধীরে ধীরে ঢেকে দিচ্ছে আশেপাশের সমস্ত শিখরগুলোর মাথা। এদের ভরসা নেই। কথা নেই বার্তা নেই হঠাৎ-ই 'গেরিলা অ্যামবুশ' শুরু করে দেবে।

মঙ্গল সিং তাড়া দিয়েছে সঙ্গত কারণেই।

সামনে এখনও প্রায় ৭-৮ কিমিঃ বিস্তৃত পানপাতিয়া আপার আইসফিল্ড। মঙ্গল চাইছে যত তাড়াতাড়ি পারা যায় কলের কাছাকাছি পৌঁছতে।

এবার রোপ আপ-এ সারিবদ্ধ গোটা টিম। আপার আইসফিল্ডের তুষার ঢাকা চোরা ক্রিভাস-এ ভরসা নেই। যখন তখন যে-কোনো 'ভাগ্যবান'কে 'ডুবিয়ে' দিতে পারে। আইসফিল্ডের চারদিকের তুষারাবৃত পাহাড়গুলোর গায়ে এখন আলোছায়ার এক অদ্ভুত লুকোচুরি খেলা। মেঘ ছেঁড়া হালকা হলদেটে মন কেমন করা আলো পাহাড়ের গায়ের অল্প কিছু অংশে এখনও ছড়িয়ে আছে। বাকি অংশ মেঘের চাদরে ক্রমশ ঝাপসা অবয়ব। সুতীব্র হিমেল হাওয়ার ছোবল ক্রমশ বিষাক্ত হয়েছে। আমার লাল হোলিফিল জ্যাকেটের হুড-এ মাথা ঢেকেছি। তাতেও নিস্তার নেই। ন্যূনতম ফাঁক পেলেই বর্ফিলি হাওয়া কামড় বসিয়েছে মুখের বিভিন্ন অংশে। পায়ের নীচে বরফের গভীরতাও বেড়েছে।

অল্প আলোয় যেটুকু দেখা যাচ্ছে তাতে বোঝা যাচ্ছে, আপার আইসফিল্ডের সীমানা ছুঁয়ে রয়েছে বেশ কয়েকটা পর্বতচূড়া যার কোনোটারই উচ্চতা এই উচ্চ তুষার প্রান্তর থেকে ১৫০০ ফুটের বেশি হবে না। আর এই পর্বতচূড়াগুলোর প্রত্যেকের মাঝেই রয়েছে বেশ কয়েকটা গ্যাপ, যেগুলো দিয়ে অন্য দিকে নেমে যাওয়া যেতে পারে বলে মনে হয়।

আমাদের দক্ষিণ দিকে রয়েছে পানপাতিয়া কল, যা এখনও আমাদের চোখের আড়ালে। কিন্তু সরাসরি দক্ষিণদিকে অর্থাৎ কল-এর দিকে যাওয়া যাবে না। কারণ ঠিক মাঝামাঝি ৫৩০০ মিটার ও ৫৯২২ মিটারের দুটো পিক-এর

কানেক্টিং রিজ থেকেই নেমে এসেছে মেন আইসফল। ফলশ্রুতি হিসাবে তৈরি হয়েছে প্রচুর ক্রিভাস-এর। অগত্যা আমাদের এগোতে হবে স্নো-ফিল্ডের পশ্চিমদিক বরাবর। তারপর পিকগুলোকে ডানদিকে রেখে এগোতে হবে ৫৯৮৯ মিটার আর ৫৭৯৯ মিটার উচ্চতার দুটো পিক-এর মধ্যবর্তী 'গ্যাপ'-টার দিকে। যে 'গ্যাপ'-টাই আমাদের বহু আকাঙ্ক্ষিত 'পানপাতিয়া কল'।

কিছুক্ষণ ধরেই অল্পবিস্তর তুষারপাত শুরু হয়েছিল। এবার মাত্রা বেড়েছে। স্নো-ফল এর ছিটপিট শব্দ উঠেছে হোলিফিল আর ফেদার জ্যাকেটগুলোর গায়ে। মঙ্গল থামেনি। ও আর একটু এগোতে চায় পশ্চিমদিক বরাবর।

তুষারপাতের প্রাবল্য কিন্তু ক্রমশ বেড়েছে, পাল্লা দিয়ে কমেছে ভিসিবিলিটি। এ অবস্থায় ক্রিভাসগুলো ক্রস করা আর যেচে যমরাজের বাড়ি নেমতন্ন খেতে যাওয়া একই ব্যাপার। দেড় হাত দূরের কাউকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না। যাকে বলে প্রায় 'ডেড লাইট'। এই ডেড লাইট যারা পাহাড়ে দেখেননি, তাদের বোঝানো মুশকিল। তবু একটা ধারণা দেবার চেষ্টা করছি। তুষারাবৃত স্থানে কুয়াশা কিংবা মেঘের জন্য মাঝেমধ্যে সূর্যের আলোর প্রখরতা এত কমে যায় যে ছায়া সৃষ্টি হয় না। এই অবস্থায় কিছুই প্রায় নজরে আসে না। চড়াই উৎরাই সম্বন্ধেও সঠিক ধারণা করা যায় না এবং ক্রিভাস কিংবা পথের অন্যান্য বিপদও দেখা যায় না।

মঙ্গল সিং সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছে। প্রচণ্ড তুষারপাত আর ঠান্ডা হাওয়ার ঝাপটার মধ্যেই যখন টেন্ট পিচ করা হল, ঘড়িতে তখন দুপুর দুটো। তাঁবুগুলোর চারদিকে রোপের লক্ষ্মণগণ্ডি দিয়েছি আমরা আর মঙ্গলের দলবল। আজ রাতে এটাই আমাদের বিপদসীমানা। ওপারে নিশ্চিত মৃত্যু নিয়ে ওয়েট করছে ক্রিভাসের মরণফাঁদ। রোপের গণ্ডি দেবার সময় একবার হাত থেকে মিটন-টা খুলেছিলাম। বেশিক্ষণ খুলে রাখা যায়নি। মুহূর্তে ফিঙ্গার পাল্পগুলো জমে শক্ত হয়ে গেছে ঠান্ডা ঝোড়ো হাওয়ার লাগামছাড়া প্রেম পিরিতিতে।

ঠান্ডায় জমে যাওয়া শরীর আর এতক্ষণ স্নো মার্চের ফলে সাদা হয়ে যাওয়া পাদুটো নিয়ে যখন তাঁবুর কবোষ্ণ আতিথ্যে ঢুকেছি, বাইরে তখন অন্ধকার তার ঈগল ডানা ছড়িয়েছে সীমানা না রেখেই।

— "ওয়েদার ভোগাবে মনে হচ্ছে," বিশু সাদা হয়ে যাওয়া পা দুটো ঘষতে ঘষতেই বলে উঠেছে।

— "আরে ধুত্তোর ওয়োদার, আমার ঠোঁট দুটোর কি অবস্থা দেখেছ?" ওষ্ঠ বিড়ম্বনায় জর্জরিত মলয়দা বলে উঠেছে।

— "এ তো ঠোঁটজুড়ে ক্রিভাস বস," বিশুর টিপ্পনীতে ইন্ধন জুগিয়েছে আমার আর সুমনের ফিচেল হাসি।

কায়রো শহরের বাসিন্দা-দের একটা ব্যাপারে বেশ গর্ব আছে যে তারাই নাকি একমাত্র আড্ডা দিতে জানেন। কায়রোবাসীর বোধ হয় বাঙালিদের সম্পর্কে সম্যক ধারণা নেই। বাঙালি তো তার আপন আপন আয়ুরেখার একটা মস্ত লভ্যাংশ উৎসর্গ করে দিয়েছে আড্ডার খাতায়। আড্ডার রকমফেরও কিন্তু ভীষণরকম বৈচিত্রে ভরা। কখনও চায়ের ভাঁড় হাতে কেঠো বেঞ্চিতে আড্ডা, কখনও কলেজ ক্যান্টিনের চ্যাটচ্যাটে টেবিলে তুমুল আড্ডা, ট্রেনে গামছা বা বড়ো রুমাল পেতে তাসের আড্ডা কিংবা ক্যালকাটা ক্লাবের মতো উচ্চবিত্তদের আস্তানায় হুইস্কির গ্লাস হাতে আড্ডা। বাঙালি সব জায়গাতেই সমান স্বচ্ছন্দ। আড্ডার বিষয়বস্তুতেও খামতি নেই। রাজনীতি, চলচ্চিত্র, সাহিত্য, সংগীত, পরকীয়া, খেলাধুলো, ব্যবসা মায় পাশের বাড়ির ঢলানে বউদিও বাঙালির আড্ডার বিষয়বস্তুতে অক্লেশে জায়গা করে নেয়।

তো এহেন আড্ডাবাজ বাঙালি আঠারো হাজার ফুটের পাহাড়ে গিয়েও সময় কাটাতে আড্ডাকেই বেছে নেবে এটাই স্বাভাবিক। বউদি বাদে বাকি সবাই হাজির আমাদের তাঁবুতে। জনমানবহীন নিঃস্তব্ধ এক তুষারপুরীতে ক্রমশ জমে উঠেছে আমাদের আজকের 'মুশায়রা'।

মধ্যবিত্ত কিছু বাঙালি এক হলে তাদের খোশগল্পও ওই মুড়ি, চানাচুর, পেঁয়াজকুচি, লঙ্কা মাখানোর মতোই বেশ সহজ সরল নির্ভেজাল হয়। আঁতলামির গন্ধ সেখানে নাকে আসে না। আমাদেরও তাই, আটপৌরে অথচ সরস আদান-প্রদানে জমে উঠেছে এক জমজমাট মেহফিল।

একটা ফোর মেন টেন্টে ঘেঁষাঘেষি সাত জন। মাঝখানে খবরের কাগজের ওপর প্যাকেট থেকে উপুড় করা চিঁড়ে ভাজা। চিঁড়েভাজা থেকে বেছে বেছে বাদামগুলো আলাদা করে খাবার হুড়োহুড়ি। সেই হুড়োহুড়িতে মলয়দার টাটিয়ে থাকা লিকলিকে ঠ্যাঙদুটোর ওপর হঠাৎ লেগে যাওয়া। আর তারপর যন্ত্রণায় মলয়দার গলা থেকে বেরিয়ে আসা অভূতপূর্ব সব চিৎকার। সব মিলিয়ে কাঁপা কাঁপা মোমবাতির আলোয় সুবিশাল আপার আইসফিল্ডের মাঝে বিন্দুর মতো

আমাদের ছোট্ট টেন্টটা এক কথায় নরক গুলজার।

আড্ডায়, বন্ধুতায়, সহৃদয়তায়, ছোটোবড়ো কোনো স্বার্থের কথা না ভেবে অনায়াস বয়ে চলা এইসব অসম্ভব দামি 'মুহূর্ত'গুলো উপহার দেওয়ার জন্য আমার 'চ্যাম্পিয়ন টিম'-কে আমার তরফ থেকে একটা লম্বা সেলাম।

— "চায়ে লিজিয়ে," তাঁবুর বাইরে মঙ্গলের গলা।

শঙ্খদা জিপারটা টেনে হাত বাড়িয়ে থালায় সাজানো চা গুলো নিয়েছে। সঙ্গে ফাউ হিসাবে ঢুকে এসেছে সুতীব্র ঠান্ডা হাওয়া আর মঙ্গল সিং নিজে। আমাদের তাঁবুর ভেতরের হইচই ওকেও টেনে এনেছে আমাদের মধ্যে।

সুমনের সঙ্গে কালকে কল্ ক্রশ করার ব্যাপারে কিছু কথা বলে নেওয়ার পর মঙ্গল মেতে উঠেছে ওর উত্তরকাশীর গল্পে। ওখানকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি যে খুব সুবিধের নয় বা 'একশো দিনের কাজ'-এর অবস্থাও বেহাল এইসব বলে চলেছে অনর্গল। আমিও খুঁচিয়েছি আরও খবরাখবর জানবার তাড়নায়।

প্রত্যেকবারের এক্সপিডিশানেই একটা ব্যাপার বোধহয় কমন। সেটা হচ্ছে এক্সপিডিশন শেষ হবার পর গেট টুগেদার-এ কী খাওয়া দাওয়া হবে তার ফিরিস্তি। ব্যাপারটার মধ্যে কিন্তু একটা বেশ মজার মনস্তত্ত্ব জড়িয়ে আছে। বাঙালির এমনিতেই পেটুক বলে সুনাম সর্বজনবিদিত। অথচ রুটে কবজি ডুবিয়ে খাবার মতো, মনোমতো খাবার দাবার পাওয়া মুশকিল। তাই ভালো ভালো খাবারের কথা বলে ঝিমিয়ে পড়া পৌষ্টিকতন্ত্রকে চাঙ্গা করার এ এক অনবদ্য কৌশল। যে যত পারে ভালো ভালো খাবারের নাম বলে। আর বাকিরা শাইরীর মুগ্ধ শ্রোতার মতো 'কেয়াবাৎ' 'কেয়াবাৎ' বলে ওঠে। ঘ্রাণে অর্ধভোজন হয় এটা জানা ছিল কিন্তু শ্রবণেও যে কিঞ্চিৎ ভোজন হয় তা এইসব 'অ্যামবিয়েন্স'-এর আঁচ না পোহালে জানা হত না।

— "এবার আমার বর্ধমানের বাড়িতে গেট টুগেদার হবে," মলয়দার জমিদারী স্ট্যাইলে ঘোষণা।

সোল্লাস সমর্থনের সম্মিলিত চিৎকারটা আইসফিল্ডের ঝোড়ো হাওয়ার আওয়াজকেও ছাপিয়ে গেছে।

— "কি খাওয়াবে বস্" পেটুক বিশুর সাগ্রহ প্রশ্ন।

— "হাঁসের মাংস আর গেঁড়ি গুগলি কষা, আমার বউ চমৎকার বানায়," মলয়দা সগর্বে উত্তর দিয়েছে।

প্রসঙ্গত মলয়দা কিন্তু কথা রেখেছিল। এক্সপেডিশনের পর একদিন সবাই বর্ধমানে মলয়দার বাড়ি গিয়ে ডানহাতের যথেচ্ছ সদব্যবহার করেছিলাম।

এরকম দমদার বৈঠকী ছেড়ে ওঠার ইচ্ছে কারোরই হয় না। কিন্তু 'রুটিন' শব্দটা পাহাড়েও পিছু ছাড়ে না। কালকেই সেই দিন যার জন্য বেশ কয়েক মাসের প্রস্তুতি। ঐতিহাসিক পানপাতিয়া কল ক্রশ করার চাপা উত্তেজনা সকলের মধ্যেই সযত্নে লালিত। সুতরাং আর রাত না করে ডিনারটা এবার করতেই হবে।

— "ডিনারকে বাদ সবহি কো হরলিকস দেনা", মঙ্গলকে সুমনের সিরিয়াস সতর্কীকরণ।

'সিরিয়াস সতর্কীকরণ' শব্দদুটো এক্ষেত্রে ব্যবহার করলাম এই কারণেই যে প্রত্যেকবার পাস ক্রশ করার আগের দিন রাত্রে ডিনারের পর প্রত্যেকের হরলিক্স সেবন, সুমন একেবারে বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে। এতে নাকি পাস ক্রশ করাটা নির্বিঘ্নে হয়। কোন মহান মাউন্টেনিয়ারের থেকে এই টিপসটা ও পেয়েছে সেটা অবশ্য সবারই অজানা। কিন্তু সকলেই ব্যাপারটা মেনে নিয়েছে আর সোনামুখ করে প্রত্যেক এক্সপেডিশনে খেয়েও নেয়। বিশুও খায় তবে 'সোনামুখ' করে কিনা বলতে পারব না। কারণ ওর আবার 'সফট ড্রিঙ্কস' বিশেষ পছন্দের পানীয় নয়।

হাওয়ার দাপট ক্রমশ বেড়ে ঝড়মুখী হওয়ার একটা স্পষ্ট আভাস দিচ্ছে। পাহাড়ে প্রকৃতির মতিগতি মোটামুটি ছলনাময়ী নারীর পর্যায়ে পড়ে। ঘরোয়া সারল্য থেকে কখন যে সে শৃঙ্গার-এর চরম মূহুর্তে পৌঁছবে তা দেবাঃ ন জানন্তি।

সুমন সবার শেষে টেন্ট রুফ-এ আটকানো ওর হেড টর্চটা নিভিয়ে শুয়ে পড়েছে। বাইরে ক্রমাগত বয়ে চলা হাওয়ার শোঁ শোঁ আওয়াজ উপসংহার টানছে তাঁবুর ফ্যাব্রিকে ধাক্কা মেরে। ঘুম আসছে না। অথচ চুপচাপ শুয়ে থাকা ছাড়া কোনো গতি নেই। বিশুর মোবাইলে আজ গানও বাজেনি। চার্জ পড়ে গেছে নাকি আবহাওয়ার গতিপ্রকৃতি ওকে চিন্তায় রেখেছে সেটা আমার অজানা।

— "আর পারা যাচ্ছে না, এবার বেরোতেই হবে," আচমকাই স্লিপিং ব্যাগের চেন টেনে ধড়ফড় করে উঠে বসেছে এক এবং অদ্বিতীয় মলয় দেবনাথ।

— "আবার কি হল!" সুমনের গলায় বিস্ময় এবং কৌতূহল স্পষ্ট।

— 'টয়লেট পেয়েছে প্রচণ্ড," মলয়দার সংক্ষিপ্ত উত্তর।

এই তুফানি পরিবেশে, অন্ধকারের ভীষণতায় বাইরে বেরনো যে কী

জিনিস তা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানে। আপাতত ভুক্তভোগী মলয়দা। আমরা টয়লেট সেরে স্লিপিং ব্যাগ-এ ঢুকে গেছি বেশ কিছুক্ষণ আগেই। মলয়দা এখন চলেছে নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে। দাদা সবসময়ই মিসটাইমড়্।

কিছুক্ষণ বাদেই প্রাকৃতিক কাজ সেরে দৌড়ে তাবুর কাছে ফিরে প্রায় ডাইভ দেবার ভঙ্গিতে ভেতরে ঢুকেছে মলয়দা। আর তারপর কাঁপতে কাঁপতে তাঁবুর জিপার না টেনেই ঢুকে গেছে স্লিপিং ব্যাগের ভিতরে। বাধ্য হয়ে সুমনই উঠে জিপার টেনেছে। কিন্তু ততক্ষণে একগাদা ঠান্ডা হাওয়া অবাধ্যের মতো ঢুকে পড়েছে তাঁবুর অন্দরমহলে। এতক্ষণের তিলে তিলে জমা হওয়া তাঁবুর উষ্ণতা মুহূর্তে নেমে গেছে কয়েক পারদ।

মহাশয় রসিক সন্দেহ নেই। তবে মধ্যযামিনীতে এরকম 'হাড়হিম' করা রসিকতা কার আর ভালো লাগে।

প্রকৃতির 'ডিপ্রেশন'-এর সঙ্গে মনের 'ডিপ্রেশন'-এর কোথাও একটা অদৃশ্য যোগাযোগ থাকে। হৃদয় অবাধ্য কিছু অনুভূতি মন না চাইলেও ঢুকে পড়ে মনের অন্দরে। তারপর মনের এ ঘর সে ঘর তার উদাসীন ঘুরে বেড়ানোর এক অলস স্পর্শে, মনের চলনটাকেই করে দেয় আলসে। যেখান থেকে কুঁড়ে মনটাকে বার করে আনার একটাই পথ — কিছু কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখা। কিন্তু এ পোড়া সময়ে চুপচাপ স্লিপিং ব্যাগে পড়ে থাকার অকাজ ছাড়া আর কী বা করার আছে? এভাবেই বয়ে গেছে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত কিছু নিথর সময়। আমি চোখ বুজে মন স্থির করার একটা চেষ্টা করেছি। নিকষ অন্ধকারে চোখ বুজিয়ে রাখা বা খুলে রাখার মধ্যে বাস্তবিক কোনো তফাৎ নেই। তবু চোখের পাতা দুটো এক হলে কোথাও খাপছাড়া মনটার একটা সংযুক্তি আসে, স্নায়ুতন্ত্রের গঠনতন্ত্রে কো-অর্ডিনেশনটাও সহজ হয়।

বেশিক্ষণ অবশ্য চোখ বুজিয়ে থাকা যায়নি। ঝড় শুরু হয়েছে। তাঁবুর আউটারে আছড়ে পড়েছে ফ্লেক্স-এর অবাধ্যতা। প্রচণ্ড হাওয়ার গোঁ গোঁ শব্দে দুলে উঠেছে টেন্ট পোল।

— "বিশুদা, অবস্থা তো ভালো নয় গো," সুমনের গলায় অল্প হলেও উদ্বেগের ছাপ স্পষ্ট।

বিশু নিরুত্তর থেকেছে।

রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ শুরু হয়েছে তুষারঝড়। এবার আর ফ্লেক্স নয়,

তুষারের একটানা 'কার্পেট বম্বিং' নির্মম ভাবে আঘাত করেছে তাঁবুর দেয়ালে। প্রায় সাড়ে আঠারো হাজার ফিটের অলটিট্যিউড্‌-এ বিশাল পানপাতিয়া আপার আইসফিল্ড জুড়ে প্রকৃতির রুদ্র নাচনের মাঝে, চারটে ফোর মেন টেন্টে পনেরোজন মানুষ প্রতিটা মুহূর্তে বড়ো নির্মম পাঠ নিয়েছে প্রকৃতির বিশালত্বের পাঠশালায়। যেখানে 'লেসন্‌' হিসাবে একটাই কথা শেখানো হয়েছে বারবার — মানুষ তুমি তোমার আণুবিক্ষণীক ক্ষমতা নিয়ে অসীমের বিরুদ্ধে যেও না। লড়াই নয়, প্রকৃতির প্রতি থাকুক তোমার শ্রদ্ধাবণত ভালোবাসা।

ব্লিজার্ড-এর বেগ ক্রমশই বেড়েছে। সমস্ত প্রকৃতি জুড়ে আজ মনখারাপের তিথি। আমাদের ছাড়া সমস্ত পৃথিবী জুড়ে যেন কোনো প্রাণী নেই। নিষ্প্রাণ এক দৈত্যপুরীতে উন্মত্ত নাচ নেচে চলেছে আপার আইসফিল্ডের ক্রুদ্ধ, প্রতিবাদী এক হিংস্র হাওয়া। অবাধে তাঁবুর ওপর হানাদারি চালিয়েছে বিদ্বেষী তুষারপাত। মাঝেমধ্যেই ফাইবারে তৈরি তাঁবুর পলকা 'পোল' কেঁপে কেঁপে উঠেছে ঝড়ের ঝাপটার আগ্রাসী আপত্তিতে।

একবার সত্যেন দত্তের অনুবাদে বিবেকানন্দের কালীরূপ-এর বর্ণনা পড়েছিলাম। আজকের বাতাবরণ যেন অনেকটাই সেরকম —

"নিঃশেষে নিবেছে তারাদল
মেঘ আসি আবরিছে মেঘ
স্পন্দিত ধ্বনিত অন্ধকার
গরজিছে ঘূর্ণ বায়ুবেগ।
লক্ষ লক্ষ উন্মত্ত পরান
বর্হিগত বন্দীশালা হতে
মহাবৃক্ষ সমূলে উপাড়ি
ফুৎকারে উড়ায়ে চলে পথে।"

প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়েছে একটা। বোধ হয় কাছেপিঠেই কোথাও। একেই বোধ হয় বলে, 'একে রামে রক্ষা নেই সুগ্রীব দোসর'। এতক্ষণ যাও বা তুষার ঝড় আর পাগলা হাওয়ার এলোমেলো তাণ্ডব নেওয়া যাচ্ছিল, বজ্রপতনের বুক কাঁপানো আওয়াজে সমস্ত পরিস্থিতি প্রায় ষোলোকলা পূর্ণ হওয়ার পথে। আশেপাশের তাঁবু থেকে এতক্ষণে গলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। মনের ওপর চেপে বসা চাপটা যে এবার মাত্রা ছাড়াচ্ছে সেটা তাঁবুগুলোর হঠাৎ জেগে

ওঠাতে দিব্যি মালুম হচ্ছে।

কয়েক মুহূর্তের ব্যবধানে আবার পরপর কয়েকটা বাজ পড়েছে। টেন্ট উইন্ডোর নেট চুঁইয়ে তাঁবুর ভেতর ছিটকে এসেছে এক ঝলক সাদা আলো। সেই আলোতে মুহূর্তের দেখায় আমার মনে হল টেন্ট রুফ-টা যেন বেশ কিছুটা নীচে নেমে এসেছে। কিছুক্ষণ ধরেই অল্প একটু ব্রিদিং ট্রাবল হচ্ছিল। উল্লেখযোগ্য কিছু নয় তাই পাত্তা দিইনি। ভেবেছিলাম সার্বিক পরিস্থিতির চাপেই মনের ভুল বোধ হয়। কিন্তু না, বাজ পড়ার চোখ ঝলসানো আলোয় আমি স্পষ্ট দেখেছি টেন্ট রুফের অবস্থা। তাঁবুটা আরও ছোটো হয়ে গেছে আর চারটে মানুষের শ্বাসপ্রশ্বাসে কার্বন ডাইঅক্সাইডের মাত্রাও বেড়েছে। তাই ব্রিদিং ট্রাবলটা এক্ষেত্রে অবশ্যম্ভাবী। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে টেন্ট রুফে আটকানো সুমনের হেড টর্চটা জ্বালিয়েছি। অস্বাভাবিকভাবে নীচে নেমে এসেছে রুফের মধ্যভাগ যা প্রায় ছুঁয়েই ফেলেছে আমার পাশে শোওয়া বিশুর স্লিপিং ব্যাগ।

— "সুমন ওঠ," স্পন্টেনিয়াসলি আমার গলা থেকে বেরিয়েছে শব্দগুলো।

আমার গলার আওয়াজে সুমনের সঙ্গে বিশুও উঠে বসেছে। পরিস্থিতি দেখে দুজনের মুখেই কথা জোগায়নি কয়েক মুহূর্ত।

শুধু যে জমা হওয়া বরফের ভারে তাঁবুর ছাদ নেমে এসেছে তাই নয়, তার সঙ্গে টেন্ট এর আউটার আর ইনার 'মার্জ' করে গিয়ে তাঁবুর ইনার ফ্যাব্রিকে বরফের কাস্ট 'জমে' গেছে। আমাদের শ্বাসের জলীয় বাষ্প তাঁবুর ভেতরের দেয়ালে বরফের পাত হয়ে জমেছে। সেগুলো মাঝে মধ্যেই খসে পড়ছে আমাদের গায়ে। ফলত স্যাক, স্লিপিং ব্যাগ, ক্যামেরার ব্যাগ সব ভিজে একশা।

— "সুমন বেরোতেই হবে, তাঁবুর মাথা থেকে বরফগুলো সরাতেই হবে," বিশুর গলা শোনা গেছে এইবার।

সুমন তাঁবুর ডোর ফ্ল্যাপ-এর জিপার খুলতেই হুড়মুড় করে ঢুকে পড়েছে একগাদা বরফকুঁচি, সঙ্গে জমিয়ে দেওয়া কনকনে ঠান্ডা হাওয়া। বাইরে বেশ কয়েক ইঞ্চি পুরু বরফ জমে গেছে যা তাঁবুর দরজার কিছুটা হলেও আটকে দিয়েছে। হেড টর্চ-টা দিয়ে সুমনকে আলো দেখাচ্ছিলাম। কিন্তু টর্চের আলোর বিম্ বাইরের নিঃশিছদ্র অন্ধকারে কিছুদূর গিয়েই হারিয়ে যাচ্ছে অসহায় ভাবে। আলো যেখানেই পড়ছে, সেখানেই স্তূপীকৃত বরফের শুভ্র সাম্রাজ্য। টর্চের

আলোর বৃত্ত জুড়ে অবিশ্রান্ত ঝরে পড়া বরফের ফুলকি। আমি জ্যাকেট হুডে মাথা ঢেকে শরীরটা তাঁবুর বাইরে অর্ধেক বার করে সুমনকে আলো দেখানোর বৃথা চেষ্টা করে চলেছি।

বাইরে রাখা আইস অ্যাক্সগুলো হাতে নেওয়া যে কি যন্ত্রণার সামিল তা সুমনই বুঝেছে। ঠান্ডায় অ্যাক্সগুলো এতটাই হিমশীতল যে 'মেটাল বাইট' হবার যোগাড়। কিন্তু বাধ্য হয়েই অ্যাক্স দিয়েই তাঁবুর বরফ ঝাড়তে হয়েছে। বিশুও হাত লাগিয়েছে সুমনের একার পক্ষে সম্ভব হয়নি ওই স্তূপীকৃত বরফ সরানো।

আচমকা আকাশের গায়ে ফ্ল্যাশের ঝলকানি। প্রচণ্ড জোরে আবার বাজ পড়েছে। মুহূর্তের জন্য দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে গেছে চারদিক। বাইরে সীমাহীন শুভ্রবসনার এক অনন্ত বিশালত্ব। বিজলীদীর্ণ মায়াবী আকাশের স্বপ্ন বুকে নিয়ে ঝড়ে পড়েছে কোটি কোটি তুষারকণার সাদা শিউলি। বীভৎস এক অশরীরি সৌন্দর্যের মুগ্ধতা ক্রমশ ঠেকেছে বাকরোধকারী বিস্ময়ে। তিনজনেই আর দেরি করিনি, তাড়াতাড়ি ঢুকে এসেছি তাঁবুর ভেতরে। সবার জ্যাকেট আর উইন্ডচিটার ভরে গেছে পেলব তুষারের নরম পালকে। কিন্তু এইটুকু সময়েই তাঁবুর ভেতরের অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে। বেশ কিছু তুষার নতুন অতিথি হয়ে ঢুকেছে আর হিমেল হাওয়ার নির্মম চাবুক তাঁবুর পরিবেশ করেছে আরও হিমশীতল।

সুমন স্লিপিং ব্যাগে হাত ঢুকিয়ে সমানে হাত ঘষে চলেছে। ছেলেটার কষ্টটা বুঝতে পারছি। প্রচণ্ড ঠান্ডায় হাতের আঙুলগুলোয় রক্তসঞ্চালন কমে যাবার কারণে শুরু হওয়া যন্ত্রণা ওর বিড়ম্বনা আরও বাড়িয়েছে।

পরিস্থিতির চাপ কাটাতে বিশু ধূমপানের একটা চেষ্টা করেছে। সেখানেও বিধি বাম। ঠান্ডায় লাইটার-ও মুড়ির মতো মিইয়ে গেছে।

এত কাণ্ডের পর একজন কিন্তু অদ্ভুতভাবে নির্বিকার — মলয়দা। দাদার যে-কোন রাশি আর কোন লগ্নে জন্ম হয়েছিল, জানতে বড়ো ইচ্ছে হয়। চারদিক জুড়ে পৃথিবী উথাল পাথাল হয়ে যাচ্ছে, তাঁবুর বেহাল অবস্থা ঠিক করতে তিনটে মানুষ নাজেহাল, সেখানে একজন যে কী করে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারে তা মনোবিদের কাছে গবেষণার বিষয় হতেই পারে।

তাঁবুর দেয়ালগুলোতে পিঠ ঠেকিয়ে টেন্ট স্ট্রাকচারটা খাড়া রাখার একটা আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছি তিনজন। বাইরের বিধ্বংসী হাওয়া আর তুষার ক্ষুধার্ত

চিতার মতো পিঠে আঘাত হেনে গেছে বারংবার।

এসময়গুলোতে নিজের এবং আশেপাশের ওপর থেকে চাপটা সরানোর প্রয়াসেই, মানুষ বোধহয় নিজেকে ছাপিয়ে যাওয়ার একটা মরিয়া চেষ্টা করে। আমিও করেছি। দু-একটা মজার কথা বলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার একটা আনাড়ি প্রয়াস চালিয়েছি। বলা বাহুল্য আমার প্রেসক্রিপশন্ যাচ্ছেতাই ভাবে ফেল করেছে। বাকিরা যে তাতে বিন্দুমাত্র হালকা হয়নি, তাদের স্থানুবৎ নিরবতাই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

ফ্ল্যাশব্যাকে বিশ্বজিৎ হাজরা আর সুমন কুণ্ডু হয়তো ফিরে গেছে ধুমধার কান্দি এক্সপেডিশানের ওই আড়াই দিনের ধুন্ধুমার বিভীষিকায়। সেবার ভয়ংকর তুষারঝড়ে তাঁবুর তিন চতুর্থাংশ ঢেকে গিয়েছিল বরফে। জল, খাবার ছাড়া ভেঙে যাওয়া তাঁবুর মধ্যে আড়াই দিন কাটানো যে কতটা স্নায়ুর চাপের পরীক্ষা নেয় তা ওরা হাড়ে হাড়ে জানে। আবার ওই ষাট ঘণ্টার স্নায়ুযুদ্ধের পর এক অনুপম রোদেলা ভোরে যখন সূর্যের ঝকঝকে আলো পড়েছিল 'ইয়েলো টুথ' আর 'কালনাগ'-এর উদ্ধত মুকুটে, সে স্বপ্নিল মুহূর্তটা ওরা আজন্ম মনে রাখবে। নেহেরু ইনস্টিট্যিউট অব মাউন্টেনিয়ারিং (NIM)-এর প্রসপেক্টাস-এ তাই সঙ্গত কথাটাই লেখা আছে — "To those who struggle for it, mountain reveals its beauty" সত্যি, অপরিসীম শারিরীক ও মানসিক যন্ত্রণা এবং ধৈর্যের পরীক্ষা নেওয়ার পরই প্রকৃতি অকৃপণ হাতে খুলে দেয় তার মায়াময় সৌন্দর্যের সিংহদুয়ার। যার ওপারে থাকে শুধুই অসামান্য স্বর্গের এক অবিস্মরণীয় ছবি।

আগের থেকে কমেছে তুষারপাতের প্রাবল্য। সঙ্গে মরুতের মাতলামো। এতক্ষণ স্লিপিং ব্যাগে অর্ধেক শরীর ঢুকিয়ে তাঁবুর বরফ হয়ে যাওয়া দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বসে থাকার দরুণ শরীর অবশ হয়ে গেছে। পাহাড়ে শরীরকে গরম রাখার এক বিশেষ পদ্ধতি 'HELP' অর্থাৎ 'HEAT ESCAPE LESSENING POSTURE'. এই পদ্ধতিতে বসে থাকলে HYPOTH-ERMIA-তে বেঁচে যাবার সম্ভাবনা ৪৫ শতাংশ বেড়ে যায়। ভঙ্গিটা অনেকটা মায়ের উম্ব-এ ফিটাস্ (FOETUS) সাধারণত যেভাবে থাকে সেরকম। ওইভাবেই আমিও দু-হাতে হাঁটু জড়িয়ে মুখ গুঁজে বসে থেকেছি কিছুক্ষণ।

তিনটের দিকে স্নো ফলের দৌরাত্ম কমতে কমতে চারটের দিকে চারদিক

থমথমে হয়ে গেছে। ভিজে যাওয়া স্লিপিং ব্যাগ জড়িয়ে ভিজে ম্যাট্রেস-এর ওপরেই ক্লান্ত শরীরটা বিছিয়ে দিয়েছি কোনোরকমে। বিশু আর সুমন একটু আগেই যা হোক করে এলিয়ে দিয়েছে বিধ্বস্ত শরীরগুলো

সারারাত অনেক যন্ত্রণা দিয়েছে পাহাড়। এই 'আনহস্‌পিট্যাবল অলটিট্যিউড্‌-এ তাই একসময় মানসিক চাপ ছাড়িয়ে বড়ো হয়ে দাঁড়িয়েছে শারীরিক ক্লান্তি।

জনহীন, নিস্তব্ধ, হিমশীতল সাদা মরুভূমিতে নিজেরই অজান্তে চোখ লেগে গেছে এক অবোধ্য তন্দ্রায়।

"জিন্দেগী কী গর্ম্‌ রাতোঁ মে কিসে আতি থি নীদ
ইত্তেফাকন আপ্‌কী জুলফেঁ পরেশান হো গয়ী"

— অব্দুল হমীদ 'অদম'

"জীবনের এই দহনের রাতে ঘুম ছিল চোখে কা'র
সহসা প্রেয়সী এলালো তোমার ছায়াঘন কেশভার"

— ডঃ সুশান্ত ভট্টাচার্য

অষ্টম দিন
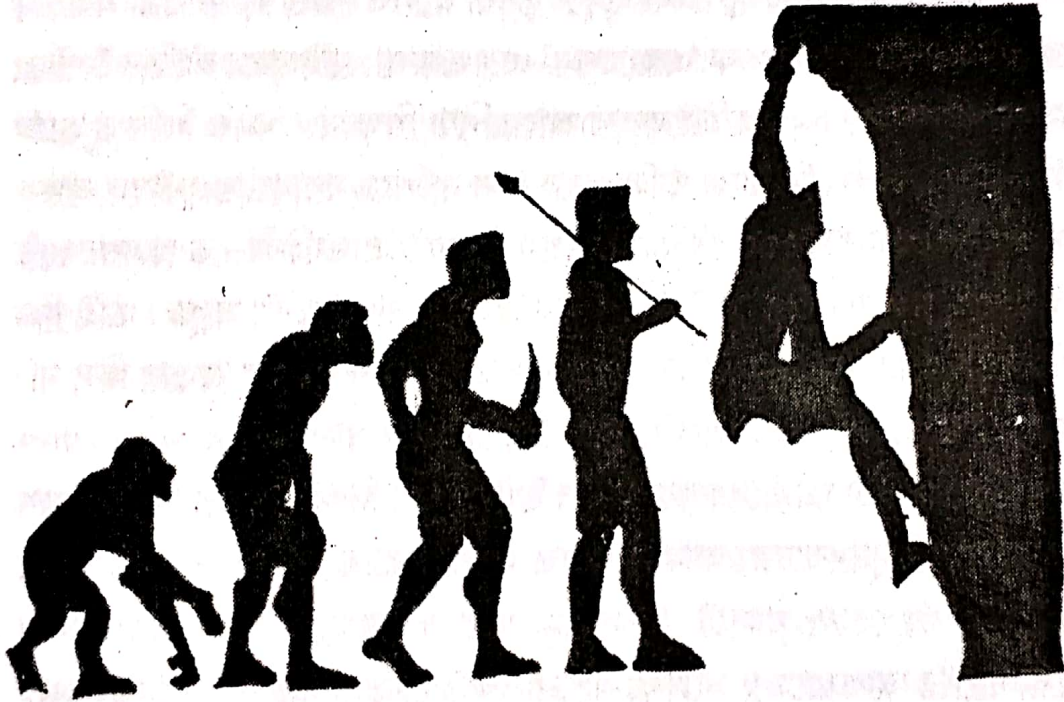
"পৃথিবীর সমস্ত রোদ্দুর,
তোমার সৌন্দর্যের রাস্তা জুড়ে"
— পল এলুয়ার

তখন স্কুলের শেষ ধাপ। একটু একটু করে 'বড়ো' হয়ে যাচ্ছি। বোঁচা নাকটার নীচে নরম কিন্তু কালো রেখাটা ক্রমশ লায়েক হবার পথে 'বসন্ত এসে

গেছে'-র গ্রিন সিগন্যাল দিচ্ছে। জুলফির নীচ থেকে থুতনি অবধি কাশ ফুলের মতো পেলব কচি দাড়িগুলো, মাথাভরতি উশকোখুশকো চুলের সঙ্গে দিব্যি একটা স্বযত্নে লালিত 'ডোন্ট কেয়ার' লুক আনছে। আমাদের এঁদো বরানগর-ও সময়ের চাহিদা মেনে শহর হবার 'কসমেটিক্স' মাখছে। রিঙ্কুদের বাড়ির পিছনের পুকুরটা হঠাৎ একদিন মাঠ হয়ে গেল। তার পরের গ্রীষ্মেই সেখানে অনন্যা অ্যাপার্টমেন্ট। যদিও তখনও একে অন্যের খবর নেয়। পাড়ায় বড়োদের সামনে ছোটোরা ভালোমানুষ সাজার একটা আন্তরিক চেষ্টা করে। তখনও 'মল্' কালচার সমাজ জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে ওঠেনি। মধ্যবিত্ত 'রক্' কালচারেই আমেরিকা কাঁপাচ্ছে, গাভাসকার-এর ভুল ধরছে, মোহন-ইষ্ট নিয়ে চুলোচুলি থেকে ধনতন্ত্র সমাজতন্ত্রের চুলচেরা বিশ্লেষণ করছে। এককথায় 'রকবাজী' ব্যাপারটা একটু অন্য চোখে দেখা হলেও পাত্তা না পাওয়া মধ্যবিত্ত বাঙালির কাছে এ ছিল এক 'এক্সপ্রেশন'-এর জায়গা। ড্রইংরুমে হুইস্কির টলটলে গ্লাস হাতে 'ইমপ্রেশান্' জাহির করার আরোপিত শিক্ষায় তখনও শিক্ষিত হয়নি অধিকাংশ বাঙালি। বিকেলে খালি পায়ে ঘাস দাপিয়ে ববাবরের ফুটবল অথবা সাবান কাচার চওড়া কাঠ হাঁকিয়ে গলির ক্রিকেট প্রাত্যহিকী-তে অবশ্যাম্ভাবী ছিল। মনোজগতের 'পিচ্' টাই যে ছিল ওই ঘাসের মতোই সবুজ। তাই দিন প্রতিদিনের রোজনামচায় 'বাউন্স'-এর ভ্যারিয়েশান-এ কোনো অভাব ছিল না। যদিও সূর্য ডোবার পালা এলেই বাড়ি ফেরাটা ছিল মাস্ট।

সন্ধেবেলাটা আমাদের কাছে বেশ ইন্টারেস্টিং ছিল। একে একে গৃহপ্রবেশ ঘটত হার্মাদ পিতৃদেবদের। আমরাও দ্রুত বর্ণপরিচয়ের "গোপাল অতি সুবোধ বালক" মার্কা ভোল পালটে ফেলতাম অক্লেশে। আশেপাশের বাড়িগুলোর থেকে শাঁখের আওয়াজের সঙ্গে এ বাড়ির কেউ চেঁচিয়ে তেরোর ঘরের নামতা মুখস্থ করছে তো ও বাড়ির কাবেরী পাড়া কাঁপাচ্ছে হারমোনিয়ামে 'এ কোন সকাল রাতের চেয়েও অন্ধকার'-এ।

রুটিন মেনে আমিও পড়তে বসতাম। শিয়রে সমন মাধ্যমিক। সামনে বই খোলা না থাকলে পিতৃদেব গায়ের মাংস থেকে হাড়গুলো খুলে নেবে এই ভয়ে। তবে সেখানেও বিপত্তি। দুদিনের জন্য একজন ললনা আমার থেকে টেস্ট পেপারটা নিয়েছিল। যখন ফেরত এল তখন ফাউ হিসাবে ভেতরে স্বযত্নে রক্ষিত লম্বা ফুলস্কেপ রুলটানা পাতায় ঝাড়া দু-পাতা প্রেমের চিঠি। চিঠির

গায়ে আবার 'ওলি সেন্টের' হালকা স্পর্শ। চোখের সামনে ফিজিক্যাল সায়েন্স-এর ম্যাগনেট চ্যাপ্টারটা খোলা। কিন্তু মন হারিয়েছে চিঠির চুম্বকে।

আসলে বয়সটা তখন এমনই ছিল যে সারাবছরই বসন্ত। কথায় কথায় 'প্রেম পেত'। অনেকটা ওই খিদে পাওয়া, পটি পাওয়ার মতই অনিবার্য। 'নার্সিসাস' অর্থাৎ আত্মপ্রেমী ছিলাম কিনা জানি না তবে জীবনটা প্রেম, কবিতা, আবেগ, বন্ধুত্ব সব মিলিয়ে এক কথায় 'দ্যাট ওয়াজ দি টাইম টু রিয়েলি টাচ্ দি হার্ট'। এরপর সময়ের নিয়মে টাইম মেসিনে জীবনের স্থান, কাল, পাত্র অনেককিছুই বদলেছে। বিকেলে হৈমন্তী-দের ছাদে ছয় মেরে বল পাঠানোর প্রাণপণ প্রতিযোগিতাও হারিয়ে গেছে, হৈমন্তীদের নর্থ থেকে সাউথে হারিয়ে যাওয়ার মতোই। প্রেম, কবিতা, আবেগ, বন্ধুত্ব শীতের ঝরা পাতার মতোই নিঃশব্দে ঝরে গেছে। ঝরে পড়ার অনুভূতিটুকুও নিম্ন মধ্যবিত্ত ফ্যামিলির আর্থিক এবং অন্যান্য গতানুগতিক রুক্ষতায়, মনকেমনের জানলায় বসে সেভাবে ভাবার সময়টুকুও পায়নি। হঠাৎ করেই একদিন দেখেছি আমি অনেক 'বড়ো' হয়ে গেছি। সেই হাফপ্যান্টের ঝলমলে মুখগুলো বড়ো দূরের হয়ে গেছে। এখন তো হোয়াটস অ্যাপ্ বা ফেসবুকে প্রশ্ন করলে বন্ধুরা স্মাইলি পাঠায়, উত্তর আসে না। আমরা 'ফ্রেন্ডশিপ ডে'-র অপেক্ষায় থাকি।

এভাবেই সুনীল গাঙ্গুলীর উপন্যাসের "একা এবং কয়েকজন" হয়েই থাকার অভ্যাসটা ক্রমশঃ আয়ত্ব হয়ে উঠেছিল। পল এল্যুয়ের-এর কবিতার ওই 'রোদ্দুর' ক্রমশ 'সৌন্দর্য'-এর রাস্তাটা ছেড়ে চলে গিয়েছিল অজানা ঠিকানায়।

দার্শনিক প্লেটো'র একটা কোটেশন পড়েছিলাম। বক্তব্যটা ছিল এরকম — "আমাদের মধ্যে অধিকাংশ মানুষ শুধু নিজ সমুদ্রসম অজ্ঞানতা নিয়ে ঘোর সন্তুষ্টই নন, অন্য কেউ সেদিকে দিক নির্দেশ করলে আবার গভীর বিরক্তও হন ...।" তখন আত্মীয়স্বজন, টিচার, পাড়াপ্রতিবেশী এমনকি বাড়ির লোকের মধ্যেও এরকম বায়াসড্ প্রেসেন্স কম ছিল না। রাজনীতি, খেলাধুলো, সাহিত্য যেকোনো বিষয়েই মুক্তমনে কথা বলার উপযুক্ত মঞ্চের ছিল বড়োই অভাব। বিপক্ষকে দাবড়ে দেয়ালে ঘুঁটের মতো লেবড়ে দেবার এক অস্বাস্থ্যকর গর্জেনশিপ তখন ক্রমশ মাথাচাড়া দিচ্ছে। সভ্যতা, ভদ্রতার ব্যারিকেডে নিজেকে প্রায়শই আটকে রাখলেও কম বয়সের চাপা জেদটাও যে বড়ো নাছোড় ছিল। তাই বড়োদের মধ্যে আমার পরিচয় ছিল 'বেয়াড়া'।

এভাবেই আমার চেনা শহর, চেনা পাকস্থলী একসময় বড়ো অচেনা লেগেছে। কবীর সুমনের গান নিয়ে নানা বয়সের মানুষের প্রচুর লাফালাফি, জ্ঞানগর্ভ বিশ্লেষণ অথচ তাদের বাস্তব জীবনে ইমপ্লিমেন্টশনের অঙ্কে নিট রেজাল্ট শূন্য। আমার পিতৃদেব যথেষ্ট সংসারমুখী ছিলেন। মা বা আমাকে ভালোবাসায় ঘাটতি ছিল না। কিন্তু সমস্ত ভালোবাসাটাই 'মুসলমানের মুরগি পোষা'র মতো হয়ে যেত যখন একটা বয়সের পরও মায়ের গায়ে হাত তুলতে দেখেছি। এভাবেই 'এরকম তো হয়েই থাকে' অথচ 'আমি মেনে নিতে পারছি না'-র সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে ছিল আমার কৈশোর ও যৌবন।

চারপাশের আপাত সাবলীল, আপাত নিশ্চিন্তে বয়ে যাওয়া সময়টায় যখন নিজেকে ক্রমশ বড়ো 'মিসফিট' লাগছে, সেই সময়েই একটা খনির সন্ধান পেয়েছিলাম — হিমালয়। যার কাছে দু-দণ্ড শান্তিতে বসে মনকেমনের কথাগুলো বলা যায় নিঃসঙ্কোচে। যার উত্তুঙ্গ শুভ্র মিনারের দিকে অপলক চেয়ে থাকলে সংশয়, সন্দেহ আর গড্ডালিকা প্রবাহের মধ্যে ভাসমান কলকাতা মুহূর্তে ভ্যানিস হয়ে যায়। যে পথে 'গ্লেসিয়াল টার্ন্'-এর বিশাল কলড্রন, খরস্রোতার মুখরতা, বিরাট ক্রিভাসের ভয় ধরানো সান্নিধ্য, আইস প্যাচের পিচ্ছিল আপত্তি, প্রপাতের হার্দিক আতিথ্য আর বরফ দেয়ালের নির্মম বাধাকে অতিক্রম করে রিজ ধরে শীর্ষ ছোঁয়ার ঐকান্তিক নির্ভেজাল অনুভূতি, স্বচ্ছন্দে ফিরিয়ে দেয় বেঁচে থাকার 'কনফিডেন্স', হারিয়ে যাওয়া প্রকৃত 'স্বাধীনতা'।

ভূ-বিজ্ঞানীদের মতে টেথিস নামের বর্তমানে বিলুপ্ত যে সমুদ্র থেকে হিমালয় ধীরে ধীরে উত্থিত হয়েছে সেই সমুদ্রের বয়স পঞ্চাশ কোটি বছরেরও বেশি। ছ-কোটি বছর আগে 'ইওসিন' যুগ থেকে উত্থানের সূত্রপাত হয়।

মূল হিমালয়, মানে তুষারমণ্ডিত শৃঙ্গগুলোর জন্ম এই সময়ে।

মধ্য হিমালয়ের জন্মকাল দু-কোটি বছর আগে 'মায়োসিন যুগ থেকে এক কোটি কুড়ি লক্ষ বছর আগে 'প্লায়োসিন' যুগ পর্যন্ত।

আর বহিঃহিমালয় মানে শিবালিক পর্বতের জন্ম একেবারে আধুনিক কালে অর্থাৎ এক কোটি দশ লক্ষ বছর আগে। যে নদীগুলো টেথিস সমুদ্রে এসে পড়েছিল তাদের জলের পলিমাটি থেকে শিবালিকের জন্ম।

হিমালয়ের জন্ম যে সমুদ্রের গর্ভ থেকে তার অকাট্য প্রমাণ, মূল ও মধ্য হিমালয়ের শিলাসমষ্টির গঠন ও প্রকৃতিই নাকি একটি বিলুপ্ত সমুদ্রের অস্তিত্ব

প্রমাণ করছে।

শঙ্করাচার্য বলেছিলেন, "এক কোটি বইয়ে যা লেখা আছে তা আমি একখানা শ্লোকে বলব। ব্রহ্ম সত্যং, জগন্মিথ্যা, জীবা ব্রহ্মৈব নাপরঃ।" অর্থাৎ ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। জীব আর ব্রহ্ম অভিন্ন। তপস্যায় হোক, ধ্যানে হোক বা সাধনায় হোক মহামানবেরা শুধু এই সত্য হৃদয়ঙ্গম করেন। আর পণ্ডিতেরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করেন এর অর্থ নিয়ে।

শঙ্খদা, বিশু, সুমন বা আমরা মহামানব-ও নই আবার এক কোটি বই পড়ে পণ্ডিতও হইনি। তবু পাহাড়কে নির্ভেজাল ভালোবেসে পেয়েছি বেঁচে থাকার অন্য মানে, হারিয়ে যাওয়া অমূল্য শান্তি আর বেলাশেষে বাগে আনতে পেরেছি বেঁচে থাকার পথে বেপথু ঢেউগুলো। মর্মে মর্মে উপলব্ধী করেছি Reinhold Messner-এর কথাগুলো, "Climbing for me is more than a sport. Climbing is all about freedom, the freedom to go beyond all the rules and take a chance, to experience something new, to gain insight into human nature".

আজ ১৮ জুন, সোমবার।

সারারাত মরুত আর তুষারের ভয়ধরানো যুগলবন্দীর পর ভোরবেলা আকাশ আর প্রকৃতির সে কী কোলাকুলি! আহা পরস্পরের কী বিগলিত আত্মনিবেদন! গতরাতের দ্বৈরথ আজ 'হিন্দি-চিনি ভাই ভাই' পর্যায়ে। পল এল্যুয়ার-এর কবিতার সমস্ত 'রোদ্দুর' যেন জড় হয়েছে আপার পানপাতিয়া আইসফিল্ডের আদিগন্ত তুহিন প্রেক্ষাপটে। ফাইনাল অ্যাসেন্টের দিনে এরকম 'রোদেলা বেলা কবিতা খেলা'-র মতো মায়াময় নরম সকালটা বড্ড দরকার ছিল। তাঁবুর ইনার ফ্যাব্রিকে বরফের 'কাস্ট' এখনও জায়গায় জায়গায় জমে আছে গতরাতের তাণ্ডবের সাক্ষী হয়ে।

এতক্ষণ তাঁবুর খোলা দরজা দিয়ে তাকিয়ে ছিলাম বাইরে। স্লিপিং ব্যাগটা রীতিমতো ভিজে আছে। ক্যামেরার ব্যাগ-ও তথইবচ। যদিও কাল রাতে ক্যামেরাটা মোটা করে টিস্যু পেপার দিয়ে জড়িয়ে, স্যাকের উপর উইন্ডচিটার দিয়ে ঢেকে রেখেছিলাম। ব্যাটারি ছিল জ্যাকেটের পকেটে। তবু মনটা খুঁতখুঁত করছেই। বাইরে বেরিয়েছি স্লিপিং ব্যাগ আর ক্যামেরাটা রোদে দেব বলে।

বাইরের প্রকৃতি আপনা থেকেই মন ভালো করে। মুহূর্তে মুছে দেয়

গতরাতের টেনশনের গুমোট আবহাওয়া। তাকিয়ে ছিলাম পানপাতিয়া কলের দিকে। এখান থেকে দেখা না গেলেও অভীষ্ট গন্তব্যটা বোঝা যাচ্ছে। অদ্ভুত এক আবেগ ঘিরে রেখেছে আমায়। আর কয়েকঘণ্টা পরেই কৌশেয় তুষারদীর্ণ ক্রিভাস এড়িয়ে পৌঁছে যাব সেই অভিষ্ট মোক্ষে। যার ইতিহাসের হলুদ পাতায় ধরা আছে একশোটা বছরের ব্যর্থতা, যন্ত্রণা, হতাশা আর মৃত্যুর এক উপন্যাসসম ললাটলিপি।

— "ডাক্তার, একবার পিছনে তাকাও" সলিলদার চনমনে গলা। তাকিয়েছি। বলা ভালো রীতিমতো চমকেছি। পথের পাঁচালীর অপুর মতো বয়স বা মনন আমার নয় যে কাশ বনের ভেতর দিয়ে দৌড়তে দৌড়তে স্টিম ইঞ্জিনের ধোঁয়া ওঠা ট্রেন দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাব। অভিজ্ঞতায় পাকা বাঁশ না হই, পাকা ট্যাড়স তো বটে। তবু পিছন ফিরে একটা 'গ্লিম্পস্'-ই যথেষ্ট ছিল স্নায়ুতন্ত্রকে একটা সপাট ঝাঁকুনি দেওয়ার জন্য। ডায়াগোনালি পিচ করা আমাদের চারটে টেন্টের সোজাসুজি উটের কুঁজের মতো একটা হাম্প পেরিয়ে, কয়েকটা ছোটো ছোটো সামুদ্রিক ঢেউ-এর মতো মসৃণ তুষারের আর্কিটেকচারের পরেই মাথা তুলে সগর্বে উদ্ধত, যুগান্তরের ধ্যানমৌন মাউন্ট চৌখাম্বার বিশাল ম্যাসিফ। নীল শুধু অনাবিল নীল এক আকাশের নীচে তুষারাবৃত গ্র্যানাইটের রাজকীয় উপস্থিতির আভিজাত্য মুহূর্তে তৈরি করেছে এক সিনেম্যাটিক ক্লাইম্যাক্স। গতকাল টেন্ট পিচ করার সময় আবহাওয়া এতটাই খারাপ ছিল যে চারপাশে কি আছে তা বোঝা যায়নি। আমরা যে প্রায় চৌখাম্বার দোরগোড়ায় রাত কাটিয়েছি তা এতক্ষণে মালুম হল।

কিছু মুহূর্ত ক্যামেরাবন্দী না-করলেও চলে। স্মৃতির দরবারে তারা পারমানেন্ট সভাসদ। ঠিক যেরকম জায়ান্ট চৌখাম্বার সামনে একটা ত্যারছা লাইনে পরপর সাজানো আমাদের চারটে টেন্ট-এর এক অনবদ্য কোলাজ। অভ্যাসবসে নেওয়া ছবিটা কলকাতায় ফিরে যখনই দেখেছি ক্যাপশান হিসাবে প্লুতার্ক এর বক্তব্যটাই প্রণিধানযোগ্য মনে হয়েছে — "Painting is a SILENT POETRY and poetry is PAINTING that speaks".

সুবিশাল চৌখাম্বা III থেকে একটা রিজ্ নেমে গেছে যার ওপরে রয়েছে শিপটন শৃঙ্গ। এই শিপটন শৃঙ্গ আর চৌখাম্বা III-এর কানেক্টিং রিজ-এর ওপরেই রয়েছে শিপটন কল। আর শিপটন শৃঙ্গ এবং রিখুগড় রিজ-এর সংযোগকারী

রিজ-এর পূর্বদিকের ঢালেই রয়েছে পানপাতিয়া হিমবাহের সুবিশাল বিস্তৃতি। এই জলবিভাজিকার একদিকে রয়েছে অনিন্দ্য অলকানন্দা ভ্যালি আর অন্যদিকেই মদমহেশ্বর ভ্যালি, আমাদের আগামী অ্যাপ্রোচ রুট।

পাহাড়ে ভূগোলের এসব জটিল গোলমাল অবশ্য শঙ্খদা বিশু বা আমার মাথায় থাকে না। এক্ষেত্রে সুমন-ই আমাদের টিচার। রুটের ভূগোল, ইতিহাস সবই রবিঠাকুরের 'তোতাকাহিনী'র ওই তোতার মতোই আমাদের গিলিয়ে দেয়। আমরাও মনোযোগী ছাত্রের মতোই তা শুনি আবার পরক্ষণেই বেমালুম ভুলে গিয়ে রেইনহোল্ড মেইসনার এর স্কুলিং-এ অভ্যস্ত হয়ে পড়ি "for me, imagination is more important in climbing than muscle or dare devil anties."

পাহাড়ে 'প্রাতঃকৃত্য পর্ব'-টা আমার কাছে বেশ হাঙ্গামার। প্রথমত 'ব্যক্তিগত আড়াল' খুঁজে নেওয়ার ঝক্কি। দ্বিতীয়ত ঠান্ডায় পোশাক খোলার যন্ত্রণা আর তৃতীয়ত জলের পরিবর্তে টয়লেট পেপার ব্যবহার করা। কিন্তু দুদিন প্রকৃতির ডাক সহ্য করার পর আজকে আড়াল খুঁজে নেওয়াটা অত্যন্ত জরুরি। না-হলে পানপাতিয়া কল ক্রশ করার আগেই আমাদের অভিযান 'হলুদের অভিযান' হয়ে যাবার সমূহ সম্ভাবনা। কিন্তু আড়াল পাওয়াটাই সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ধূ ধূ বরফের মরুভূমিতে বোল্ডারের আড়াল খোঁজার চেষ্টা বৃথা। চারদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে দেখার পর মেন আইসফলের দিক বরাবর একটা ছোটো হাম্পের দেখা মিলেছে। হাম্পটা পেরিয়ে যে জায়গাটা বেছে নিয়েছি তার সামনে একটু বাঁদিক ঘেঁষে পানপাতিয়া কলের লোভনীয় হাতছানি, ডানদিকে দুধসাদা চৌখাম্বার উদ্ধত মিনার, মাথার ওপর আশ্চর্য নীল আকাশের ক্যানভাসে সাদা মেঘের ফেদার টাচ আর পায়ের নীচে কুন্দশুভ্র তুষারের নরম আতিথ্য। এ ছাড়া ৩৬০ ডিগ্রি জুড়ে দুর্গের মতো সব অমলীন পাহাড়ের সতর্ক নজরদারি। এককথায় লাক্সারির 'অপটিমাম্ হাইট'। জল বাদ দিয়ে টয়লেট পেপার ইউজ করার ঘিনঘিনে অস্বস্তিটুকু বাদ দিলে আর ঠান্ডায় পশ্চাদদেশের 'পার্শিয়াল প্যারালাইসিস'-এর যন্ত্রণাময় 'অ্যানালাইসিস'টুকু ভুলে গেলে নিঃসন্দেহে মেগাহিট আমার আজকের 'রাজকীয় পটিকেন্দ্র'।

তীব্বতীরা রসিকতা করে টয়লেট পেপারকে বলে 'হোয়াইট মেনস প্রেয়ার ফ্ল্যাগ'। তবে শ্রীনিমাই মুখোপাধ্যায়ের রসসিক্ত অনুবাদ 'হাগজ' আমার কাছে

আরও যুক্তিযুক্ত এবং ব্যঞ্জনাময়।

হাম্পটা পেরিয়ে আসতেই নজর গেছে কিচেন টেন্টের দিকে। সুরজ, দলবীর-রা আজ রুটি তৈরি করছে। ঠিক করে নিয়েছি রুটি খাব। আজ আমি ম্যাগি-তে নেই।

টেন্টসগুলো ডিসম্যান্টল করার কাজ প্রায় শেষ। আমার স্যাক গোছানোই আছে। শুধু মিটনজোড়া বেঁধে নিয়েছি স্যাকে। কারোর একটা ম্যাট্রেস বাইরে রোদে দেওয়া ছিল। তার ওপর বসে গ্যেইটারগুলোও পায়ের সঙ্গে এঁটে নেওয়ার কাজ শেষ। এবার আমি রেডি। মাথার পিছনে হাত দিয়ে আমেজে পিঠ ঠেকিয়েছি নীল স্লিপিং ম্যাট্রেসে। চোখের সোজাসুজি আসমানি সামিয়ানা জুড়ে অলস ঔদাসিন্যে উড়ে বেড়াচ্ছে একজোড়া গ্রিফন ভালচার। ওদের আলস্য একসময় আমাকেও ঘিরে ধরেছে। সানগ্লাসে চোখ ঢেকে পাতাদুটো এক করেছি খুচরো আরামের লোভে।

পাহাড়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, অধিবাসী, ফ্লোরা, ফনা ইত্যাদির সঙ্গে পাখপাখালির ফিজিওলজি এবং সাইকোলজি-ও কিন্তু রীতিমতো আকর্ষণীয় সাবজেক্ট। যেমন, এই গ্রিফন ভালচার। এদের গলার কাছটা সাদা এবং হলুদ মেশানো। সাইজে ৯৩-১২২ সেমি.। কিন্তু ডানা দুটো প্রকাণ্ড। এক একটারই মাপ ৭.৫ ফুট থেকে ৯.২ ফুট। পুরুষ পাখিদের ওজন ৬.২ কেজি. থেকে ১০.৫ কেজি.। স্ত্রী পাখিদের ওজন সাধারণত একটু বেশি হয়, ৬.৫ কেজি. থেকে ১১.৩ কেজি.। বাইনোমিয়াল নেম Gyps Fulvus.

সান্দাকফু রুটে গৌথালি পাখির কথা জানি। গাইড অর্জুন দেখিয়েছিল। খুব সুন্দর দেখতে ওরা। বাদামি রং, নীল পুঁথির মতো চোখ, নাকটা সামান্য ভোঁতা। গৌথালি পাখির মৃত্যু নিয়ে একটা মিথ্ আছে। স্থানীয় লোকেরা বলে এই পাখি নাকি বুঝতে পারে কবে মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে। তখন এরা বেনারসে উড়ে চলে যায়। মারা যায় সেখানে গিয়ে। ব্যাপারটা বেশ আশ্চর্যের।

আর এক ধরনের পাখি পাহাড়ের পথে প্রায়শই দেখা যায় — স্প্যারো হক্। স্থানীয়দের কাছে এরা 'শিক্রা' নামে পরিচিত। মঙ্গল সিং-এর বক্তব্যে তার সমর্থনও ছিল, "হামলোগোনে ইস পঞ্চীকো শিকরা নাম পে বুলাতা।" সাইজে পাখিগুলো ছোটো হয়। মোটামুটি ২৬ থেকে ৩০ সেন্টিমিটার। ডানাগুলো খাটো এবং গোলাকার। সাধারণত সাদা ধূসরে মেশানো গায়ের রং। সরু কিন্তু

লম্বা লেজওয়ালা পাখিটার তলপেটের দিকে পালক কম থাকে। এরা উড়ে বেড়ায় এক ধরনের কিক্-কি ... ... কিক্-কি ডাক ছাড়তে ছাড়তে। বাইনোমিয়াল নেম Accipiter Badius.

তবে পাহাড়ের পথে পক্ষীকুলের মধ্যে সবচেয়ে চমকদার উপস্থিতি বোধ হয় বার হেডেড গুজ্-এর। ইন্টারনেটে ট্যামেরা জোনস-এর একটা লেখা পড়েছিলাম। ওনার বক্তব্য "The Bar-headed goose is one impressive creature, it migrates over the immense himalayan mountain range, twice a year, holding the record for the world's highest flying bird. Now the latest researcher has revealed that the birds reach the height of Mount Everest, from sea level in just eight hours."

ওয়েলস এর বানগর ইউনিভার্সিটির ডঃ লুসি হকস্-এর বক্তব্য, " Our Bar-headed goose only stopped to apparently avoid stormy & gusty weather conditions during the day and flew at incredible rates of climb"

হকস্ এবং তাঁর কলিগেরা দেখে আশ্চর্য হয়েছেন যে এই প্রজাতির পাখিদের প্রেফারেন্স থাকে ভোরবেলার দিকে আকাশে ওড়ার কারণ তখন বাতাসের বেগ অপেক্ষাকৃত কম থাকে। বসন্ত এবং শরতের মৃদুমন্দ শান্ত আবহাওয়ায় এরা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় মাইগ্রেট করে।

হক্স আরও বলেছেন, "We found that as well as selling out early in the morning, the birds cross the mountains during the times of year when there's a weather window - the same time that people climb Mount Everest."

লক্ষ্যণীয় এদের পেশীর গঠনতন্ত্র। এমনই যে অন্যান্য পাখিদের তুলনায় পেশী বেশি মাত্রায় অক্সিজেন ব্যবহার করতে পারে। অন্যান্য প্রজাতির গুজ, সোয়ান এবং ডাক্-এর থেকে ফুসফুসের আয়তন-ও বড়ো।

সি লেভেল থেকে এভারেস্টের মাথায়, অ্যাক্লেমাটাইজ করার সুযোগ না দিয়ে কাউকে সোজা তুলে দিলে সে মিনিট খানেকের মধ্যে জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে। এখানে কেরোসিন জ্বলে না, হেলিকপ্টার ওড়ে না। সেখানে এই বার হেডেড গুজরা স্বচ্ছন্দে এভারেস্টের ওপর দিয়ে তিব্বতের দিকে চলে যায়

তাদের আস্তানার খোঁজে। এদের ডানাগুলো বিরাট বড়ো এবং সারফেস এরিয়াও অনেকটা।

এদের রক্তে এক বিশেষ ধরনের হিমোগ্লোবিন দেখা যায় যা খুব তাড়াতাড়ি অক্সিজেন অ্যাবসর্ব করতে পারে। ফলত অন্যান্য পাখিদের তুলনায় প্রত্যেক প্রশ্বাসে এরা বাতাস থেকে বেশি অক্সিজেন নেওয়ারও ক্ষমতা রাখে।

ট্যামেরা জোন্‌স আর একটা আশ্চর্য কথা শুনিয়েছেন। ওনার জবানীতে, "Birds can also pant for prolonged periods with constricting the blood vessels in their brains. So, even when physically taxed, they keep their wits about them. By contrast prolonged panting in people reduces blood flow to the brain, which primes them for bad decision making hence the occational unfortunate climber who blithely strolls off a cliff".

অভিযাত্রী লরেন্স সোয়ান ভাগ্যবান। স্যার এডমন্ড হিলারীর সঙ্গে হিমালয়ের গহীনে এক এক্সপেডিশান-এ এই পাখির দেখা পেয়েছিলেন।

— "রাত মে নিদ নেহি আয়া কেয়া দাদা?" সামনে ব্রেকফাস্টের থালি হাতে হাস্যময় মহাবীর।

— "তৈয়ার হোনে কে বাদ সোচা, থোড়া আরাম কর লু" থালি হাতবদল করে আমার সহাস্য জবাব।

ঘুমের ব্যাপারে আমি আবার 'রাজার ব্যাটা'। নিজের প্লাই পাতা কাষ্ঠং কাষ্ঠ বিছানাটা ছাড়া ইহজগতে কোথাও আমার ভালো ঘুম হয় না। তা ছাড়া বছর দুয়েক যাবৎ ইনসোমনিয়ার কারণে অ্যালজোলাম পয়েন্ট টু ফাইভ আমার প্রতিরাতের একমাত্র বেড পার্টনার। পাহাড়ে আমার মেডিক্যাল কিট-এ ঘুমের ওষুধ থাকে না, 'সাইকোমোটর ব্যালেন্স' নষ্ট হবার ভয়ে। সারাদিনের পরিশ্রমে একটা হালকা তন্দ্রায় কেটে যায় পাহাড়ি রাতগুলো।

প্রত্যেকদিন রুটে নামার আগে মঙ্গল সিং-এর একটা নিজস্ব 'পোজ' আছে। ডানহাতে আইস অ্যাক্স-টা নিয়ে, ঈষৎ হাঁটু ভেঙে বাড়িয়ে রাখা ডান পায়ের ওপর ভর দেয়। আর বাঁ হাতটা থাকে কোমরে। কয়েকদিন ফলো করে বুঝেছি এর কিছুক্ষণ বাদেই মঙ্গল 'স্টার্ট' করবে। আজও করেছে।

সকাল থেকেই হালকা কুয়াশা আর কাঁচা রোদের মান অভিমানের পালা

চলছে। দুজনেই উপস্থিত যে যার মতো করে। আটটার দিকে আমাদের অস্থায়ী সংসার গুছিয়ে শুরু হল অষ্টম দিনের এক্সপেডিশান।

ক্যারাবিনারে 'ফিগার অব এইট' নট-এ রোপ লাগিয়ে রোপ আপ-এ সারিবদ্ধ গোটা টিম। প্রথমে পশ্চিমমুখী শিপটন শৃঙ্গের দিকে খানিকটা এগিয়ে পরে আবার দক্ষিণদিকে মোড় নিয়েছি। রোপে আমার সামনে সলিলদা আর শঙ্খদা পিছনে মলয়দা আর সুমন। তার পিছনে পোর্টারস সমেত বাকিরা। ইনক্লাইনেশান যে এখানে খুব বেশি তেমন নয়। মোটের ওপর সমতল-ই বলা চলে।

শঙ্খদা দাঁড়িয়েছে। বাধ্য হয়ে আমিও। পিছন ফিরে তাকিয়েছি চৌখাম্বার দিকে। উত্তরীয়ের মতো একটা সাদা মেঘের ফিতে জড়িয়ে আছে গোটা ম্যাসিফটার মাঝ বরাবর। বহুকাল ধরে দাঁড়িয়ে থাকা তুষারাবৃত এক দৈত্যাকার গ্র্যানাইট যেন নিঃশব্দে জরিপ করছে আমাদের। গোটা একটা রাতের নিবিড় আলাপচারিতার পর আবার সে নিঃসঙ্গ। একাকীত্বই যেন তার বিধিলিপি। তার ললাটলিখন যেন স্পষ্ট —

"দুদণ্ড দুজনে ছিলাম সঙ্গী
ভেবেছি এ প্রেম হাজার বছর থাকবে।"

চারদিক জুড়ে ছড়িয়ে আছে নিস্তব্ধ এক তুষার মরুভূমি। হাওয়াদের এলোপাথাড়ি ফিশফাশ স্বত্ত্বেও সে নিস্তব্ধতা কখনও মুখর হয়নি। সমস্ত পরিস্থিতিটা যেন সেই সন্ন্যাসীর মতো বলে চলেছে, "আগে বাঢ়, মিল যায়েগা।"

শঙ্খদা এগিয়েছে। এগিয়েছি আমিও। সামনে সেই অনন্তের হাতছানি।

সামনের অঞ্চলটা ক্রিভাস আকীর্ণ। কয়েকটা ছোটোখাটো ক্রিভাসের মধ্যে সামনে বড়ো পাথরের নীচে হাঁ করা খোলা মুখটা দেখার মতো। ক্রমশ নীচের দিকে সরু হয়ে যাওয়া ফাটলটার নীলচে জমাট বরফ থেকে যেন নীলাভ আলোর সতৃষ্ণ চাহনি। ডিট্যুর করে আরও এগিয়েছি সামনে।

সাড়ে আঠারো হাজার ফুটের লঘু ঘনত্বের অক্সিজেন আর চড়াই-এর মাহাত্ম্য দমে টান ফেলেছে। বয়সটাও বাড়ছে বুঝতে পারছি। মঙ্গল সিং ক্রমাগত সতর্ক করেছে ফুট স্টেপ ছেড়ে না বেরোতে।

পোর্টার মদনের অবস্থা খুব একটা সুখকর নয়। লোকটার বয়স হয়েছে। প্রায় পঞ্চাশ মতো হবে। যদিও এই বয়সের একটা পাহাড়ি লোক যথেষ্ট কর্মক্ষম

থাকে কিন্তু ও বেসিক্যালি দুর্বল। প্রথম থেকেই মঙ্গলের সঙ্গে পিঠে মালের ওজন নিয়ে ঝামেলা হয়েছে। আজ আবার সকাল থেকেই গায়ে হাত পায়ে ব্যথা আর জ্বর জ্বর ভাব। ফলে দলে সবার চেয়ে অনেকটাই পিছিয়ে। মহাবীরকে একটা প্যারাসিটামল দিয়েছি ও এলে দেবার জন্য।

মঙ্গল এখন যে জায়গাটায় এসে থেমেছে, জায়গাটা অনেকটা থ্রি-পয়েন্ট-এর মতো। সোজাসুজি এগিয়ে গেলে পানপাতিয়া কল, বাঁ দিকের তুষারপ্রান্তর ফুটিফাটা ক্রিভাসদীর্ণ অঞ্চলটা পেরিয়ে ছুঁয়েছে মেন আইসফল আর ডানদিকে যে তুষারগালি নেমে গেছে, সেটা দিয়ে নেমে গেলে অনেক নীচে পাওয়া যাবে বাঁশের জঙ্গলের সেই গোন্ধারপঙ্গী উপত্যকা। যদিও সে উপত্যকা আমাদের চোখের আড়ালে তবু অতীতের ইতিহাসটা আমাদের চোখের সামনে। ১৯৩৪ সালে এরিক শিপটন অর বিল টিলম্যান চৌখাম্বা III-এর দক্ষিশপূর্ব গিরিশিরার ওপর একটা গিরিপথ ক্রশ করে বিপদজনক পথে নেমে যান অপরপারের এই গোন্ধারপঙ্গী উপত্যকায়। পুরো টিম এখানেই কিছুক্ষণ রেস্ট নিয়েছি। আমি ডানদিকে মুখ করে, মেন আইসফলের দিকে পিঠ রেখে বসেছি। সামনে 'ওলটানো গোলপোস্ট'-এর আকৃতির ওই গালিপথ ছোঁয়া আকাশে সাদা মেঘরাজি কিন্তু ক্রমশ বিষণ্ণ হয়ে উঠেছে। রোদেলা আকাশের বৈঠকী আড্ডার মুডটা এখন প্রায় নেই বললেই চলে। হু হু করে বয়ে আসা হিমেল বাতাসে ইতিহাসের গা শিরশিরে নস্টালজিয়া। সামনের গালিপথ ছুঁয়ে গোন্ধারপঙ্গী উপত্যকায় নেমে যাবার ওই 'জোন'-টা আমাকে এক না বোঝাতে পারা অসহ্য আকর্ষণে টানছে। ইতিহাসের মধ্যে কোথাও 'রহস্যময়তা' আর 'শূন্যতা'-র একটা ব্লেন্ডিং থাকে। সেই রহস্যভরা শূন্যতাই কি তবে ঘিরে ধরেছে আমায়! এই থম মেরে যাওয়া 'আমি'-টা এখন আমার নিজের কাছেই অচেনা।

— "ডাক্তার দুটো খেজুর খাও," পরিবেশকের ভূমিকায় শঙ্খদা।

শঙ্খদার ডাক আমায় বর্তমানে ফিরিয়েছে। একটা ছোটো পরিসরে ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত দাঁড়িয়ে বসে রয়েছে আমাদের গোটা টিম। চারদিক জুড়ে পাহাড়ের অনন্ত যৌবন, যার কোনো জরা নেই। আর পিছনে পড়ে থাকা উঁচু নীচু তুষার পথে সাপের মতো এঁকেবেঁকে শুয়ে আছে, আমাদের ফেলে আসা পথের বিচ্ছেদী পদচিহ্ন। কয়েকমাস ধরে জমে থাকা উৎসাহ, উদ্দীপনা, আশা আকাঙ্ক্ষার এক জমাট ককটেল আজ ঠোঁট ছোঁয়া দূরত্বে। তবু ওই ফেলে

আসা পথ ভুলি কি করে? বদ্রীনাথ থেকে এই অবধি, এক অসীম তুষারমৌলি পথের প্রত্যেক পদচিহ্নে মিশে রয়েছে আনন্দ, যন্ত্রণা, ঘাম, সহিষ্ণুতা আর বন্ধুতার এক স্পষ্ট স্বীকারোক্তি। অরণ্য, পাষাণ আর তুষারের রাজ্যে প্রতিটি অভিযানই সে অর্থে দেখতে গেলে এক একটা অনন্য উপন্যাস। নানারকম চরিত্রের ভিড়ে, নানা ঘটনার ঘনঘটায়, পাওয়া না পাওয়ার এক অনবদ্য মিশেলে এ এক অন্য জীবনের হাতছানি। জ্যাক রবার্সের কথামত, "Every moment is an experience." যেখানে হার জিত নয়, নিজেকে বারবার হারিয়ে বারবার খুঁজে পাওয়ার অনিবার্য চক্রাকার বিবর্তন-ই, ঘটমান চিত্রনাট্যের একমাত্র মশলা।

এখন আমরা যে জায়গাটা ধরে এগোচ্ছি সেটা প্রকৃতপক্ষে ডানদিকের ৫৫৫৩ মিটার উচ্চতার এক পর্বত শীর্ষ থেকে ৭০০-৮০০ ফুট নীচের একটা অংশ। যা বাঁদিকে ক্রমশ ঢালু হয়ে গড়িয়ে গেছে মেন আইসফলের দিকে। এগোচ্ছি না বলে ট্রাভার্স করছি বলাই যুক্তিযুক্ত। চড়াইটা এখানে আচমকাই খানিকটা বেড়ে গেছে। আমাদের ডানদিকে কোণাকুণি পানপাতিয়া কলের দিকেই মেঘের মেজাজটা বিগড়েছে বেশি। সেখান থেকেই দলাপাকানো কালচে মেঘ হামাগুড়ি দিয়ে ছেয়ে ফেলেছে গোটা অঞ্চলটা, নিঃশব্দে।

— "জলদি আও," মঙ্গল সঙ্গত কারণেই তাড়া দিয়েছে।

ঘড়ির কাঁটায় এখন দুপুর একটা পেরোনোর সদ্য সতর্কবার্তা।

চড়াইটা যেখানে আচমকাই শেষ হয়েছে, তার সামনে তুষারের মোটামুটি বিস্তীর্ণ অঞ্চলটা অনেকটা জলহীন সুইমিং পুল-এর মতো। ছড়ানো চারপাশ ক্রমশ অল্প নীচু হয়ে ওই আকার নিয়েছে। হাওয়ার কেরামতিতে সেখানে তুষারের বুকজুড়ে অজস্র দাগের অগভীর স্পর্শ। আর ডানদিকে পাহাড়ের গা ঘেঁষে উঁচুনীচু হয়ে চলে যাওয়া প্রায় দশ ফুটের এক পথ শেষ হয়েছে দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী এক 'গ্যাপ'-এ। ওই 'গ্যাপ'-ই আমাদের ইপ্সিত 'পানপাতিয়া কল'।

হঠাৎ নিজেকে অসম্ভব দামি মনে হয়েছে। সমতলে আমার অবস্থান তো আর গোলাপ, অ্যালীসাম বা ক্রিসেনথিমাম-এর মতো দামি নয়। নেহাতই পথের পাশে ফুটে থাকা নামগোত্রহীন বনফুল, আপামর জনসাধারণের যা স্ট্যাটাস আর কী। কিন্তু এখন যে দাঁড়িয়ে আছি প্রায় উনিশ হাজার ফিট ওপরে একশো বছরের একটা ইতিহাসের সামনে। ১৯১২ সাল থেকে পৃথিবীর নামজাদা

অভিযাত্রীরা হন্যে হয়ে ফিরেছেন, এই পরশপাথরের খোঁজে। কত মৃত্যু, কত ব্যর্থতা, কত যন্ত্রণা বিরহের 'মর্সিয়া' হয়ে আছে এ পথ খোঁজার নেপথ্য ইতিহাসে। ২০০৭ সালে প্রথম খুঁজে পাওয়া পথে যে কজন অভিযাত্রী আজ পর্যন্ত পৌঁছতে পেরেছেন, এই নেহাতই নগণ্য আমি, তাদের মধ্যে একজন। চোখের কোণদুটো শিরশির করে সানগ্লাসের কাঁচ ঝাপসা করে দিয়েছে বুক জুড়ে জমে থাকা উদগত বাষ্প। আমি নিঃসঙ্কোচে কাঁদছি সফলতার আদরে, আবার নিজেকে নতুন করে খুঁজে পাওয়ার অনায়াস স্বাচ্ছন্দে।

আমি নিশ্চিত জানি টিমের বাকিদের মনের বর্তমান রসায়ন। তারাও যে ভেতর থেকে ধুয়েমুছে আজকে এক একটা নতুন 'আমি'।

লাল হলোফিলের ওপর চিটপিট শব্দের বোল তুলে শুরু হয়েছে অল্পস্বল্প তুষারপাত। ঘোলাটে আকাশটা যেন ছোটো হয়ে নেমে এসেছে মাথার ওপর। পানপাতিয়া কলের দিক থেকে পাঁশুটে রঙের একদঙ্গল মেঘ প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর লেজের মতো ডায়াগোনালি ঝুলে আছে আমাদের ওপর। 'কল' ছোঁয়া দশ ফুটের এই লম্বা রাস্তাটা যেন পঞ্চাশ ওয়াট বালব্-এর ক্ষীণ-আলোয় আলোকিত অস্পষ্ট এক টানা বারান্দা। ওই আলোয় পায়ের নীচের আধাজমাট মুচমুচে তুষার, পড়ে থাকা আধময়লা এক সাদা মাদুরের মতোই নিষ্প্রাণ।

তুষারপাত আর হাওয়ার প্রাবল্য বেড়েছে। তারই মধ্যে এগিয়েছে সারি সারি কিছু মানুষের 'ক্যারাভ্যান', এক নির্দিষ্ট নিয়তির দিকে। রোপে মলয়দা আর সুমনের পরেই আমি। আমার ঠিক পিছনেই সলিলদা। হঠাৎই মনে হয়েছে সলিলদা সিনিয়র মাউন্টেনিয়ার এবং নিঃসন্দেহে ভালো পারফরমার। সুতরাং 'কল'-এ আমার আগে দাদার পা রাখাটাই সঙ্গত হবে। বেশ কয়েকবার রিকোয়েস্ট করার পরও সলিলদা কিন্তু রাজি হয়নি। পিছনেই থেকেছে।

শেষ মহূর্তে তুষার জমিটা যেন খুশীর একটা হালকা স্পট জাম্প-এ শেষ হয়েছে বহু প্রতিক্ষিত 'পানপাতিয়া কল'-এ। ঘড়িতে এখন একটা চল্লিশ (পরে সুমন কুণ্ডুর দেওয়া তথ্য)। ছশো ফুটের টোটাল 'করিডর'-টা আমি এসেছি একটা ঘোরের মধ্যে। প্রবল জ্বরে আক্রান্ত মানুষের জ্ঞান থাকলেও চারপাশের অস্তিত্ব সম্পর্কে তার যেমন একটা ভাসা ভাসা মেমারি থাকে, আমারও ঠিক তাই। কেমন যেন ঘষা কাঁচের মতো স্মৃতি, অস্পষ্ট কিন্তু নিশ্চিত উপস্থিতি।

'কল'-এর চারদিক এখন ঝোড়ো তুষারপাতের কারণে ওই ঘষা কাঁচের মতোই লাগছে। ভিসিবিলিটি ক্রমশ কমছে। তার মধ্যেই দেখেছি জায়গাটা অপরিসর। দৈর্ঘ্য মোটামুটি হলেও প্রস্থের কলেবর বড়োই কম। তুষারের আলগা বন্ধনে থাকা কিছু বোল্ডারের নিছকই ঠুনকো 'ব্যারিয়ার'-এর পরেই, নেমে গেছে প্রায় আশি ডিগ্রি খাড়া এক ভয়ংকর উৎরাই। রীতিমতো লো ভিসিবিলিটির কারণে যার প্রথম কয়েক ফুট বাদ দিলে বাকি অংশ আমাদের চোখের আড়ালে। কুয়াশার মোটা পর্দা ঘেরা সে অদৃশ্য পথের ভয়াবহতার আগাম একটা আন্দাজ করা গেলেও, স্পষ্ট ধারণা ওই উৎরাই পথে পা না ফেললে বোঝা না মুমকিন্।

সলিলদা একবুক সহজ আনন্দে জড়িয়ে ধরেছে সুমনকে। এই নির্মেদ, নির্মল হার্দিক অভিনন্দনটা সুমনের অবশ্য প্রাপ্য। পুরো অভিযানটাই ওর 'ব্রেন চাইল্ড'। দিল্লিতে আই এম এফ অফিস, উত্তরাখণ্ডে মঙ্গল সিং-এর সঙ্গে যোগাযোগ সবটাই ফোনের মাধ্যমে নিজে করেছে। শঙ্খ দাশগুপ্তের বক্তব্য অনুযায়ী প্রায় হাজার দেড়েক টাকার এস.টি.ডি. বিল উঠেছে। কিন্তু টিম খরচের ভাগীদার হতে চাইলেও এক পয়সা নেয়নি। এ ছাড়া রুট অ্যানালিসিস, নানা জায়গায় ই-মেল, গাদা গাদা জেরক্স, পূর্ববর্তী টিমের মেম্বারদের সঙ্গে কথা বলা মায় কেনাকাটির ব্যাপারেও ছেলেটা ছিল অক্লান্ত। আমার টিমের প্রত্যেক সদস্যের প্রতি সমান শ্রদ্ধা ও সম্মান রেখেই বলছি সুমন না থাকলে পানপাতিয়া অভিযান এত সহজে হত না। স্বভাবলাজুক ছেলেটা এতটা পড়ে নিশ্চয়ই বেশ অস্বস্তিতে পড়বে। হয়তো দেখা হলে বা ফোনে বলবে, ''এই ডাক্তার, কীসব লিখেছিস?'' না রে সুমন, আমার বক্তব্যে আবেগের অতিশয়ক্তি নেই। পানপাতিয়ার সফল অভিযানটা যেরকম বাস্তব, ঠিক সেরকমই আমার সচেতন বক্তব্যটাও বুগিয়ালের মজবুত জমিতে দাঁড়িয়ে, সেখানে ক্রিভাসের বিন্দুমাত্র উঁকিঝুঁকি নেই। পাহাড়ের মতোই তোর নিখাদ দায়িত্বশীল বন্ধুতা ওই সাদা তুষারের মতোই ধপধপে সত্যি। অনেকদিন আগে করা জো টাস্কারের মননশীল মন্তব্যটা আমাকে অক্লেশে সমর্থন করছে, "The bond which is formed by members of an expedition who have worked and struggled together goes beyond friendship. It is more akin to the relationship with a brother whom one knows intimately and accepts for all his faults as well as his good

points and virtues."

বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত একবার মন্তব্য করেছিলেন, "সত্যজিৎ যতবার পুরস্কার পাবেন, ঋত্বিক ততবার পাগলাগারদে যাবেন।" ১৯৭২ সালে 'মিনিবুক' পত্রিকায় সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, মৃণাল সেনের একটা ইন্টারভিউ নিয়েছিলেন। সেখানে বুদ্ধদেবের মন্তব্য নিয়ে মৃণাল বাবুকে প্রশ্ন করা হলে, সেন মহাশয়ের একটা তাৎপর্যপূর্ণ বিশ্লেষণ ছিল। উনি বলেছিলেন, "ফর মি, মানিকবাবু ইজ সুপার্ব। ঋত্বিক এর উলটো। সে ইমপালসিভ ও অবসেস্‌ড। এবং অবসেস্‌ড লোকের দ্বারা পুরো কাজ করা সম্ভব নয়।"

ঋত্বিক ঘটক রাম হলে আমি নিঃসন্দেহে রামছাগল। তবে একটা ব্যাপারে আমাদের দুজনের অসম্ভব মিল। আমিও বেশ কিছু সময় ইমপালসিভ এবং কিছু কিছু ব্যাপারে অবসেস্‌ড। ইনটেলিজেন্ট কোশেন্ট কতটা ভালো জানি না তবে ইমোশানাল কোশেন্ট যাচ্ছেতাই রকম বাজে। পুরস্কার স্বরূপ এই আবেগী আমার অভিধানে 'ব্যর্থতা' শব্দটা বেশ কমন। কিন্তু কেন জানি না, পাহাড়ের বোধহয় 'ইমপালসিভ' এবং 'অবসেসড' লোকজন বেশি পছন্দের। তাই পাহাড়ের চিত্রনাট্যে প্রমথেশ বড়ুয়া বা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দেবদাস' মার্কা ট্র্যাজিক হিরোর রোল এখনও পর্যন্ত আমার জন্য বরাদ্দ নেই। সামর্থ কতটা আছে জানি না। তবে এ পাহাড় সে পাহাড় করে 'নেপোর দই' মারার ট্রাডিশানটা কিন্তু দিব্যি অব্যাহত আছে।

আর সেই কারণেই 'পানপাতিয়া কল'-এর অপরিসর তুষার জমি হয়ে উঠেছে আমার আবেগী মনের যথার্থ চারণভূমি। ঝড়ের ঝাপটা আমার কাছে যেন শিবরঞ্জনী হয়ে আসছে। চোখে মুখে তুষারের নির্মম কশাঘাত যেন পরাগ মাখানো নরম আদর। প্রায় আশি ডিগ্রির ভয়াবহ উৎরাই নিয়ে মনে কোনো টেনশন ছিল না এটা বললে বাংলা মিথ্যে কথা বলা হবে। তবে আবেগের পারদ মাঝেমধ্যে র‍্যাশনাল চিন্তাভাবনাকে 'বাপী বাড়ি যা' করে দেয় তো। আমারও একই অবস্থা।

মলয়দা তো দস্তুর মতো পরীক্ষণীয় পাগল। উৎরাই-এর প্রায় শিহরণ জাগানো শিয়ার ড্রপটার শুরুতে পাঁচিল সম বোল্ডারগুলোর একটায় নিশ্চিন্তে রিল্যাক্স করে বসে আছে। পাগলা হাওয়ার লাগাম ছাড়া পিরীতি তে একবার পাকা আমের মতো খসে পড়লে, বর্ধমানের বাড়িতে "ওগো তুমি কোথায়

গেলে গো" মার্কা রুদালীপনা শুরু হয়ে যেতে পারে, এ ব্যাপারে ওর কোনো চিন্তাভাবনা নেই। অবশ্য টিমের বাকি লোকজন আমাদের দুজনের মতো অপ্রকৃতিস্থ নয়। তাদের মাথায় এড ভিয়েস্টার কথাগুলো গাঁথা থাকে, "Getting to the top is optional, getting down is mandatory."

তুষারপাত আর হাওয়ার দাপটে কোনোমতে কিছু ছবি নেওয়া গেছে। বলাবাহুল্য একটাও মনোমতো হয়নি। এখনও ঝাপসা ছবিকটা লোকজনকে দেখাতে গেলে উল্লেখ করে দিতে হয় যে এটা 'পানপাতিয়া কল'।

প্রায় মিনিট কুড়ি পর তুষারপাতের তীব্রতা কিছুটা কমেছে। মঙ্গল সিং আর দেরি করতে চায়নি। নামার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এরপর প্রকৃতির খামখেয়ালীপনায় আবহাওয়া আরও খারাপ হলে নামাটা আত্মহত্যার সামিল হয়ে যাবে। আবার এই অপরিসর খোলা জায়গায় 'কল' এর ওপর টেন্ট পিচ করাটাও মাউন্টেয়ারিং অভিধানে কোথাও লেখা নেই। বিশু আর সুমনের নিশ্চয়ই মনে আছে ২০০৯ সালে 'অডেনস কল' অভিযানের কথা। সেবারও পাস এর ওপর পৌঁছানোর পর, পাঁচঘণ্টা ধরে চলা অবিরাম তুষারপাতের জন্য টিম বাধ্য হয়েছিল পাস-এর ওপরেই রাত কাটাতে। 'মেমরেবল রাত'-টার কথা মাথায় রেখেই বিশুও মঙ্গল সিং-এর সিদ্ধান্তকে নিঃশর্ত সমর্থন জানিয়েছে।

কিন্তু মঙ্গল এরপর যেটা করল সেটা সমান 'মেমরেবল'। রোপ ফিক্স না করে ডানহাতে আইস অ্যাক্স আর বাঁ হাতে বৌদির ডান হাতটা ধরে সন্তর্পণে পা ফেলেছে উৎরাই-এর অজানা বিভীষিকায়। জাস্ট কয়েক মিনিটের মধ্যেই বউদির হলুদ উইন্ডচিটার অদৃশ্য হয়ে গেছে আমাদের চোখের আড়ালে। কুয়াশা আর মেঘের জমাট প্রতিরোধের কাছে হতবাক কটা মানুষের 'ভিস্যুয়াল পাওয়ার' নেহাতই তুচ্ছ হয়ে গেছে।

প্রায় আটশো ফুটের উৎরাই। বেলা পড়ে আসছে। তুষারপাতের প্রাবল্য আরও বেড়েছে। বিশু আর দেরি করেনি। ইংরাজি প্রবাদটার ও যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়েছে — "Face the situation and soon there will be no situation to face." সলিলদার সাপোর্ট নিয়ে মঙ্গল সিং-এর কেটে যাওয়া স্টেপ-এ পা রেখেছে। একে একে স্বল্প পরিসরের স্টেপগুলোতে গোড়ালির ভর রেখে নামতে শুরু করেছে গোটা টিম। পুরোটাই প্রায় স্নায়ুর চাপের পরীক্ষা। এসব জায়গায় ফিজিক্যাল ফিটনেস-এর যে-কোনো দাম নেই

সেকথা বলব না। তবে মানসিক চাপ সহ্য ক্ষমতার বাইরে বেরিয়ে গেলে 'খেল খতম পয়সা হজম' হতে দেরি হয় না।

দুঃখ, যন্ত্রণা, বিপদ যে-কোনো কিছুই সময়ের সঙ্গে কিছুটা গা সওয়া হয়ে যায়। আমাদের অন্তহীন নেমে চলাটাও এখন অপেক্ষাকৃত সহজ হয়ে গেছে। গ্র্যাডিয়ান্ট-ও আশি ডিগ্রি থেকে কমে পয়ষট্টি থেকে সত্তর ডিগ্রির মতো। স্টেপ কেটে আর নামতে হচ্ছে না।

একমনে একাগ্রতা নিয়ে বেশ কিছুটা নেমে এসেছি। তুষারের হিমেল আতিথ্যে মাঝেমধ্যে হাঁটু অবধি ঢুকে গেছে। প্রচণ্ড ঠান্ডায় হাত পা প্রায় অসাড়। পরিত্রাণ পাবার লক্ষ্যে সবারই গতিবেগ বেড়েছে। 'ক্লাসিক্যাস ডিসেন্ডিং'-এর ওপর ভরসা না রেখে অনেকটা হাফ-ডাইভ মার্কা অবতরণ প্রায় প্রত্যেকেরই।

— "ওউর কভি অ্যায়সি জাগা পে নেহি আউঙ্গা দাদা," ডানপাশ দিয়ে নেমে আসা বিজেন্দ্রর অসহায় ভয়ার্ত স্বীকারোক্তি।

আমাদের তুলনায় পোর্টারদের গরম জামাকাপড় এমনিতেই কম। তার ওপর অনভিজ্ঞতার কারণে পরিস্থিতি ওর নিয়ন্ত্রণের বাইরে। মায়া লাগছে ছেলেটাকে দেখে। কিন্তু বাস্তবিকই আমার কিছু করার নেই।

হাঁফাতে হাঁফাতে বিজেন্দ্র একসময় থেমে গেছে। আমিও থমকেছি ওকে দেখে।

— "সামহাল লুঙ্গা দাদা, তুম উতর যাও," শক্ত পাহাড়ি জান-এর মরিয়া উত্তর।

আমিও আর থামিনি। হাতের মিটনজোড়া খুলে ওর হাতে ধরিয়ে নামতে শুরু করেছি। বিজেন্দ্র কিছু একটা বলেছে। ভালো শুনতে পাইনি হাওয়ার এলোমেলো দাপটে। তবে এটুকু নিশ্চিত হয়েছি মিটনের উষ্ণতা ওর শরীর কিছুটা হলেও গরম রাখবে।

জমে যাওয়া ঠান্ডাটা বাদ দিলে অবতরণ এখন তুলনামূলক অনেকটাই আয়ত্তে। চোখে পড়েছে দড়ি বাঁধা একটা প্যাকিং বাক্স। নিঃসন্দেহে পূর্ববর্তী কোনো অভিযানের মালপত্র। আমাদের নিঃসন্দেহে নয়, প্যাকিং-এর জীর্ণতাই তার প্রমাণ।

নামছে সবাই। তবে কাছে না এলে কাউকেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না। আবার শুরু হয়েছে প্রবল তুষারপাত।

আচমকাই এক কুঁচো তুষারকণা সানগ্লাস-এর প্রোটেকশান এড়িয়ে ধাক্কা মেরেছে বাঁ চোখে। সোজাসুজি আইবল-এ লাগেনি। টোকাটা দিয়ে গেছে আইল্যাশ-এর ওপর। তাতেই চোখের ভেতরে কনট্যাক্ট লেন্স ডিসপ্লেসড্ হয়ে গেছে। একেই প্রায়ান্ধকার প্রকৃতি, তার ওপর আবার প্রায় একচোখে দেখছি। বাধ্য হয়েই থামতে হয়েছে। ইনার গ্লাভস পরা অবস্থাতেই লেন্স ঠিক করার একটা বৃথা চেষ্টা করেছি। মাঝখান থেকে আঙুলগুলো আর একটু জমে গেছে।

এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখান থেকে ডানদিকে মোড় নিয়ে নামতে হবে। বাঁ দিকে ক্রিভাসের অজস্র ফাটল। কীভাবে জানি না তবে এলোপাথাড়ি নাড়াচাড়ায় লেন্সটা আবার যথাস্থানে ফিরে গেছে। তবে হালকা যন্ত্রণা আর অস্বস্তিটা পলক ফেললেই মালুম হচ্ছে।

— "কী হল ডাক্তার," তরতর করে আমার বাঁ দিক ধরে নেমে আসা সুমন থমকেছে।

— "কিছু না, চোখে কিছু পড়েছিল," আবার ধীরে হলেও নামতে শুরু করেছি।

সুমন কিন্তু আমার অস্বস্তিটা বুঝতে পেরেছে। নানা ঠাট্টা ইয়ার্কি করে চাঙ্গা রাখার চেষ্টা করেছে আমায়। সমান তালে নামতে নামতে দুজনেই হেসে উঠেছি। প্রকৃতির বিরুদ্ধতা সহজেই নেমে গেছে কয়েক পারদ। আমাদের মিলিত হাসির লহড়া, ছাপিয়ে গেছে ঝোড়ো বাতাসের আগ্রাসী বিরক্তিকে।

তার মধ্যে একটা কথা আজও আমার ভীষণভাবে মনে আছে। সুমন নানা মজার কথা বলতে বলতে বলে উঠেছিল, "ডাক্তার একটা বিয়ে কর, না হলে এসব মুহূর্তের কথা কাকে শোনাবি?"

আমার ঠিক কেন বিয়ে করা উচিত, সে ব্যাপারে বিভিন্ন বয়সের, বিভিন্ন মানুষের, বিভিন্ন সুচিন্তিত মতামত আমি আজ পর্যন্ত প্রচুর শুনেছি। কিন্তু এহেন পরিবেশের বর্ণনা শোনানোর জন্যও যে আমার বিয়ে করাটা আবশ্যিক, সেটা সুমন কুণ্ডু ছাড়া আর কেউ বোঝেনি।

ঠিক একারণেই আমার টিমের অধিকাংশ সদস্য আমার 'আত্মীয়', প্রকৃতই তাদের সঙ্গে আমার আত্মার যোগাযোগ। আধুনিক সভ্যতার ফিকে হয়ে আসা মানবিকতার ক্যানভাসে জীবনের আবির ছুড়ে দিতে এদের জুড়ি মেলা ভার। তাই হয়তো না জেনেই এরা Trevanian এর অমর উক্তির যথাযোগ্য মর্যাদা

দিয়ে চলেছে পাহাড় থেকে পাহাড়ে — "The rope connecting two men on a mountain is more than nylon protection, it is an organic thing that transmits subtle messages of intent & disposition from man to man; it is an extension of the tactile senses, a physiological bond, a wire along which currents of communication flow."

তুষারপাত এখন ব্লিজার্ড-এ পরিণত হয়েছে। রীতিমতো চোখেমুখে তুষারের নির্মম ঝাপটার সঙ্গে ঝোড়ো মাতাল মরুতের ধাক্কায় টলে যাচ্ছে বডি ব্যালেন্স। সোয়া ঘণ্টার কসরতের পর নেমে এসেছি এক অনামা হিমবাহে। এখান থেকে বেশ ঝাপসা তবু আমাদের টেন্টস ফ্যাব্রিকগুলো বোঝা যাচ্ছে।

৩.৩০ নাগাদ পৌঁছেছি টেন্ট-এর সামনে। প্রচণ্ড হাওয়ার দাপট সামলে দুটো টেন্ট মোটামুটি পিচ করা গেছে। একবার পিছন ফিরে তাকিয়েছি 'পানপাতিয়া কল'-এর দিকে। 'কল' এখন দৃষ্টিপথের আড়ালে। শুধু দূরে প্রায় বিন্দুর মতো ঝাপসা কয়েকটা অবয়ব নেমে আসছে ওই তুষার উৎরাই ধরে।

আমি আর ওয়েট করিনি। ঠান্ডায় দাঁড়ানো যাচ্ছে না। হোলিফিল জ্যাকেটের গায়ে জমে থাকা বরফ ঝেড়ে ঢুকে গেছি টেন্ট-এর উষ্ণ আরামে।

কিছুক্ষণ আগেই সবাই এসে পৌঁছেছে। এক কাপ গরম চা এই পরিবেশে আশীর্বাদ-এর মতো। কিন্তু পোর্টারদের অবস্থা বেহাল। মালবহনের পরিশ্রম আর ঠান্ডার কামড়ে ছেলেগুলোর অবস্থা সঙ্গীন। যে যার টেন্টে মরার মতো শুয়ে পড়েছে। ডাকাডাকি করেও লাভ হয়নি। বাইরে একটানা হাওয়ার ক্রুদ্ধ গর্জন আর অবিরাম তুষারপাতের একঘেঁয়ে তর্জনের মিলিত সিম্ফনি। স্বর্ণেন্দুদের টেন্ট থেকে এই আবহাওয়ায় আমাদের টেন্টে কেউ আসতে পারেনি। তাই আড্ডাটাও আজ সেভাবে জমেনি। যদিও লক্ষ্য অতিক্রম করার আনন্দে আড্ডা, খিদে অনেক কিছুই আজ ঢাকা পড়ে গেছে। তাঁবুর ওপর হাঁড়কাপানো ঠান্ডা হাওয়ার 'গাস্ট'কে অগ্রাহ্য করে বিশু, সুমন, আমি আর মলয়দা মেতে উঠেছি রোমন্থনের উত্তেজনায়। হঠাৎই সবাইকে চমকে দিয়ে মলয়দা স্যাক থেকে বার করে এনেছে কাজু আর কিসমিস।

— "রেখে দিয়েছিলাম, দ্যাখ এখন কেমন কাজে লাগছে," কাঁচা পাকা দাঁড়িগোঁফের ফাঁকে মলয়দার শীর্ণ মুখে গর্বের হাসি।

— "জিও বস্," সুমনের সোল্লাস তারিফ।

খিদের মুখে কাজু কিসমিসগুলো অমৃত লেগেছে। আরও কিছুক্ষণ কথা চালাচালির পর শ্রান্ত শরীরগুলো আরাম চেয়েছে। এলিয়ে পড়েছে স্লিপিং ম্যাট্রেসের নিশ্চিত আতিথ্যে।

টানা তুষারপাতের পর চারদিক জুড়ে এখন অখণ্ড নীরবতা। টেন্টের ভেতর অন্ধকার। কটা বাজে বোঝা যাচ্ছে না। ঘড়ি দেখার ইচ্ছেও হয়নি। পাশের টেন্ট থেকে স্বর্ণেন্দুদের গলা ভেসে এসেছে। মঙ্গলদের নড়াচড়াও টের পাচ্ছি। আজকের দিনটা বেশ ঘটনাবহুল। ক্লান্ত মন আর শ্রান্ত শরীরটাকে ঘিরে ধরেছে এক আদুরে আলসেমি। কালকে আবার একটা পাস ক্রশ করার দিন — 'কাচনী পাস'। তার আগে এই আলসেমির ওম্ টা আমার দিব্যি লাগছে।

রাতে একগ্লাস করে গরম হরলিকস আর বিস্কুট ছাড়া বরাতে কিছু জোটেনি। আমরাও আর চাপ দিইনি পোর্টারদের বেহাল অবস্থার কথা ভেবে।

প্রকৃতি এখন বড়ো শান্ত। গোটা অন্তরীক্ষ জুড়ে কোটি কোটি তারার নিস্তব্ধ প্রদর্শনী। টেন্টের নেট উইন্ডো ছুঁয়ে দৃশ্যমান ছোট্টো এক টুকরো আকাশের গায়ে ফুটে থাকা তারাদের উপস্থিতি, বাড়িয়ে তুলেছে রাতের অভিজাত গাম্ভীর্য। আমি জানি হিমশুভ্র তুষারের বুকে বয়ে যাওয়া হাওয়ার ফিশফাশ আলাপন, নিশ্চিত বুঝতে পারে অন্ধকার আকাশের বুকে ফুটে থাকা তারাদের অপার রহস্য।

মায়ের কোলের মতো নিশ্চিত নিরাপত্তায় দু-চোখের পাতা এক হয়ে গেছে।

স্লিপিং ব্যাগের মোহভরা দাম্পত্যে, তাঁবুর অন্ধকার নির্জনতায় মাউন্ট চৌখাম্বার সাদা শরীরটা নিঃশব্দে এসেছে স্বপ্নের মতো। নিশ্বাস ছোঁয়া নৈকট্যে তার অভিসারী চোখে অপলক ছায়া ফেলে, আমি ফিশফিশ করে বলে উঠেছি—

"তোর তরে বাঁধিয়াছি ঘর,
তোর তরে কবিতা আমার।"

নবম দিন
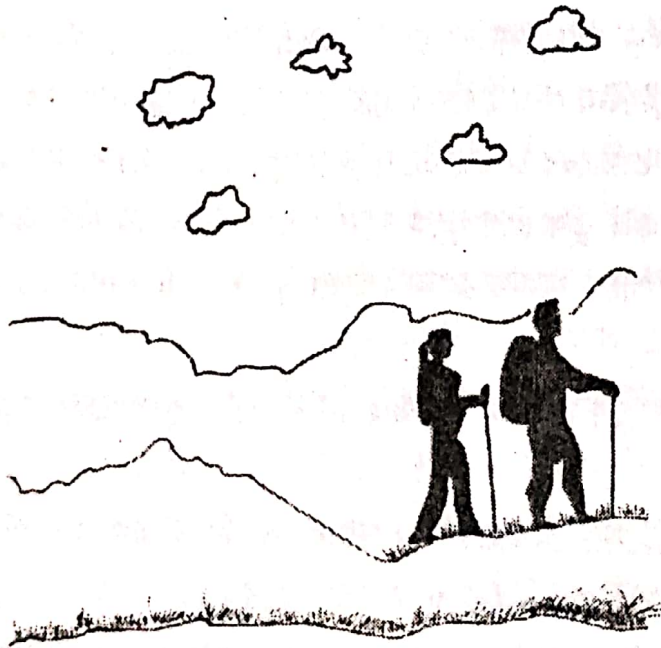
Here with a loaf of bread
beneath the bough
A flask of wine, a book of
verse and thou,
Beside me singing in the wilderness
And wilderness is paradise enow.

— ওমর খৈয়াম

বেহেশত-এ যাবার সময় কী কী নেবেন, তার তালিকা তৈরি করতে গিয়ে ওমর খৈয়াম ওই চারটে জিনিস এর কথা উল্লেখ করেছিলেন — রুটি, মদ, বই এবং 'thou' অর্থাৎ 'তুমি'। বই নিয়ে আমার কিছু বলার নেই। এরকম অমূল্য বন্ধু আর হয় না। কিন্তু রুটি, মদ আর তুমি নিয়ে আমার কিঞ্চিৎ আপত্তি আছে। রুটি আর মদ তো ফুরিয়ে যাবে, 'তুমি' নামক জীবটির কাজল কালো চোখের বিলোল কটাক্ষ ও একদিন মরা মাছের মতো হয়ে যাবে। তখন? সেক্ষেত্রে বই-এর সঙ্গে 'পাহাড়ের স্মৃতি' যোগ হলে কেমন হয়? একেবারে 'ডেডলি কম্বো', তাই না? বেহেশ্‌তে আর কিছু লাগে নাকি!

তবে এই মুহূর্তে 'পাহাড়ের স্মৃতি' নয়, গোটা পাহাড়টাই এখন চোখের সামনে। আজ ১৯ জুন, মঙ্গলবার। রোদ ধোওয়া প্রায় প্রুশিয়ান ব্লু আকাশের নীচে যতদূর চোখ যায়, শুধু সাদা সাদা আর সাদা-র তরঙ্গায়িত এক তুষার জমি। ওই সেই কোন ওপরে প্রায় আকাশ ছুঁয়ে আছে 'পানপাতিয়া কল'-এর ঢেউ খেলানো খাঁজ। সেখান থেকে মসৃণ এক তুষার জমি প্রায় জলপ্রপাত-এর মতো ডাইভ দিয়েছে ল্যান্ডিং সম এক তুষার ক্ষেত্রে। আবার সেখান থেকে আরও নীচে ঝাপ দিয়ে পড়ে দু-চারটে মারাদোনাসুলভ শৈল্পিক ড্রিবলে ছুঁয়েছে আমাদের টেন্টের দরজা। সমস্ত ল্যান্ডস্কেপটা জুড়ে যেন নীল আর সাদার এক অনবদ্য ফিউশন্‌।

হালকা হিমেল হাওয়ার ভিজে ছটফটানি ছুঁয়ে যাচ্ছে চোখে মুখে আর তাঁবুর ফ্যাব্রিকে। নিঃসঙ্কোচে যুবতি মেঘের দল পেলব শরীর এলিয়েছে আকাশের বুকে। ঘুমন্ত শিশুর দিকে তাকালে যেমন এক 'নিশ্চিন্ত নরম' ছুঁয়ে বুকের ওই গভীর জায়গাটায়, আজকের সকালটাও ঠিক তেমনি। অপার শান্তি আর জমাট আনন্দের এক না বোঝাতে পারা অশঙ্ক অনুভূতি।

বকরূপী ধর্ম যুধিষ্ঠির কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "সবচেয়ে বিস্ময় কী" ? যুধিষ্ঠির যথার্থই বলেছিলেন, "আমরা সবাই জানি প্রত্যেকে মরণশীল তবু সব ভুলে যেতে থাকি লোভ, হিংসা, স্বার্থপরতা, প্রতিহিংসা, লালসা নিয়ে"। বর্তমানে শহুরে জীবনের আরও ভালো থাকার অস্বাস্থ্যকর রিংটোন যখন বিশ্বজুড়ে ক্রমাগত বাড়িয়ে চলেছে লোভ, প্রতিহিংসা আর স্বার্থপরতার পারদ তখন হিমালয়ের আদিম হাওয়া, যুগান্তরের পাথর আর অনন্ত উদার আকাশের নীচে জমে থাকা তুষারের নিষ্কলুষ সান্নিধ্য মনোজগৎ জুড়ে তৈরি করে এক 'অন্য ভুবন'।

বারট্রান্ড রাসেল একটা বড়ো দামি কথা বলেছিলেন, "সংসারে জ্বালা যন্ত্রণা এড়াবার প্রধান উপায় হচ্ছে, মনের ভিতর আপন ভুবন সৃষ্টি করে নেওয়া এবং বিপদকালে তার ভিতর ডুব দেওয়া। যে যত বেশি ভুবন সৃষ্টি করতে পারে, যন্ত্রণা এড়াবার ক্ষমতা তার ততই বেশি হয়"।

পাহাড়ের সান্নিধ্য যতটুকু পেয়েছি, বারবার মনে হয়েছে 'আপন ভুবন' তৈরি করার এ এক আশ্চর্য উর্বর জমি। শুধু ভুলে থাকা নয়, নিজেকে প্রকৃত শিক্ষিত করার এহেন পাঠশালা দুনিয়া খুঁজেও পাওয়া যায় না। আমি উপলব্ধি করেছি, নিজেদের ভেতর নিজেদেরই তৈরি করা 'লার্জার দ্যান ইমেজ' এর 'আরবান ইল্যুউশন্'টা বড্ড ছোটোলাগে পাহাড়ের 'জায়ান্ট স্ক্রিন'-এ। এখানে গেলে বুঝতে পারা যায় আমি এখনও কতটা 'রিক্ত', কতটা 'অশিক্ষিত', কতটা 'আনস্যাট্যুউরেটেড'। আমি জানি না পাঠকের কাছে আমার এ উপলব্ধি কতটা সদর্থক, কতটা বাঙ্ময়, কতটা জীবনবোধের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ।

তবে মার্ক ওবম্যাসিক্ আমায় সমর্থন করছেন, "I like the mountains because they make me feel small, they help me sort out what's important in life."

আর ফ্রেড্রিক নিস্তেজকের বক্তব্যটা তো রীতিমতো দর্শনছোঁয়া, "He who climbs upon the highest mountain laughs at all tragedies, real or imaginary."

মূল লক্ষ্য পেরিয়ে মোক্ষলাভের আনন্দে গোটা টিম কিন্তু রীতিমতো স্ফূর্তিতে। 'বুলস আই'-তে তীরটা লাগানোর পর একজন তীরন্দাজ-এর চোখেমুখে যে রিল্যাক্সড ভাবটা ফুটে ওঠে, আমাদের মুখচোখেও সেই ছবি স্পষ্ট। তার ওপর ঝকঝকে ওয়েদার মনোজগতে একটা প্রভাব তো ফেলেই। সবমিলিয়ে সবার মুড-এর আগে 'বিন্দাস' শব্দটা অনায়াসেই বসানো যায়।

ঝলমলে রোদ্দুরটা উঠলে সকালবেলা যে ছবিটা ভীষণ কমন সেটা হল ভিজে জুতোজোড়া, জামাকাপড়, স্লিপিং ব্যাগ, ম্যাট্রেস ইত্যাদি প্রভৃতি যতটা পারা যায় রোদসেঁকা করে নেওয়া। আজকের সকাল ও তার ব্যতিক্রম নয়। প্রকৃতির ড্রায়ার-এ জামাকাপড়ের সঙ্গে নিজেদের সেঁকে নেওয়ার কাজটাও সমানতালে চলছে।

ব্রেকফাস্ট প্রায় তৈরির পথে। স্বর্ণেন্দু আর মলয়দা, বাপে খ্যাদানো মায়ে

তাড়ানো ছেলেদের মতো, তাঁবুগুলো থেকে একটু দূরে চরে বেড়াচ্ছে। মাঝে দুজনে একবার পোজ দিয়ে দাঁড়িয়ে আমাকে দিয়ে ছবিও তোলাল। কানে ভেসে এল প্রকৃতির রূপমাধুরী নিয়ে দুজনের সিরিয়াস কথোপকথন। আমি সরে এসেছি। কারণ ইংলিশ মিডিয়ামে পড়া স্বর্ণেন্দু আবেগপ্রবণ হয়ে পড়লে, ওর মুখ থেকে যে বঙ্কিমচন্দ্রীয় 'বাংলা' বের হয়, তার মুখোমুখি হওয়া রীতিমতো পীড়াদায়ক। লাদাখে পারাংলা ট্রেক-এর সময় 'লাস্যময়ী' বলতে গিয়ে কনফিডেন্টলি 'লালাস্যময়ী' বলল। আমি ভাবলাম, 'স্লিপ অব টাঙ্'। পরে বুঝলাম ব্যাপারটা 'স্লিপ অব বাংলা জ্ঞান'।

টেন্ট ডিসম্যান্টল করার কাজ চলছে। বিশু নিবিষ্ট মনে ওর স্যাক মেরামতিতে ব্যস্ত। স্যাকটা ইদ্রিশ-এর তৈরি। এখন তো 'ক্লিফলাইন', 'অ্যালপাইন' ইত্যাদি বিভিন্ন কোম্পানি এসে গেছে। সঙ্গে ইন্টারনেটের দৌলতে অনলাইন শপিং-এ বিদেশি জিনিসপত্র ও হাতের মুঠোয়। একসময় কিন্তু ইদ্রিশ-এর একচেটিয়া মার্কেট ছিল। জিনিসপত্রগুলোর দেখনদারী কম থাকলেও মজবুত এবং কার্যকরী ছিল যথেষ্ট। বিশুর ফ্যাকাসে হয়ে আসা সবুজ ব্যাগটা আদতে সুমনের। সুমন আর নেয় না। তাই পাহাড়, জঙ্গল, সমুদ্র সর্বত্র বকলমে ব্যাগের মালিকানা বিশুর-ই।

বিশুর পাহাড়ি সরঞ্জাম-এর সঙ্গে মার্ক টোয়েনের লাইব্রেরির মস্ত মিল। লাইব্রেরিটার মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত শুধু বই আর বই। এমনকি কার্পেটের ওপরও গাদা গাদা বই পড়ে থাকত। এক বন্ধু একদিন মার্ক টোয়েনকে বললেন, "বইগুলো নষ্ট হচ্ছে, গোটাকয়েক শেলফ জোগাড় করছ না কেন?" মার্ক টোয়েন কিছুক্ষণ মাথা নীচু করে ঘাড় চুলকে বলেছিলেন, "ভাই, বলেছ ঠিকই — কিন্তু লাইব্রেরিটা যে কায়দায় গড়ে তুলেছি শেলফ তো আর সে কায়দায় জোগাড় করতে পারি না। ওটা তো আর বন্ধুবান্ধবদের থেকে ধার করা যায় না।"

বিশুরও তাই। এতগুলো বছর ধরে পাহাড়ে যাচ্ছে অথচ অন্তর্বাসটুকু ছাড়া (তাও সেটা পাহাড়ি সরঞ্জাম-এর মধ্যে পড়ে না) নিজের বলতে প্রায় কিছুই নেই। এর ওর থেকে চেয়ে চিন্তে এতগুলো বছর কিপটেটা পাহাড়ের সঙ্গে প্রেম পিরিতি করে যাচ্ছে। ভাবা যায় এক্সপেডিশান্-এ কেউ অন্যের জুতো পরে গটগটিয়ে বেরিয়ে পড়ছে। অবশ্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দাতাকর্ণরূপে

ঠিক এই জায়গাতেই প্রকৃতি আর মা-এর মধ্যে সত্যি কোনো তফাৎ নেই।

দক্ষিণমুখী যত এগিয়েছি ততই চওড়া হয়েছে প্রকৃতির বারান্দা। ততই প্রকাশ্যে এসেছে দিগন্তের অবাধ স্বাধীনতা। গতকাল যেখানে টেন্ট পিচ করা হয়েছিল জায়গাটার আশেপাশে পাহাড়ের ঘেরাটোপ ছিল। পাহাড় যেন নজরবন্দী রেখেছিল আমাদের। কিন্তু আজ যত এগিয়েছি মখমলি তুষারক্ষেত্র 'V'-এর মতো ক্রমশ চওড়া হয়েছে। দূরে হরাইজেন্টালি, দিগন্ত ঘেঁষা অনামা কার্ডিলেরা ডানা মেলেছে উত্তুঙ্গ উচ্ছ্বাসে।

পানপাতিয়া কল থেকে আমাদের মাথা পেরিয়ে ওই দূরের কর্ডিলেরার কাছাকাছি অবধি আকাশের ঢালু চাঁদোয়ায় কে যেন দোয়াতের কালির মতো ঘন নীল রং ঢেলে দিয়েছে। আকাশের এই প্রুশিয়ান ব্লু কালারটাই, হঠাৎই কর্ডিলেরার মাথার ওপর আশ্চর্যরকমভাবে পালটে গেছে। পাহাড়ের সারির কাছাকাছি গিয়ে আকাশের ঘন নীল ক্রমশ ফ্যাকাসে হতে হতে চট করে সবুজের একটা হালকা টোন গায়ে মেখে ঝুপ করে হারিয়ে গেছে ধ্যানমগ্ন গিরিশ্রেণির পিছনের অজানা দিগন্তে।

ইকোলজির সঙ্গে হিউম্যান সাইকোলজির একটা অদ্ভুত যোগাযোগ আছে। চারপাশের নান্দনিক উচ্ছ্বাস মনকে যেন আপনা থেকেই চাঙ্গা করে দেয়। ১৯৯২ সালে Theodore Roszak তাঁর 'The voice of Earth' বইতে প্রথম 'Ecopsycology' টার্ম-টা ব্যবহার করেন। রীতিমতো বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণার মাধ্যমে তিনি প্রমাণ করেছিলেন, যে সমস্ত মানুষ প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্যে বসবাস করেন তাঁরা অপেক্ষাকৃত বেশি সুখী এবং স্বচ্ছন্দ জীবনযাপন করেন। এমনকি তাঁদের শরীরবৃত্তীয় সুস্থতার পথে যে সমস্ত বাধা থাকে সেগুলোও সরে গিয়ে গিয়ে স্বাভাবিক জীবনযাপন ত্বরান্বিত হয়।

Paul Shepard-এর 'Nature and Madness' বইটাতে একটা অদ্ভুত তথ্য পেয়েছি। উনি গবেষণা করে দেখেছেন প্রকৃতির থেকে যে সমস্ত মানুষ দূরে থাকেন তাঁদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ডিলিউশন্ দেখা যায়। এ ছাড়াও নানারকম মানসিক চাপ ক্রমশ তাঁদের স্বাভাবিক ব্যবহারে অসংলগ্নতার ছাপ নিয়ে আসে, যা ধীরে ধীরে তাঁদের অপ্রকৃতিস্থ করে তোলে। এই সমস্ত মানুষের একটা বড়ো অংশকে প্রকৃতির সান্নিধ্যে বেশ কিছুদিন রেখে স্বাভাবিক মানসিক অবস্থায় ফেরানো গেছে, ওষুধের সাহায্য ছাড়াই।

বায়োলজিস্ট E.O. Wilson-এর পর্যবেক্ষণ সার্থক, "human beings have an innate instinct to connect emotionally with nature."

সময়ের সঙ্গে আরও বিভিন্ন গবেষণায় Gaia psychology, psychoecology, Environmental psychology, Green psychology, Ecosophy ইত্যাদি বিভিন্ন 'টার্ম' উঠে এলেও মোদ্দা বক্তব্যটা একই থেকেছে — মানুষ প্রকৃতির সাহচর্যেই মানসিক এবং শারীরিকভাবে সবচেয়ে ভালো থাকে।

মনোবিজ্ঞানীরা বলছেন, যে-কোনো প্রাকৃতিক শব্দই মানুষের মনের ওপর জমতে থাকা চাপের বোঝা হালকা করার ক্ষেত্রে ম্যাজিকের মতো কাজ করে। তবে এইসব আওয়াজের মধ্যে পার্বত্য ঝরনার শব্দই সবচেয়ে ভালো ফল দেয়। তাই ব্রিটেনের বেশ কয়েকটি অফিসের মানব সম্পদ উন্নয়ন বিভাগের কাছে আবেদন করেছিলেন একদল মনোবিজ্ঞানী। তাঁদের অনুরোধে, কিছুদিনের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে অফিসের বিভিন্ন জায়গায় ঝরনার জল বয়ে যাওয়ার মিষ্টি শব্দ বাজানো হয়। ফলাফল? কর্মীদের মনের ওপর চেপে বসা টেনশন, স্ট্রেস কমে গিয়ে কাজে আবার নতুন উদ্যম ফিরে পাওয়া।

এইসব গবেষণালব্ধ ব্যাপারস্যাপার শিক্ষিত লোকজনের জন্য। কিন্তু সুমন, শঙ্খদা বা আমার মতো কম বুদ্ধির মানুষজন বিশু পণ্ডিতের ওই প্রেসক্রিপশনটাই ফলো করি। বিশু কোনোদিন গবেষণার ঝুটঝামেলায় যায়নি। তবে পাহাড়ে আমাদের মতোই কিছু বছর পায়চারী করে সারসত্যটা বুঝেছে। তাই যে কেউ শারীরিক বা মানসিক সমস্যার কথা বললেই কনফিডেন্টলি বলে ওঠে, "এসব লো অলটিটিউড সিকনেস, পাহাড়ে যা, সব ঠিক হয়ে যাবে"।

আর জন রাসকিন তো বলেই গেছেন, "Mountains are the begining and end of all natural scenary." সঙ্গে আমাদের রবিঠাকুর ষোলোকলা পূর্ণ করে দিয়ে গেছেন। ছোটোবেলায় ওই যে কবিতাটা পড়েছিলাম না সবাই, যেখানে উনি বলেছেন যে প্রদীপের আলো হতে চেয়েছিল ঝিকমিক জোনাকি, ফুলেদের মনে প্রজাপতি হবার বাসনা ছিল, পুকুরের জল একদিন ডানা মেলে উড়তে চেয়েছিল আকাশে ইত্যাদি প্রভৃতি। তো রবিবাবু এইসব কথাগুলো বলে আমাদের কল্পনাপ্রবণ বাঙালিকে আর একটু উসকে দিয়েছেন।

আমিও তাই মাথার ওপর সুনীল নিলীমা আর পায়ের নীচে মাখন নরম তুষার পথকে সঙ্গী করে মহানন্দে আজ অনেক কিছু হতে চাইছি। মনকে যে কেউ বাধা দেবার নেই, কেউ তো বলছে না — হতে পারি কিন্তু কেন হব?

মন উচ্চগামী হলেও পথ কিন্তু আপাতত নিম্নগামী। হঠাৎ হঠাৎ তুষারে গেঁথে যাচ্ছে শরীরের অনেকটা অংশ। স্টেপিং ঠিক না থাকলেও হড়কে শরীরটা নেমে যাচ্ছে বেশ কিছুটা। মনের মসৃণ গতিবেগের সঙ্গে স্তূপীকৃত তুষারের নরম আতিথ্যের নিট যোগফল অনায়াস অবতরণ।

সূর্যের তেজ বেড়েছে। পিছন ফিরে তাকালে সূর্যরশ্মির তীক্ষ্ণতা ঝাপসা করে দিচ্ছে 'পানপাতিয়া কল'-এর নয়নাভিরাম অবয়ব। ভালোবাসা বুঝিবা এভাবেই ক্ষণিকের অতিথি হয়, স্মৃতি হয়ে থাকে অবোধ শিশুর অবুঝ আঙুলের মতো।

পোর্টার মদন আবার আজ নতুন কাণ্ড বাঁধিয়েছে। কয়েকটা প্যারাসিটামল ওর ফিভার এবং মাসল পেন কমালেও আজ মহাশয়ের দু-চোখ জুড়ে রক্তজবার চাষ। লাল হয়ে থাকা দুটো চোখ রীতিমতো ফুলে কুঁকড়ে ছোটো হয়ে আছে। ইনফেকশন্ থেকে ইনফ্লামেশানের নমুনা চোখের সামনে স্পষ্ট। প্রথম থেকেই মদন স্যার আজ বেশ কিছুটা পিছিয়ে ছিলেন। দলজিৎ ওর সঙ্গে সঙ্গেই আসছিল। আমি একবার পিছন ফিরে তাকাতে দলজিৎ আমাকে হাত নেড়ে ইশারায় ডেকেছে। বাধ্য হয়ে আবার পিছতে হয়েছে। কাছে গিয়ে দেখেছি এই অবস্থা।

মদনকে অনেকে বারবার বলা সত্ত্বেও ও সানগ্লাস কিছুতে ব্যবহার করবে না। সান-রে, বরফের ওপর রিফ্লেকটেড হয়ে ওর চোখে লাগছে, তবু ওর ভ্রূক্ষেপ নেই। মাঝখান থেকে পারশিয়াল ব্লাইন্ডনেস নেমে এসেছে ওর দু-চোখ জুড়ে। যে পথে স্নো গগলস লাগে, সে পথে ও যে কেন সানগ্লাসটুকুও ব্যবহার করে না, সেটা আমার বুদ্ধির অগম্য। কেন যে এসব আনপড় লোককে মঙ্গল কিছু বাড়তি কমিশনের লোভে নিয়ে এসেছে তা ওই জানে। ওয়েস্ট পাউচে রাখা সিফ্রোফ্লক্সেসিন গ্রুপের 'সিফ্লক্স আইড্রপ' আমি ওর দু-চোখে দিয়েছি। সঙ্গে বাধ্য হয়ে কড়া ভাষায় বলেছি, বাকি পথ ও যেন সানগ্লাস না খোলে।

এতক্ষণ নামছিলাম বাঁদিক ঘেঁষে। পা-এর কাছ থেকেই সোজা উঠে

গেছে তুষারের ইউনিফর্মে মোড়া সব গ্রানাইটের সারি। অনামা তবে নামে কিবা এসে যায়? কেউ রূপে আবার কেউ ভালোবাসায় ভোলাচ্ছে।

এবার ডিসেন্ডিং কিছুটা মাঝ বরাবর। স্বাভাবিকভাবেই তুষার গভীরতা কিছুটা হ্রাস পেয়েছে।

তেষ্টায় ছাতি ফাটছে। অথচ জল নেই। চারদিক জুড়ে বরফ, গলালেই জল অথচ সামান্য যেটুকু ডিজেল অবশিষ্ট আছে তা দিয়ে বরফ গলিয়ে সবার জন্য জল করা সম্ভব হয়নি। অগত্যা অগস্ত্য-র তৃষ্ণা নিয়েই জারি থেকেছে এগিয়ে চলা।

পিছনে মোটা দড়ির মতো এঁকেবেঁকে পড়ে থেকেছে আমাদের পায়ের ছাপ। ছাপগুলো ক্লোজ ভিউতে যতটা না দৃষ্টিনন্দন, লংশটে কিছু অনবদ্য লাগে। তুষারাবৃত জমিতে পড়ে থাকা সারি সারি পদচিহ্ন যেন ফেলে আসা 'সময়', হারিয়ে ফেলা বিগত 'অতীত'। যেখানে অবহেলায় পড়ে আছে কত সাধারণ মানুষের কত অসাধারণ মুহূর্তের গল্প। আসলে ভাবলে অনেক ভাবেই ভাবা যায়। পাহাড়ের ক্যানভাসে তুমি কতটা রং খুঁজে পাবে, কতটা রংমিলান্তি খেলায় মাতবে, সে বড়ো নিজস্ব ব্যাপার। তাই পৃথিবীখ্যাত অভিযাত্রীদের বক্তব্যেও ধরা পড়ে তাঁদের দেখার চোখ, বোধের ভাঁড়ার আর পাহাড়ের আলোয় তোলা একান্ত 'নিজস্বী'।

মাঝখান থেকে সরে এসে পথ আবার বামপন্থী। আবার বর্ফিলি পাহাড়ের গায়ে গায়ে প্রতিবেশী হয়ে উদ্যত আমাদের লক্ষ্যভেদী গমন। বাঁদিক থেকে ঢালু হয়ে ডানদিকে গড়িয়ে এসেছে রেশমি তুষার পথ। সেই পথ ধরে ট্রাভার্স চলাকালীন মাথা তুলে সোজা তাকালে সুনীল নির্মল অম্বরীষ জুড়ে দুধসাদা ঊর্মিমালার বাধাহীন বিচরণ, যেন টোটাল ফ্রেমটায় নিঃশব্দে নিয়ে এসেছে এক ঋদ্ধ বৈপরীত্য। এই অনিন্দ্যসুন্দর ফ্রেম-এ মাঝেমধ্যেই ঢুকে পড়েছে পাহাড়ি হিমেল হাওয়ার বালিকা সুলভ চপলতা। বাইবেলে লেখা আছে — "Love is stronger than death". কথাটার মর্ম বোধহয় পাহাড়ি পথেই সম্যক উপলব্ধি হয়। আর হয়তো এই কারণেই মৃত্যু, বিপদ, যন্ত্রণা সব সহ্য করেও পাহাড়ের অনন্ত ভালোবাসায় জড়িয়ে পড়েন কিছু মানুষ। তাঁদের ভালোবাসার হিসাব হয়তো আর পাঁচটা সাধারণ মানুষ মেলাতে পারেন না।

— "ওঁও ... ওঁও ... ওঁও ...", আমার রুকস্যাকটা ধরে টান দিচ্ছে

পোর্টার রাজু।

এটাই ওর স্বাভাবিক এক্সপ্রেশন। প্রথমে বুঝতে পারিনি। তারপর ওর দৃষ্টির গতিপথ অনুসরণ করে যা দেখলাম তাতে মনজুড়ে উঠে এল একবুক খুশি।

জলের সন্ধান পাওয়া গেছে। ডানদিকে অল্প নীচে দেখা মিলেছে ছোটো একটা হিমবাহ সরোবরের। ধূ ধূ বরফের মরুভূমির মাঝে এ যেন এক চিলতে মরুদ্যান। আমাদের বহু আকাঙ্ক্ষিত।

সরোবরের অনেকাংশই বরফে ঢাকা। কিছুটা অংশ বরফমুক্ত, সেখানেই তিরতির করে বইছে স্বচ্ছ অন্তঃসলিলা।

জলপানের বিরতিতে ক্ষণিকের বিরতিও মিলেছে টিম মেম্বারদের। পোর্টারদের নিয়ে আসা বরফগলা জল গলায় ঢেলে মনে হল যেন কতকাল তৃষ্ণার্ত ছিলাম। বটলটাও ভরে নিয়েছি জলে।

এই অবসরে পোর্টার মদনের দু-চোখে আর একবার আইড্রপটাও দিয়ে দিয়েছি।

আকাশের ছটফটে যৌবনের দিপ্তী এখন কিছুটা হলেও ফিকে। সে জায়গায় দখল নিয়েছে গম্ভীর প্রৌঢ়ত্ব। সাদা মেঘের অনায়াস পায়চারী কমে গিয়ে ঘিরে ধরেছে ধূসর মেঘের থমকে থাকা গাম্ভীর্য।

এবার চড়াই-এর পথ। চড়াই বেয়ে কিছুটা উঠে আসার পর চোখে পড়েছে সুজল সরোবর। প্রখ্যাত পাহাড়ি সুজল মুখার্জীর নামেই সরোবরের নামকরণ। আর একটা নামও অবশ্য আছে — মাইন্দাগালা তাল। সরোবরে জল প্রায় নেই, পুরোটাই বরফে ঢাকা। মেঘে ঢাকা অঞ্চলটায় কম আলোর কারণে ছবি ভালো আসেনি।

কেন জানি না আজ আর মেঘেদের ভ্রূকুটি কিংবা চড়াই-এর চোখরাঙানি কোনোটাই মনের ওপর কোনো প্রভাব ফেলেনি। দ্রুত পায়ে চলাটা আমার একটা অভ্যাস, কারুর কাছে আবার বদভ্যাস। ফিজিক্স-এর টিচার চন্দন দেবনাথ পারাংলা ট্রেক শেষে ফেরার পথে কোরজোক গ্রামে নেমে ঈষৎ মদ্যপান করে একবার আমায় বলছিল, "আমাদের ডাক্তার তো প্রায় দৌড়োয়, ওর ভয় আমরা যদি ওকে ফেলে চলে যাই"।

আসলে পাহাড়ে প্রত্যেকের নিজস্ব একটা গতি আছে। সেই গতিতে

বাধা পড়লেই পারফরমেন্সে ছেদ পড়ে। ব্যাপারটা নিয়ে সলিলদার সঙ্গে আলোচনায় সময়, দাদার ইনপুট ছিল, "তুমি তোমার নিজের স্পিড মেনটেইন করবে। কে কতটা এগোলো বা কে কতটা পিছাল সেটা তুমি দেখবেই না"।

চড়াই ধরে উঠতে উঠতেই পথ বেঁকেছে বাঁ দিকে। বিশাল কড়াই-এর মতো শেপ-এর জায়গাটা ঈষৎ আবছা হয়ে আছে কুয়াশা আর মেঘের প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয়ে। তবু তার মধ্যেই ঠাহর করা যাচ্ছে পুরো অঞ্চলটা জুড়ে যেন শ্মশানের স্তব্ধতা। চারদিকে পাহাড়ের ঘেরাটোপ থাকায় হাওয়ার শব্দও প্রায় নেই বললেই চলে। এই সমস্ত রুটে প্রায়শই 'নিঃসীম শূন্যতা' ব্যাপারটা ভীষণ কমন। তবু তারই মধ্যে কিছু জায়গার স্তব্ধতা কেমন যেন হাঁ করে গিলতে আসে। অভিধান থেকে উঠে এসে 'নীরবতা' শব্দটা স্নায়ুতন্ত্রে শীলমোহর ফেলে যায় নিয়তির মতোই।

আমার থেকে চল্লিশ পঞ্চাশ গজ দূরে তুষারের মাঝে বুক চিতিয়ে থাকা একটা কালচে খয়েরি বোল্ডারের কাছে থেমেছে মঙ্গল। মদন আর দলজিৎ বাদে বাকি পোর্টাররাও থেমেছে ওখানেই।

— "আও ডক্টর সাব, থোড়া আরাম কর লো, তুমহারা দোস্তলোগ আভি পিছে হ্যায়", আমি বোল্ডারের কাছে যেতে মঙ্গলের গলা ভেসে এসেছে।

বোল্ডারটা পিছল। আমি একটু ঘুরে ওটার ওপর চড়ে আয়েস করে বসেছি। আমার চারপাশ জুড়ে মঙ্গল আর ওর দলবল।

— "মওসম্ বিগড়নে বালা হ্যায়, অ্যায়সে যানে সে পাস্ কে উপর চড়না মুশকিল হোগা", আমার টিমমেটদের ওপর মঙ্গল-এর স্পষ্ট বিরক্তি।

কারণটা অবশ্য আমার কাছে স্পষ্ট হয়নি। এক আধ দিন প্রত্যেকেরই পারফরমেন্স একটু-আধটু এদিক-ওদিক হয়। যদিও কথা বাড়াইনি।

হাত বাড়িয়ে মহাবীর-এর কাছে থেকে জলের বোতলটা চেয়ে ঢক্‌ঢক্ করে গলায় ঢেলেছি। একটানা এসেছি। কিছুটা ক্লান্তি এসেছিল। জলটা পেয়ে আবার আমি চাঙ্গা।

টিমের বাকিদের দেখা যাচ্ছে। এখনও বেশ কিছুটা দূরে। বিশাল প্রান্তরের মাঝে মেঘ ঢাকা এক অদ্ভুত ঘোলাটে হলুদ আলোয় পিঁপড়ের মতো ছোটো ছোটো লাগছে টিম মেম্বারদের। তাও সবাইকে এখন দেখা যাচ্ছে না। কেউ কেউ এখনও বাঁকের মুখে আসেনি।

ডানদিকে তাকালে কাচনি পাসের উন্মুক্ত চড়াই। তার ঠিক ওপরের আকাশটা জুড়ে জাফরানি আলোর এক মোহময় বিন্যাস। একমাত্র পাস-এর ওপরেই এই গোল্ডেন ইয়োলো আলোটা ছড়িয়ে আছে। আর প্রায় বেশিরভাগ অঞ্চল ঢেকে আছে ওই ঘোলাটে হলুদ আলোয়। কী অদ্ভুত বৈচিত্র। স্থান, কাল ভুলে হাঁ করে চেয়ে থেকেছি। রূপসীর আলস্য ভঙ্গের 'অংগড়াই' নিয়ে কত বৈচিত্র্যের মালা গেঁথেছে হিমালয়।

ডগলাস বাস্কে বলেছিলেন, "পাহাড়ের স্মৃতি হচ্ছে লাল সুতোয় বোনা অ্যালপাইন রোপ। অনেকদিনের ব্যবহারে বাইরের রোঁয়া উঠতে পারে, কিন্তু স্মৃতির 'কোর' নষ্ট হয় না"। আজও পাস-এর শীর্ষ জুড়ে আকাশের গায়ের ওই 'জাফরানি' রং আমার হৃদয় জুড়ে। স্মৃতিতে এতটুকু মরচে ধরেনি।

মুগ্ধতার আলস্যসূত্র ছিঁড়েছে মঙ্গল সিং-এর গলার আওয়াজে।

— "হামলোগ নেহি হোতে তো আজ তুমলোগ ইহাঁপর নেহি হোতে। সাচ বোলা না ম্যায়নে?" আমার দিকে চেয়ে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি দিয়ে মঙ্গল সিং-এর বক্রোক্তি।

কিছুটা অবাক হয়েই ওর দিকে চেয়েছি।

— "লেকিন দেখো হামলোগোঁকো ইজ্জত নেহি মিলতা। উ-ওসব তুমলোগোঁ কে নিয়ে", আমাকে ক্রমশ অবাক করেছে মঙ্গলের গলার স্বর, চাহনির ক্রুরতা।

— "হামলোঁগ হি রুট ওপেন করতা, রোপ ভি হোম হি ফিক্স করতা। থোড়া রুপিয়া মিলতা ইয়ে সাচ বাত। লেকিন ও হামারে পসিনে কে ওয়াস্তে কুছ নেহি", মঙ্গলের গলা ক্রমশ চড়েছে।

হঠাৎ-ই যেন পাহাড়, সমতল, সব জায়গায় যুগ যুগ ধরে চলে আসা 'ক্লাস ডিফারেন্স' এর আবশ্যিক বিবাদটা মঙ্গলকে চেপে ধরেছে। মাথা নীচু করে আইস অ্যাক্সটা ক্রমাগত ঠুকে চলেছে বোল্ডারের নিশ্চল কাঠিন্যে। অনেক দিনের জমে থাকা রাগ যেন উগরে দিচ্ছে প্রতিটি আঘাতের নির্মম নির্যাসে।

— "মান লিয়া, সাহি বাত বোলা", আমি মঙ্গলের পিঠে আলতো হাত রেখেছি।

ওর বক্তব্যটা অস্বীকার করার নয়। এক সময় সমতলের শিক্ষিত লোকেরা অনেক নিঙড়েছে ওদের। শোষণের ইতিহাসটা নেহাত কম লম্বা নয়। আর

হিমালয়ের অন্দরমহলে দাঁড়িয়ে সেই শিক্ষিত শ্রেণির প্রতিভু হিসাবে, শোষিত শ্রেণির প্রতিনিধির হাতে সপাট চড় খাওয়ার অনুরণনটাও লাইফ টাইম আমার মেমোরিতে থেকে যাবে।

আমি আর কথা বাড়াইনি। মিথ্যে সান্ত্বনা দেওয়াটাও অবান্তর মনে হয়েছে। সঙ্গে রুটের মধ্যে সমব্যথী হয়ে, ওর ক্ষতটা উসকে দেওয়াটাও সমীচীন মনে হয়নি।

— "মান তো লেনা হি হোগা দাদা। দেখো না তুমহারে ইয়ে টিম পানপাতিয়া কর হি নেহি সাকতা, ম্যায় নেহি হোতা তো। লেকিন কিতনা পয়সা মিলা মেরেকো?" মঙ্গলের রীতিমতো উষ্মভরা প্রশ্ন।

কেন জানি না, এতক্ষণ আন্তরিক সমব্যথী হয়েই মঙ্গলের ভেতরটা বোঝার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু ওর শেষ তীরটা আমার হজম হয়নি। রুটে ওর প্রচুর গাফিলতি আছে। অনেক জায়গায় রোপ ফিক্স করার প্রয়োজন পড়লেও তা করেনি। তবু টিমের কেউ ওকে সেভাবে কিছুই বলেনি। তারওপর টিমের পারফরমেন্স ও যথেষ্ট ভালো।

— "তুম যো পয়সা মাঙ্গে থে, হামলোঁগ ওহি তো মান লিয়া, আভি অ্যায়সা বাত করণে সে ফায়দা কেয়া?" মঙ্গলের দিকে সরাসরি চেয়ে আমার বিরক্তি ভরা প্রশ্ন।

— "ও তো ঠিক বাত্, লেকিন ...", মঙ্গল পুরোটা শেষ করতে পারেনি। আমি হাত তুলে ওকে থামিয়েছি।

— "বহত দিন তক্ তুমহারে সাথ যো হুয়া, ও তো ম্যায়নে মান লিয়া, লেকিন আভি রুট কে অন্দর ইয়ে সব বোলনে সে ফায়দা কেয়া? তুম কেয়া ঘাপলা চাহতে হো", আমার গলার বিরক্তি কয়েক পর্দা চড়েছে।

আমার বলার ভঙ্গি বা কণ্ঠস্বর মঙ্গলকে কোথাও অবাক করছে সেটা ওর মুখচোখে স্পষ্ট।

— "তুম শেরপা, গাইড লোগোঁকো এক অলগ ইজ্জত হ্যায়, উসকো টাল না মাত", নিজেকে সংযত রেখেই কথাগুলো বলেছি।

কেন জানি না, তবে শেষ কথাটায় মঙ্গল আমার দিকে একবার চেয়ে চুপ করে গেল।

মাঝখান থেকে আমার মেজাজটা গেল খিঁচড়ে। বোল্ডারের ওপর চিত

হয়ে শুয়ে আকাশের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে একসময় চোখ বুজেছি বিরক্তিতে।

বিশু আর সুমন প্রায় একসঙ্গেই এসেছে। বাকিরা কিছুটা দূরে হলেও প্রায় চলে এসেছে। আকাশের অবস্থা ভালো নয়।

আমি আর দেরি করিনি। পিছনে হেলান দিয়ে রাখা রুকস্যাকটা পিঠে নিয়ে বোল্ডার থেকে হড়কে নেমেছি।

— "থোড়া আরাম করলো, উসকে বাদ সব আ যাও, দের মাত কর না", মঙ্গলের গলার স্বর এখন অনেক নরম।

মঙ্গল সিং পা বাড়িয়েছে কাচনী পাসের দিকে। কয়েকজন পোর্টার এর সঙ্গে আমিও স্টার্ট নিয়েছি। অদ্ভুত একটা রাগ এফোঁড় ওফোঁড় করছে ভেতরটা। পাহাড়ের পথে নিজেকে প্রমাণের একটা ধারালো জিদ ক্রমশ ঘিরে ধরেছে আমায়।

বোল্ডার থেকে দশ বারো ফুট মতো জায়গা পেরোনোর পরই আচমকা শুরু হয়েছে পাস-এ চড়ার কঠিন চড়াইটা। মঙ্গলের পায়ে কোফলাস, হাতে আইস অ্যাক্স, তার সঙ্গে ওর সহজাত পাহাড়ি পা। চড়াই পেরোনোটা ওর পক্ষে তুলনামূলক সহজ হচ্ছে। কিন্তু ওই যে জেদ, ওটাই আমার আজকের "এক্স ফ্যাক্টর"।

একসময় পিছন ফিরে দেখেছি বাকি টিম মেম্বাররাও স্টার্ট করেছে।

কিছুক্ষণ পর আমি আর মঙ্গল সিং ছাড়া আমাদের সঙ্গে আসা পোর্টাররাও পিছিয়ে পড়েছে। মাঝখানে মঙ্গল দু-একটা কথা বলেছিল, উত্তর দিইনি। হাপরের মতো বুকটা ওঠানামা করছে। জিভটা শুকিয়ে ভারী লেগেছে। মুখে থুথু শুকিয়ে আঠার মতো হয়েছে। কিন্তু চড়াইটা পেরোতে গিয়ে খুব কমই থেমেছি। আসলে ভেতর থেকে উঠে আসা 'জিদ'টাই সম্বল। ওটা না থাকলে জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই নিজেকে ছাপিয়ে যাওয়া পারফরমেন্স হয় না। পাহাড়ে এরকম আর একটা ঘটনা আমার আজও মনে পড়ে।

২০০৩ সালে অন্নপূর্ণা বেস ক্যাম্প যাবার পথে ছমরং-এর চড়াই পেরোচ্ছি। ওই রুটে ওটাই সবচেয়ে কঠিন চড়াই। একসময় আমি আর একটা ব্রিটিশ ছেলে একসঙ্গে উঠছিলাম। বাকিরা পিছনে। ক্রমশ 'ওঠা' ব্যাপারটা একসময় 'টক্কর'-এ পরিণত হল। একে দুশো বছর পদানত করে রাখার ব্যাপারটায় ইংরেজদের আমার সহ্য হয় না, তারওপর পাহাড়ের পথে একটা

লালমুখোর কাছে হেরে গেলে, পৌরুষে বড্ড ধাক্কা লাগত। বয়সটা তখন অনেকটা কম। 'লড়কে লেঙ্গে' মনোভাবটাও কথায় কথায় ছিটকে বেরিয়ে আসত। আদতে পুরো ব্যাপারটার মধ্যে 'ছেলেমানুষী' শব্দটা মনোজগতে নিঃশব্দে অন্তরীণ থাকত। শেষমেষ নাক উঁচু ব্রিটিশ জাতকে পেরিয়ে চড়াইটা প্রথমে ক্রশ করছিল এই নাকবোঁচা ভেতো বাঙালিই। এবং তারপর ওদের টিমের বয়স্ক মেম্বারটি আমার হাতে ওয়ার্ল্ড কাপ তুলে দেবার ভঙ্গিতে বিয়ারের একটা আস্ত বোতল তুলে দিতে গিয়েছিলেন। কিন্তু আমি 'খাই না' বলাতে প্রথমে প্রচণ্ড অবাক তারপর প্রচণ্ড হাসিতে ফেটে পড়েছিলেন। মুহূর্তগুলো আজও অমলিন।

আজকের ব্যাপারটা অনেকটাই আলাদা। কিন্তু পুরানো জেদটা এখনও মরেনি দেখে নিজের ওপর ভরসা হল। মঙ্গলের প্রথম দিকের কথাগুলো আমি ফেলতে পারিনি। যুক্তি সহকারে মেনে নিয়েছিলাম। কিন্তু টিম মেম্বারদের ছোটো করার অহেতুক প্রবণতাটা মানতে পারিনি। মঙ্গল ব্যাপারটা বুঝেছে। পাসে ওঠার প্রায় শেষদিকে একটা ন্যারো জোন্-এ রাইট টার্ন ছিল। ও স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই হাত বাড়িয়েছে। ওদের সহজিয়া পাহাড়ি মন অনেক কিছুই সহজে ভুলে যায়। আমি তো শহুরে শিক্ষিত জিলিপি, অমৃতি। জটিল মনের কুটিল রাসায়নিক সমীকরণ কি অত সহজে সলভ হয়! হাতটা বাড়াইনি, নিজের পা-এর ওপরই আস্থা রেখেছি।

আসলে আমার আজকে ওই ইঁদুরটার মতো অবস্থা। একটা পিপের ছ্যাঁদা দিয়ে হুইস্কি বেরোচ্ছিল। ইঁদুর ব্যাটার তাই চুক চুক করে খেয়ে হয়ে গিয়েছে নেশা। লাফ দিয়ে পিপের ওপর উঠে আস্তিন গুটিয়ে বলে উঠছে, "ওই ড্যাম ক্যাট-টা গেল কোথায়? ব্যাটাকে ডেকে পাঠাও, আমি ওর সঙ্গে লড়ব।"

ইঁদুরের মতো আমারও মাথায় ছিল না লড়াইটা অনেক শক্তিধর এক অপোনেন্ট-এর সঙ্গে। সে মঙ্গল সিং নয়, 'হিমালয়'।

আজও সুমনের তোলা একটা ছবি মাঝেমধ্যে দেখি। বেশ অনেকটা ওপরে পাস-এর প্রায় কাছাকাছি মঙ্গল সিং আর আমি। আর বেশ কিছুটা নীচে চড়াই-এ সারিবদ্ধ গোটা টিম। ছবিটা দেখি আর ভাবি, ভাগ্যিস হিমালয় সেদিন আমার আমার ইজ্জতে টান দেয়নি। মুচকি হেসে কড়ে আঙুলটা নাড়ালেও কাপড়ে চোপড়ে হয়ে যাওয়াটা অনিবার্য ছিল এই শ্রীমানের।

অহেতুক বিনয় দেখিয়ে লাভ নেই। 'শীর্ষ' ছোঁওয়ার প্রকট না হোক একটা প্রচ্ছন্ন গর্ব সকলেরই হয়। পাসে ওঠার পরেই সেই 'গর্ব'টা রুটিনমাফিক হ্যান্ডসেক করতে এগিয়েও এল আমার কাছে। কিন্তু করমর্দন পর্বটা শেষ হবার আগেই ঘটে গেল একটা আকস্মিক ঘটনা।

— "আরে তু তো ডক্টর নেহি, কালাকার হ্যায়", বড়ো বড়ো অবিন্যস্ত পিলা পিলা দাঁতের সারি মেলে ধরে একমুখ হাসিতে আমাকে জড়িয়ে ধরেছে মঙ্গল সিং।

আমি কিছুটা হতচকিত, কিছু বিড়ম্বিত।

— "জয় বদ্রীবিশাল কী জয়", আমাকে জড়িয়ে রেখেই মঙ্গলের কান ফাটানো জয়ধ্বনি।

প্রকৃতির কোলেই জন্ম। প্রকৃতির কোলেই বেড়ে ওঠা। আদতে এদের মানবজমিনটাই বড়ো সহজ। হৃদয় খুঁড়ে বিরক্তিটাও যেমন এদের সহজে ছিটকে আসে, হৃদয়জোড়া ভালোবাসাও ঠিক তেমনি সহজে আগ্নেয়গিরি হয়।

দুপুর একটা নাগাদ পাস-এ উঠে এসেছে সব্বাই। শেষ পাস ক্রস করার পরীক্ষায় পাশ করার আনন্দে গোটা টিম জুড়ে এখন খুশির হাওয়া।

সলিলদা সিগারেট খায় না, ওই ন-মাসে ছ-মাসে একটা। সেও বলেছিল শেষ পাস ক্রস করার পর একটা সিগারেট ধরাবে। সলিলদা সত্যিই ভদ্রলোক। 'ভদ্রলোকের এক কথা' আপ্তবাক্যটার যথার্থ মর্যাদা দিয়েছে। গাঁজার কলকে ধরার পদ্ধতিতে সিগারেটটা মুঠোর মধ্যে প্রায় অদৃশ্য করে, দিয়েছে বেশ কয়েকটা লম্বা সুখটান। ছবিটা ক্যামেরাবন্দী করতে ভুল করিনি। এইসব ছবিগুলো আদতে এক-একটা মুহূর্তের সাক্ষী। ফোটোগ্রাফির গ্রামার দিয়ে ছবিগুলোর মূল্যায়ন অবান্তর। প্রতিদিনের একঘেঁয়ে রোজনামচা, পরিস্থিতির প্রাত্যহিক নিঃশব্দ ধর্ষণ, ধোঁয়া ধুলোর বিষাক্ত দাম্পত্যে ভরে থাকা আধুনিক জীবনযাত্রা পেরিয়ে, এক নিষ্কলুষ অনন্তকে সজোরে বুকে আঁকড়ে ধরার 'মুহূর্ত' কোনোদিন ব্যাকরণ মানে না।

প্রকৃতি নীরবে ক্ষমার দৃষ্টিতে মেনে নিয়েছে অকিঞ্চিৎকর কিছু মানবজমিনের বালখিল্য ধৃষ্টতা।

পাহাড়ের আর একটা নাম বোধহয় মায়াপুর হওয়া উচিত। আবহাওয়া কখন যে একান্ত রাগ অনুরাগে পুরো অঞ্চলটার চালচিত্র বদলে দিয়েছে, সাফল্যের

ঠুনকো উচ্ছ্বাসে তা খেয়াল-ই করিনি। চারদিক জুড়ে দুর্গম শৈলশিখরের স্তব্ধ তুষার আরও অভিমানী হয়েছে ধূসর মেঘরাজির বেহিসাবি পরকীয়ায়।

আর এহেন শৌভিক মায়া জড়ানো আবছায়া পরিবেশে, এই মায়াপুর আমাকে জড়িয়ে ফেলেছে নিঃসঙ্কোচ এক মায়ার বাঁধনে।

ঠান্ডা হাওয়ার একটা স্রোত ভেসে আসছে উত্তর দিক থেকে। হাওয়ার বেগটা ছিলই, এখন যে তা বেড়েছে তা স্পষ্ট। আর উত্তর দিক থেকেই ধূসর মেঘগুলো পঙ্গপালের মতো ধেয়ে এসে ক্রমশ ঢেকে ফেলছে 'দক্ষিণের বারান্দা'।

এরকম পরিস্থিতিতে 'দক্ষিণের বারান্দা'য় দাঁড়িয়ে হাওয়া খাওয়ার বিলাসিতা দেখাতে রাজি নয় কেউই।

শুরু হয়েছে পাস থেকে নামার পালা।

অবতরণের পথ কিন্তু বেশ সোজা, অন্তত চোখের সামনে পড়ে থাকা তুষার জমি সেরকমই ইঙ্গিত দিচ্ছে। তবে আমাদের যে সেই ইঙ্গিতটা ধরতে ভুল হয়েছিল সেটা বুঝেছি একটু পরে এবং রীতিমতো মাশুল দিয়েই।

হলদে ধূসর ঘেঁষা একটা চাপা আলো ছেয়ে আছে গোটা অঞ্চলটায়। একসময় সেটাও প্রায় চলে গেছে, শুরু হয়েছে স্নোফল। তারমধ্যেই নরম তুষারে পা ফেলে এগিয়েছি আমরা। মঙ্গল সিং আর স্বর্ণেন্দু আগেই এগিয়ে গেছে। কম আলোয় ওরা আমাদের দৃষ্টিপথের বাইরেও চলে গেছে। সলিলদা, সুমন, বিশু আর আমি একসঙ্গেই হেঁটেছি বাকি পথ। শঙ্খদা আর বউদি কিছুটা পিছনে।

— "ডাক্তার, তাহলে শেষ পাসটাও পেরিয়ে এলাম কী বলো", আমার ডানদিকে প্রায় পাশাপাশি চলতে থাকা সলিলদার বেশ তরতাজা গলা।

আমি হেসে সম্মতি জানিয়েছি।

— "চলো আবার হয়তো একবছর পর", হাসিমুখে বললেও সলিলদার গলায় হালকা বিষাদের ছোঁয়া।

কী উত্তর দিয়েছিলাম, আজ আর তা মনে নেই। মনে থাকার কথাও নয়। কারণ পরমুহূর্তেই পিছন থেকে যে চিৎকারটা ভেসে এল আর ঘাড় ঘুরিয়ে যা দেখলাম তাতে সবকিছু ভুলে যাওয়াই স্বাভাবিক।

সলিলদা আর আমার পিছনেই সাত আট ফুট মতো তফাতে আসছিল সুমন আর বিশু। আমরা আড়াআড়ি প্রায় পাঁচ ছয় ফুটের মতো চওড়া স্নো জোনটার ডানদিক ঘেঁষে এগোচ্ছিলাম আর বিশু ঠিক উলটো অর্থাৎ বাঁদিকটা।

ছেলেটা বামপন্থায় বিশ্বাসী তাই এটাই হয়তো ওর স্বাভাবিক পথ। কিন্তু এক্ষেত্রে ওর বামপন্থা ওকে বিট্রে করেছে। প্রায় বুক অবধি ঢুকে গেছে ওর শরীরটা একটা বরফ ফাটলের মধ্যে। প্রাণান্তকর টানা হ্যাঁচড়াতে নিজেকে বার করে আনার একটা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে কিন্তু ফল হচ্ছে উলটো। শরীরটা আরও সেঁধিয়ে যাচ্ছে তুষারের মসৃণ অথচ কালান্তক জ্যামিতিতে।

কথায় বলে না, 'একে রামে রক্ষে নেই, সুগ্রীব দোসর'। সাসপেন্স থ্রিলারের মতো ভাঁজে ভাঁজে থ্রিল। সুমন এগিয়ে এসেছিল রেসকিউ করতে। বিশুর থেকে ফুটখানেক দূরত্বে আসতে না-আসতেই একইভাবে মাখনের মতো ওর শরীরটা তলিয়ে গেল তুষার গহ্বরে। পোর্ট্রেট ফোটোগ্রাফিতে মাথার সঙ্গে বুকটা যতটা ফ্রেম করা হয় তার থেকে ইঞ্চি দুয়েক বেশি বোধহয় মাটির ওপর জেগে রইল ব্যারাকপুরের সুমন কুণ্ডু।

লেখা তো দূরের কথা, মুখে বলতেই যেটুকু সময় লাগে তার চেয়ে অনেক কম সময়েই ঘটে গেছে বিশু আর সুমনের 'পাতাল প্রবেশ'। বলে না, 'অল্প শোকে কাতর, অধিক শোকে পাথর', আমাদেরও একই অবস্থা। ঘটনার আকস্মিকতা কাটিয়ে রিফ্লেক্স কাজ করতেও তো কয়েকটা লহমা লাগে।

অভিজ্ঞ পাহাড়ি সলিলদাই এগিয়েছে আগে। হাতের আইস অ্যাক্সটা দিয়ে দুজনের গায়ের থেকে কয়েক ইঞ্চি দূরের বরফে প্রায় স্কোয়্যার ফর্মে কয়েকটা মসৃণ কোপ চালিয়েছে চোখের পলকে। হাত লাগিয়েছি আমিও। খোঁড়াখুঁড়ি আর টানাটানির ভজকট যুগলবন্দীতে একসময় উঠেও এসেছে দুই কীর্তিমান।

স্নো ফলের বেগ কমলেও পুরোটা থামেনি। ঝরে যাচ্ছে ঝির ঝির করে।

— "এদের ন্যূনতম সেন্স নেই", সলিলদার গলায় রীতিমতো উষ্মা।

আমার গোবর মেশানো গ্রে ম্যাটার সলিলদার বক্তব্যটা ক্যাচ করতে একটু সময় নিয়েছে। প্রথমে ভেবেছি দাদার বক্তব্যের লক্ষ্য বোধহয় সুমন আর বিশু। কিন্তু রুটে একটা সময় স্বর্ণেন্দুকে দেখতে পেয়ে সলিলদার বাক্যবাণ-এ বুঝলাম, তীরটা ছিল স্বর্ণেন্দু আর মঙ্গল-এর দিকেই।

— "তুমি একটা অ্যাডভান্স কোর্স করা ছেলে। তোমার বোঝা উচিত ছিল টিমের দুটো আইস অ্যাক্স, মঙ্গল আর তোমার কাছে। তোমরা দুজনেই কি করে পুরো টিমটাকে ফেলে আগে এগিয়ে গেলে?" স্বর্ণেন্দুকে লক্ষ্য করে সলিল মৈত্র-র যৌক্তিক বিরক্তি।

স্বর্ণেন্দু ওর আর্মির বুদ্ধিতে যতটুকু কুলোয় তাই নিয়ে একটা তিতুমিরের যুদ্ধ করার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছিল। ফলপ্রসূ হয়নি সলিলদার কামানের ঘায়ে।

এক্সপেডিশানে অবশ্য এইসব ব্যাপারস্যাপার একটু-আধটু ঘটে থাকে। 'ছবি' হয়ে গেলে আলাদা কথা, না-হলে পরবর্তীকালে এইসব নিয়ে খুব বেশি আর কেউ মাথা ঘামায় না। যে ঘামায় তার জন্য কলকাতায় নরম বিছানা আর পাশবালিশ তো আছেই। হিমালয় নামের এক আদিম বিশালত্বের গহীনে পা দিলে এইসব ধাক্কা, 'জোর কা ঝটকা ধীরে সে লাগে' এভাবেই নেওয়া ভালো।

সীতা সতী সাধ্বী ছিলেন। তাঁর পাতাল প্রবেশ মহাকাব্যিক ঘটনা। কিন্তু কলকাতার দুই ছিঁচকে বেমালুম বলা নেই কওয়া নেই পাতালে চলে যাচ্ছিল, এটা বোধহয় হিমালয়ের আনপ্রেডিক্টেলবল আবহাওয়ারও সহ্য হয়নি। এতক্ষণের ছিঁচকাদুনে পরিবেশ বেমালুম বদলে গিয়ে বেলাবেলি ভদ্রলোক হয়ে গেছে। রোদের ঝকঝকে 'শোম্যানশিপ' না-থাকলেও ভিসিবিলিটি অনেকটাই স্পষ্ট। শুভ্র তুষারের তরঙ্গায়িত সীমাহীন এক অঞ্চল ছড়িয়ে আছে যাযাবরের মতো এক নির্মোহ ঔদাসীন্যে। আশেপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা শৃঙ্গরাজির উপস্থিতি যেন ইজিচেয়ারের নিশ্চিন্ত বিশ্রাম, স্থির অথচ বাঙ্ময় উপস্থাপনা। পুরো মেহেফিল জুড়ে যেন ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াত-এর মৌনমুখর চলাচল, "এই বিরাট বিশ্বসংসার কোন নিয়মে চলে, কী করলে ঠিক কর্ম করা হয় এসব বোঝা তোমার আমার সাধ্যের বাইরে। অতএব যে দুদিন এ সংসারে আছ সে দুদিন ফূর্তি করে নাও; মরার পরে কে কোথায় যাবে, কি হবে না হবে তার কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই।"

বাকি পথ নিরুদ্রপেই কেটেছে। আর একটা চড়াই পেরোনোর পর তুষারের গভীরতা এবং পরিমাণ কমতে কমতে একসময় প্রায় শূন্যে এসে ঠেকেছে। টানা এতদিন ধরে চারদিক জুড়ে তুষারের 'মনোটনি' পেরিয়ে ধীরে ধীরে ঢুকে পড়েছি সবুজের সজীবতায়। কিছুটা পাথুরে এবড়োখেবড়ো জোন ক্রস করে একসময় বাঁদিকে টার্ন নিয়েছি। আর বাঁক নেওয়ার পরেই প্রত্যাশার চেয়ে আরও অনেক বেশি কিছু আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল।

পথ যেদিকে গেছে তার ঠিক বাঁদিকে বেশ কিছুটা নীচে সবুজে ঘেরা এক অনুপম উপত্যকা। ওখানেই পিচ করা হয়েছে আমাদের টেন্টগুলো। সবুজ ঘাসের কার্পেট, কালচে বাদামি পাথরের মোজাইক, হলুদ ফুলের অলঙ্করণ

আর চারদিক ঘেরা পাহাড়ের অভিভাবকত্বের মাঝে, ঝুলে থাকা দোলনার মতো চোখ জুড়িয়ে যাওয়া এক বুগিয়াল। বাকিরা এগিয়ে গেলেও সুমন, আমি আর বিশু দাঁড়িয়ে গেছি একটা সংকীর্ণ উঁচু জায়গায়। সেখান থেকে উপত্যকার নির্ভেজাল রূপটা তারিয়ে তারিয়ে নিশ্চিন্তে উপভোগ করেছি।

শেষ বিকেলের মেঘের জাফরি ছুঁয়ে আসা নিঃস্বার্থ এক প্রেমিক আলো, ছড়িয়ে আছে গোটা উপত্যকা জুড়ে। ভালোলাগা বা ভালোবাসার তো কোনো নির্দিষ্ট গতিপথ নেই। সে নদীর মতোই আপন খেয়ালে আপন খাতে বয়ে যায়। সুমন আর বিশুও মোহাবিষ্টের মতো দাঁড়িয়ে থেকেছে। মাঝেমধ্যেই মেঘের একটা পাতলা সর বয়ে গেছে উপত্যকার শরীর ছুঁয়ে। পরিবেশ হয়ে উঠেছে আরও অনিন্দ্য, আরও রহস্যময়।

সমকামী অসকার ওয়াইল্ড তাঁর বয়ফ্রেন্ড বেসি-র উদ্দেশ্যে এক দীর্ঘতম প্রেমপত্র বা ঘৃণাপত্র লিখেছিলেন — 'De profundis'। সেখানে এক জায়গায় অসকার-এর হৃদয় নিঙড়ানো কিছু শব্দবন্ধ ছিল, "প্রকৃতিই দান করেছে সেই সব গোপন উপত্যকা যার নিটোল নিস্তব্ধতায় বিঘ্নিত হবে না কখনও কোনোদিন আমার হৃদয়ের কান্না"।

আমি নাচার, এই উদ্ধৃতিটা আমাকে দিতে হল। না-হলে বোঝাতে পারতাম না সেই সময়ে ছিটকে আসা আমার অনুভূতির আকরটুকু।

বিকেল সাড়ে চারটেয় নেমে এসেছি উপত্যকার কোলে। কিছুক্ষণ চারদিক চুপচাপ চেয়ে দেখে ঢুকে গেছি টেন্টে।

আজকে চা-এর জায়গায় কফি। কে তৈরি করেছে জানি না, তবে যেই করুক বানিয়েছে খাসা। একেবারে "কফি উইথ হিমালয়া"। আমি, কফি আর প্রকৃতি, সেলিব্রেশানের জন্য আজ আর অন্য কিছু নেহাতই অকিঞ্চিৎকর।

বিকেল ঢলেছে সন্ধেয়। নিভে গেছে সূর্যাস্তের আগুন। মাথার ওপর নিঃশব্দে ফুটে উঠেছে তারাভরা আকাশের ক্যানভাস। চারদিক জুড়ে ঘিরে থাকা গিরিশ্রেণির আবছায়া শরীর অদম্য কৌতূহলে জরিপ করেছে আমায়। হিমেল হাওয়ার গায়ে পড়া আদিখ্যেতা, নিয়ে এসেছে তাদের মন কেমনের চিঠি।

সব চিঠির উত্তর হয় না।

দশম দিন
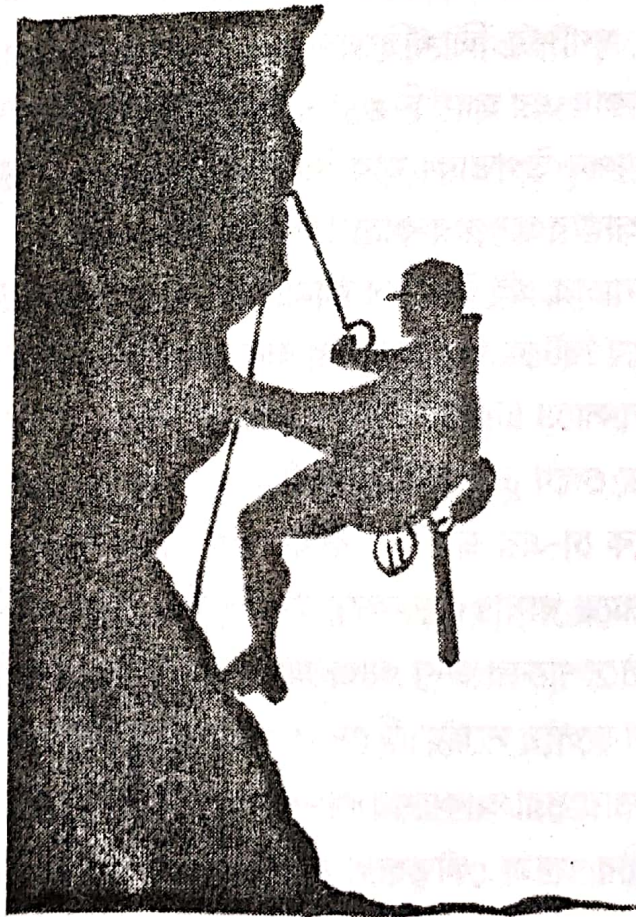
বহু মানবের হিয়ার পরশ পেয়ে,
বহু মানবের মাঝখানে বেঁধে ঘর,

... ...

তবুও একথা স্বীকার করিব আমি,
উপত্যকার নির্জনতার মাঝে
— শীতল শান্তি অসীম ছন্দে ভরা —
সেইখানে মম জীবন আনন্দঘন।
— রিয়োকোয়ান

ভোর হচ্ছে। উপত্যকা জুড়ে ধীরে ধীরে মূর্ত হচ্ছে প্রাণের স্পন্দন। ছোট্ট সবুজ ঘাসের দল, রূপসী হলুদ ফুলের দঙ্গল মহাখুশীতে দুলে উঠছে বাউন্ডুলে বাতাসের এলোমেলো ইচ্ছে ডানায়। কালচে প্রায় মসৃণ প্লেটের মতো পাথরগুলোর ওপর অনাঘ্রাত ভোরের শিশিরের টলটলে শুভচন্দন। ঘিরে থাকা আবছায়া পাহাড়শ্রেণির তরঙ্গায়িত চলন ক্রমশ স্পষ্টতর, প্রহরীর নিশ্চিন্ত নিরাপত্তার আক্ষরিক প্রতিশ্রুতিতে। সমস্ত বুগিয়াল জুড়ে নীরব অথচ নিশ্চিতভাবেই উন্মোচিত গেরুয়াগন্ধী পবিত্র এক নির্জন উষা। যার প্রতিটি পদক্ষেপে রিক্ততার অহংকার, বৈরাগ্যের সমর্পণ।

গিটারের টেনে ছেড়ে দেওয়া তারের শরীরে যেমন বেশ কিছুক্ষণ এক অসহায় রিনরিনে অনুরণন থাকে, ঠিক সেরকমই এক নগ্ন আবেগের ক্রমবর্ধমান আবিলতায় জড়িয়ে পড়ছি আমি। পূর্বদিকের গিরিশ্রেণির মাথার ঠিক ওপরেই গেরুয়া আর লালের মাঝামাঝি এক রঙে, কে যেন মোটা তুলি চুবিয়ে আড়াআড়ি আলগোছে ফুটিয়ে তুলছে জীবনের রং। আমি মুগ্ধ, বাকরহিত। বিমূর্ত ভালোলাগা টলোমলো পায়ে হেঁটে চলেছে মনের এ অলিন্দ, সে অলিন্দ। পৃথিবীর ভিজে পালকে লাগছে সূর্যের রক্তিম ঠোঁটের প্রথম ছোঁয়া। শুরু হয়ে গেছে শৃঙ্গ থেকে শৃঙ্গে সূর্যের উন্মুক্ত শিখরস্নান। ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে ওঠা এক অপার্থিব পৃথিবীর অযোগ্য সাক্ষী আমি।

ওয়াল্টার বোনাত্তি, তাঁর "The mountions of my life" বইতে উষাকালের এক অনবদ্য বর্ণনা দিয়েছেন, আল্পসের 'Piller d' angle'-এ 'এপিক' প্রথম শীর্ষ ছোঁয়ার অভিজ্ঞতায়, ভোরের প্রথম আলো চাক্ষুষ করার মুগ্ধতায় তাঁর অমলিন বক্তব্য, "The horizon showed up sharply, enchanted peaks plucked clean by the claws of a freezing and frenzied wind. When I looked out I saw the most

beautiful spectacle one can encounter at dawn on the peak of Mont Blanc : On the one hand the Italian flank flooded with warm and blazing light, on the other, the savoic still immersed in light."

আজ ২০ জুন, বুধবার। এক্সপেডিশান-এর শেষ দিন।

স্বপ্নের মতো পরিছন্ন একটা ভোর অজান্তেই নিকিয়ে দিয়ে গেছে মনের উঠোনটা। ভালোলাগাগুলো পরস্পর হাত ধরাধরি করে তৈরি করেছে এক নিরবচ্ছিন্ন 'অ্যাভিনিউ'। যে পথে আমার যুদ্ধ-ও নেই, প্রেম-ও নেই। অথচ এখানেই আমার সবচেয়ে বেশি মুখরতা। সদ্যোজাত যেমন স্তন্যদায়িনীর বুক থেকে দুধটুকু টেনে নেওয়ার সময় এক অপার শান্তির অবগাহনে নিস্তেজ হয়ে থাকে, পাহাড়ে আমার দশাও অনেকটা ওইরকমই হয়। প্রকৃতির অকৃপণ 'মহুয়া' টানা গিলতে গিলতে আমিও মাঝে মাঝে কেমন নিস্তেজ হয়ে পড়ি। বিশেষ করে রিস্কি জোন পেরিয়ে মোটামুটি সেফ কাস্টডি-তে ঢুকে এলেই এই কুঁড়েমি আমায় শীতের আলোয়ানের মতো ওম্ দিতে থাকে। তখন আর প্রতিদিন সকালে বস্তা কাঁধে পাহাড় ভাঙতে ইচ্ছে করে না। মনে হয়, কীসের এত তাড়া বাপু? দু-দণ্ড না হয় নরম সবুজ ঘাসের কার্পেটে রোদের দিকে পিঠ করে বসি, টাটিয়ে থাকা পায়ের গোছ দুটো দু-হাতে আয়েস করে টিপতে টিপতে ব্যথাভরা আরামের আমেজটা নিই। আধশোয়া হয়ে একদৃষ্টে বুঁদ হয়ে থাকি হাওয়া আর ঘাসফুলের উদ্দাম রোমান্সে কিংবা ট্র্যাকস্যুট-এর পকেটে হাত দুটো পুরে তাঁবুগুলো থেকে কিছুটা দূরে মনের আনন্দে চরে বেড়াই 'একা একেলা এ মন'। এককথায় একটু থিতু হয়ে গোরুর মতো অর্ধ-নির্মীলিত নয়নে জাবর কাটার বড়ো শখ হয়।

কিন্তু এই গরিবের শখের কথা আর শুনছে কে? পাহাড়ে এলেই আমার টিম মেম্বরদের জীবনের অভিধান থেকে 'রেস্ট ডে' শব্দদুটো বেমালুম হাওয়া হয়ে যায়। এবং হঠাৎই লোকজন ভীষণ রকম রবীন্দ্র অনুরাগী হয়ে পড়ে। হৃদয়ের রিংটোন জুড়ে তখন সকাল বিকাল কেবলই 'আমার এই পথ চাওয়াতেই আনন্দ' বেজে চলে। এক্সপেডিশনের আগে কলকাতায় বসে সিরিয়াস চোখমুখে একখানা 'ইটিনেরারি' বানানো হয়। সেটা ঘটা করে 'আই এম এফ'-এর পারমিশান পেপার-এর সঙ্গে জুড়ে দিল্লিতে পাঠানো হয়। আর সেখানে জ্বলজ্বল

করে খানদুয়েক 'রেস্ট ডে'। কিন্তু ওই পর্যন্তই। রুটে নেমে ডে-এর পর ডে চলে যায়। আমি শবরীর প্রতীক্ষা নিয়ে থাকি। কিন্তু 'সে' আর আসে না। ব্যাপারটা ওই রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতির পর্যায়েই থেকে যায়।

কলকাতায় কারুর হাইপ্রেসার, কারুর কাফ এন্ড কোল্ডের ধাত, কারুর নাকি ফাইব্রোমায়েলজিয়ার কারণে পেশী আর গাঁটে নিদারুণ ব্যথা, কারুর আবার একটু অনিয়ম হয়েছে কি গ্যাসট্রাইটিস হুল ফোটায়। অথচ এইসব ভারতমাতার সন্তানরাই পাহাড়ের পথে পা দিলে এক একটা মিলখা সিং। এমন দৌড়বে যেন পিছনে তুষার চিতা তাড়া করেছে অথবা অ্যাভেলাঞ্চ ধেয়ে আসছে।

আগে অবশ্য হিমালয়ের উঠোনে আমার একজন সমব্যথী ছিল — প্রমোদ। সে অবশ্য এখন রিটায়ার করেছে। পাহাড়ের থেকে সমতলেই আগ্রহী বেশি। একবার বেশ কয়েকঘণ্টা টানা হেঁটে আমরা পৌঁছেছি মচ্ছপুছারে বেস ক্যাম্পে। আর ঘণ্টাদুয়েক টানতে পরলেই অন্নপূর্ণা বেস ক্যাম্প। তো মেঘলা পরিবেশে ঠান্ডার মধ্যে মচ্ছপুছারে বেস ক্যাম্পে আয়েস করে এক কাপ গরমাগরম চা খেয়ে প্রমোদের বাদশাহী মেজাজটা চাড়া দিয়েছে। ঘোষণা করেছে ও আর এগোবে না। কাল সকালে দেখা যাবে। তখনও দিনের আলো আরও কিছুক্ষণ থাকবে। যথারীতি বিশু শোনেনি, তাড়া দিয়েছে। তাতে প্রমোদের পাঞ্জাবি মেজাজ গেছে খিঁচড়ে। বলে উঠেছে, "ছালা, আগে গেলে কি মেডেল দেবে? মেডেল?" প্রমোদের 'ক্যাপিটালিসম' আর 'শ'-এ প্রবল বিরাগ। ছাত্রজীবনে কলেজ স্ট্রিটের বুড়ো-দার চায়ের দোকান থেকে হিমালয়ের হাইওয়ে সব জায়গাতেই ও 'ছালা'-তেই ছলকেছে। বিশু প্রমোদের নাড়িনক্ষত্র জানে। তাই অল্প ঝুঁকে প্রমোদের দিকে বড়ো বড়ো চোখে চেয়ে নিস্পৃহ ভঙ্গিতে বলেছে, "তুই কি এভারেস্ট-এ উঠছিস নাকি?" প্রমোদ আর কথা বাড়ায়নি। মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে এমন একটা বডি ল্যাঙ্গুয়েজ দেখিয়েছে যেন বলতে চেয়েছে, এসব অর্বাচীনকে কী আর বলব!

কতদিন আগের কথা। তবু পাহাড়ি পথের এইসব স্মৃতি আজও অমলিন। এই অন্নপূর্ণা বেস ক্যাম্পের পথেই জুলু-দার (দেবব্রত চক্রবর্তী) বার সাবান, কফি আর ময়দা দিয়ে ফুটো হয়ে যাওয়া স্টোভ সারানো, ছোটে-র (সোমনাথ নায়েক) হাত থেকে তেল, পিঁয়াজ আর লঙ্কা দিয়ে জম্পেশ করে মাখা ছাতু খেয়ে দুই ডাচ ললনার ঝাল লেগে হুশ হাশ করতে করতে ক্রমাগত 'ডিলিসিয়াস'

'ডিলিসিয়াস' বলে যাওয়া কিংবা পাহাড়ি জঙ্গলের ভেতর মাওবাদীদের হাতে পড়া। প্রায় হাঁটু অবধি গুটোনো প্যান্ট আর একগাদা জোঁক ধরা রক্তাক্ত দুটো পা নিয়ে হঠাৎ জঙ্গল ফুঁড়ে সামনে এসে দাঁড়ানো, ফরসা রোগা চেহারার এক মুখ দাড়ি গোঁফের সেই মাওবাদী নেতার নামটা অবশ্য ভুলে গিয়েছিলাম। বিশুর সৌজন্যে আবার মনে পড়ল — প্রভাত। প্রভাতের দু-পাশে দাঁড়ান, মিলিটারিদের মতো জলপাই রঙা ছোপ ছোপ পোশাকের, পাথরের মতো নিশ্চল খর্বাকৃতি দুই সঙ্গী আর তাদের হাতের কার্বাইন গান দুটোও আজও ভুলিনি। যুগ যুগ ধরে সগৌরবে মাথা তুলে থাকা হিমালয়ের সারি সারি কার্ডিলেরার মতোই এই 'ঠাকুরমার ঝুলি'-রও বিনাশ নেই। বয়স বাড়ে, স্মৃতিতে মরচে পড়ে। তবু এই রোমন্থন ইস্পাতের মতোই ঝকঝকে থেকে যায়।

সূর্যের লালচে আভার নরম আলোটা অনেকক্ষণ আগেই উপত্যকা ছেড়ে চলে গেছে। ফ্যাকাসে সাদা আলোর তীব্র ছটায় চারদিক ঝকঝকে। আজ সবার মধ্যে ঢিলেঢালা ভাবটা স্পষ্ট। বেরোতে দেরি হবে বোঝাই যাচ্ছে। আমি সেই যে ভোরবেলা বাইরে একবার চক্কর কেটে টেন্ট-এ ঢুকেছি, বেরোবার নাম করিনি। টেন্টের দরজার কাছে বসেই আশেপাশের ছবি নিয়েছি। মলয়দার মেজাজটা আজ বেশ তূরীয়। লো-অলটিট্যিউড-এ নেমে আসার কারণে বরফরাজ্যের রক্তাক্ত কুঁকড়ে যাওয়া ঠোঁটজোড়া এখন অনেকটাই স্বাভাবিক। একটা বোল্ডারের ওপর উবু হয়ে বসে গুণগুণ করে সুর ভাঁজতে ভাঁজতে একমনে রুকস্যাক গোছগাছ করছে। পোর্টার রাজু খাদের ধার ঘেঁসে ওঠা একটা ত্রিভুজাকৃতি বোল্ডারের ওপর বসে আছে গা ছাড়া ভঙ্গিতে। দূরে ঢেউ খেলে যাওয়া পাহাড়সারি আর নীল দিগন্তের সঙ্গে চলছে ওর নির্বাক কথোপকথন। পৃথিবীর কোটি কোটি শব্দের মাদলে ওর স্বরনালী জন্ম থেকেই যোগদান করতে অপারগ। তবু ওর নিরুচ্চার বাঙ্ময়তা মুখরতার চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। আজকের রাত আর কালকে কয়েক ঘণ্টা, তারপরেই হয়তো পাকাপাকি বিচ্ছেদ। তাঁবুর দরজায় মাথা ঠেকিয়ে ওর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকেছি কিছুক্ষণ। ও জানে না আমার দৃষ্টিপথে ছুঁয়ে থাকা ভালোবাসা, ওর ঝাঁকড়া কালো চুলে আদর বুলিয়েছে বারবার। কিছু সম্পর্কের কোনো নাম হয় না। তবু তা বড়ো বেশি 'আত্মিক'।

কালকের ভিজে থাকা জুতোজোড়া আজ দিব্যি শুকিয়েছে। তাঁবুর বাইরে

পা দিয়ে বসে ধীরেসুস্থে জুতোর ফিতে বেঁধেছি। আজ আর গ্যেইটার-এর ঝামেলা নেই। তাই স্যাকছড়ে চলান করেছি গ্যেইটার জোড়া। বিশুর ক্যামেরার সামনে সুমন আজকের আগাম যাত্রাপথের বর্ণনা দিচ্ছে। একটা সিগারেট ধরিয়ে শঙ্খদা ওদের টেন্টের বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছে ফুর ফুরে মেজাজে। ভেতরে বউদির প্রস্তুতি চলছে। স্টোভ ধরিয়ে ব্রেকফাস্ট তৈরিতে ব্যস্ত মহাবীর, বিজেন্দ্র, সুমন আর দলবীর।

— "থোড়া চায়ে পিয়েগা ডক্টরসাব?" মঙ্গলের গলা ভেসে এসেছে কিচেনের কাছ থেকে।

আমার উত্তরের অপেক্ষা না করেই একটা স্টিলের গ্লাসে চা ঢেলে এগিয়ে দিয়েছে।

পাহাড়ের দিক থেকে ভেসে আসা হালকা একটা ঠান্ডা হাওয়ায় রোদ্দুরে সকালটা বেশ আরামদায়ক। এই পরিবেশে চা-টা নেহাৎ মন্দ লাগছে না। চায়ে চুমুক দিতে দিতেই মঙ্গলের পাশে একটা পাথরে বসেছি। মঙ্গল সুড়ুৎ সুড়ুৎ করে চা খাচ্ছে আর একটা অজানা সুর ভাঁজছে। তার সঙ্গে ডানপায়ের ওপর আঙুলের টোকায় চলছে ওর বেতালা তবলাবাদন। জিজ্ঞেস করতে বলল, গানটা গাড়োয়ালি। এই গাড়োয়ালি গানের সম্ভার কিন্তু বিপুল। আমার এক পাহাড় পাগল দাদার কাছ থেকে এ বিষয়ে কিছু জ্ঞানার্জন করেছিলাম। বিভিন্ন উৎসব, জীবনযাত্রা বা দেবতাদের নিয়ে বাঁধা বিভিন্ন গানের আবার ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে। যেমন — বিরহের অশ্রুতে ভেজা 'সুদেড়', মেষপালকের জীবন নিয়ে 'ছুড়ে', বসন্তের ছন্দে ছন্দিত 'বাসন্তি', মাতৃত্বের অনুভূতি নিয়ে 'ছোলকা' কন্যা থেকে পত্নীত্বের আঙিনায় পা দেবার স্বপ্নঘন মুহূর্ত নিয়ে 'সপ্তপদী', দুষ্ট আত্মার শান্তি কামনায় 'আছরী' নাগ দেবতার পুজো নিয়ে 'নগেলো', ভূমিরক্ষক দেবতার জন্য রচা 'খিতরপাল'। এ ছাড়া 'মাঙ্গল', 'জাগর', 'ছোপ্‌তী', 'বাজুবন্দ' আরও কত কী।

মঙ্গলকে ওর গানের কথাগুলোর অর্থ নিয়ে জানতে চেয়েছিলাম। ওর বক্তব্যের সারমর্ম ছিল এই যে, এক ছোকরা এক সুন্দরী মেয়ের প্রেমে পড়েছে। কিন্তু মেয়েটি তাকে পাত্তা দেয় না। গানের মাধ্যমে ছেলেটি সেই কথাই জানাচ্ছে। এই গানটা কোন গোত্রে পড়ে অর্থাৎ বিশেষ কোনো 'নাম' আছে কিনা জানতে চেয়েছিলাম। মঙ্গল বলতে পারেনি। গানের বিষয়ে কথা কিছুদূর এগোনোর

পর বুঝেছিলাম এই বিষয়ে ওর দৌড় বেশি দূর নয়।

স্টোভের ওপর ডেকচিতে জল গরম হচ্ছে। মহাবীর আর বিজেন্দ্র প্যাকেট ছিঁড়ে ম্যাগি চাঙ্কগুলো সেই জলে ফেলছে। প্রত্যেকদিন ম্যাগি খেতে আমার একদমই ভালো লাগে না। অথচ উপায়ও নেই। আমাদের মতো স্বল্প বাজেটের টিমের জন্য অপশন্ খুব বেশি থাকে না। আর তা ছাড়া ঝোল ঝোল ম্যাগি থেকে কার্বহাইড্রেট আর জল দুটোই মেলে। পাহাড়ের পথে জল তুলনামূলক কম খাওয়া হয়। সেই জলটাও ম্যাগির স্যুপ-টা থেকে যেমন পাওয়া যায় আবার কার্বহাইড্রেট এনার্জির যোগানটাও দেয়। অবশ্য আজ আমি ম্যাগি খাবো না সেটা মহাবীরকে জানিয়ে দিলাম।

— "কেয়া খায়গা দাদা," মহাবীর জানতে চেয়েছে।

— "থোড়া ছাতু পানিমে মিলাকে দেও, থোড়া নমক ভি ডালনা", আমার ব্রেকফাস্টের মেনু জানিয়ে দিয়েছি।

প্রত্যেকবারই টিম রেশনের লিস্টে ছাতু থাকে। কিন্তু অবধারিত ভাবে কয়েক প্যাকেট কলকাতায় প্রত্যাগমন করে। বেশির ভাগ টিম মেম্বারেরই ছাতুর ব্যাপারে অনীহা আছে। আঁতেল বাঙালির কাছে ছাতু মোটামুটি 'ব্রাত্যজনের রুদ্ধসংগীত'। 'ধ্যুর, ও তো খোট্টাদের খাবার' এরকম কথা যে কত বাঙালিকে বলতে শুনেছি, তার ইয়ত্তা নেই। অথচ প্রোটিনের যোগানদার হিসাবে ছাতুবাবু বেশ ওজনদার। ফুচকা, এগরোল, ঝালমুড়ি, কচুরি, সিঙাড়া, মোমো কোনো কিছুতেই পাবলিকের না নেই, অথচ ছাতুর নাম শুনলেই কেমন একটা থুঃ থুঃ ভাব।

বেরোতে বেলা হবে জানাই ছিল, হয়েছেও। মঙ্গল সিং আমাদের এগোতে বলেছে। পোর্টারদের নিয়ে তাঁবু গুটিয়ে ও পরে আসছে।

তাঁবুর পিছনে একটা বোল্ডার চড়াই ধরেছি। প্রথম দিকটা বেশ খাড়াই। থেমে থেমেই উঠছে সকলে। চড়াইটা তিনশো ফুট মতো যাবার পর চারপাশটা বেশ 'ওপেন' হয়ে গেছে। ইনক্লাইনেশান্-ও কমে গেছে অনেকটা। এখন ডানদিক থেকে বাঁ দিকে গড়িয়ে যাওয়া পাহাড়ের প্রায় মাঝামাঝি একটা ন্যারো জোন ক্রস করছি আমরা। বিভিন্ন মানের অবিন্যস্ত পাথর ছড়ানো পথটায় পাশাপাশি দুজন হাঁটা যাচ্ছে না। পিছনদিকে তুষার ঢাকা একগাদা শৃঙ্গের হাতছানি আর শৃঙ্গগুলোর মাথার জমাট প্লিউমের নানা অলংকরণ।

মাঝে হলুদ রঙের বড়ো বড়ো ঘাসের মতো একটা অঞ্চল পেরিয়েছি। ক্রমশ পথটা চওড়া হয়েছে। দু-পাশের পাহাড় গড়িয়ে এসে তৈরি করেছে কিছুটা সমতল জায়গা। দু-হাতে আঁজলা ভরে জল খেতে গেলে দুটো হাতের তালু যে জ্যামিতি তৈরি করে জায়গাটা অনেকটা ওরকমই। মাঝ বরাবর অর্থাৎ সমতল অঞ্চলটা জুড়ে ফ্লেক হোয়াইট বরফের অবিন্যস্ত প্যাচ। সামনে সেই নিষ্কলঙ্ক নীল আকাশ যা একমাত্র পাহাড়ে দেখা যায়।

বরফের প্যাচটা পেরিয়ে আমি, সুমন, সলিলদা আর বিশু বড়ো বড়ো কিছু ছড়ানো ছেটানো বোল্ডারের সামনে দাঁড়িয়েছি। বাকিরা এখনও কিছুটা দূরে। সোজা ছড়ানো প্রান্তরটা পেরিয়ে একে একে এগিয়ে আসছে। দু-পাশে পাহাড়ের গায়ে ছোপ ছোপ বরফের দাগ। জায়গাটার তাপমাত্রা কিছুটা কম নাকি ঠাণ্ডা হাওয়ার জন্য তা জানি না তবে একটু শীত শীত করছে। বাকিদের আসার অপেক্ষায় গুছিয়ে বসেছি বোল্ডারের ওপরে। দূরে মঙ্গল সিংদেরও দেখা যাচ্ছে।

আবার শুরু হয়েছে চড়াই। একটা রিজ পেরিয়ে এসে আর একটা রিজ-এ ওঠার প্রস্তুতি, চড়াইটা সে কারণেই। কিছুটা বদলেছে চারপাশ-ও। একটা জায়গা মোটামুটি পাঁচিলের ওপর দিয়ে যাওয়ার মতো। সাবধানে পেরিয়েছি সকলেই। সূর্যের তেজ কিন্তু বেশ কমে এসেছে। মেঘের পর্দার আড়ালে থাকার দরুণ সেই শুরুর সময়ের চড়া ব্যাপারটা আর নেই। চারপাশ দেখতে দেখতে এগোতে মন্দ লাগছে না। পথ আবার সরু হয়ে এসেছে। একটা তুষার জমি পেরোতে হয়েছে অত্যন্ত সাবধানে। চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ ফুটের জোনটায় পাশাপাশি দুটো পায়ের পাতা-ও রাখা যাচ্ছে না। এক পা ফেলে পরের পা সামনে ফেলতে হচ্ছে। পিছল বরফে বডিব্যালেন্স রাখাই দায়। সঙ্গত কারণেই সময় লেগেছে কিছুটা।

— "কেন যে এসব জায়গায় আনিস সুমন," ন্যারো জোনটা ট্রাভার্স করে এসে মলয় দেবনাথ-এর সার্থক উপলব্ধি।

আড়াআড়ি স্নো বেডটা পেরিয়ে তুষারের ওপর দিয়েই আবার নেমে আসতে হয়েছে কিছুটা। জায়গাটা পেরিয়ে হাঁফ ছেড়েছে সবাই।

প্রসঙ্গত একটা মজার কথা জানিয়ে রাখি। নবম দিন ঘটা করে যেটাকে কাচনী পাস বলে পেরিয়ে এসেছিলাম সেটা আদৌ কাচনী পাস ছিল না।

কলকাতায় ফিরে সুমন রতনলাল বিশ্বাসকে এক্সপেডিশানের ছবি দেখানোর সময়, রতনদার বক্তব্য ছিল যে আমরা যেটা কাচনী পাস হিসাবে ক্রশ করেছি সেটা আদতে নন্দাবারারি ধার। কাচনী পাস এর থেকে আরও প্রায় হাজারখানেক ফিট ওপরে। মঙ্গলই ভুলটা করেছিল। কাচনী পাস আজ পেরিয়েছি। খুব সম্ভবত এই খতরনাক জায়গাটাই ওই পাস।

পথ ক্রমশ নীচের দিকে। যত নেমেছি ট্রি লাইন তত স্পষ্ট হয়েছে। নানা পাহাড়ি গাছ-গাছালি নজরে আসছে। চারপাশ জুড়ে সবুজের সমারোহ। কিছুটা স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে পড়ছে পরিবেশটা। সলিলদা, স্বর্ণেন্দু আর সুমন এগিয়ে গেছে। মলয়দা, আমি আর বিশু তাড়াহুড়ো করিনি। ভালো লাগছে চারপাশের ঘন সবুজ। একটু পরে মঙ্গল সিং এসে যোগ দিয়েছে। এতক্ষণ ও পিছনে শঙ্খদা আর বউদির সঙ্গে ছিল। মঙ্গল চুপ করে থাকতে পারে না। বেশ বকবকে। মলয়দা আর বিশু একটু চুপ থাকলেও মঙ্গলের সঙ্গে আমি অনর্গল বকে গেছি। পাহাড়ে ভেষজ উদ্ভিদ নিয়ে মঙ্গল নানা কথা বলে চলেছে। অ্যাক্‌চুয়ালি আমিই খুঁচিয়েছি। পাহাড়ের ভেষজগুণ সম্পন্ন উদ্ভিদরাজি নিয়ে বইপত্র বা ইন্টারনেটে অনেক কিছু পাওয়া যায়। তবে পাহাড়ের কোলে ছোটো থেকে বেড়ে ওঠা এই সমস্ত মানুষের মতামতের দাম আমার কাছে যথেষ্ট। এইসমস্ত গাছ-গাছালি এরা হাতের তালুর মতোই চেনে আর সাগ্রহে চিনিয়েও দেয় ইচ্ছুক মানুষজনকে।

যেতে যেতে মঙ্গল সিং একটা বেশ ইন্টারেস্টিং ঘটনার কথা শুনিয়েছে আমায়। ওর এক বন্ধু লাখন সিং। উত্তর কাশীতেই বাড়ি, সেই ছোটোবেলা থেকেই বন্ধুত্ব। তার পায়ে ডান হাঁটুর প্যাটেলার ঠিক ওপরে একটা ঘা হয়েছিল। যন্ত্রণা হত, পূঁজ রক্ত পড়ত। উত্তরকাশীর ডাক্তারেরা কিছু করতে পারেনি। উলটে ঘা এর পরিধি, বীভৎসতা আর যন্ত্রণা সবই সময়ের সঙ্গে বেড়েছে। শেষে দেরাদুন-এর বড়ো হাসপাতালে লাখন-কে নিয়ে যায় মঙ্গল সিং। ডাক্তাররা পরীক্ষা নিরীক্ষার পরে বলেন — ক্যানসার। মঙ্গলের জবানীতে পরের অংশটুকু বলি, 'উক্টর লোঁগ কাঁহা উনকা ডাইনা পা-ও মে ক্যানসার হো গ্যায়া। কাটনা হোগা। লাখন ডর গ্যায়া। উনোনে হাসপাতাল ছোড়কে আপনা মকান মে লওট আয়া। সময়কে সাথ সাথ ঘা-ও ভি বাড়তা চলা। অ্যায়সা হুয়া কি ও উঠ নেহি সাকতা বিস্তর সে। কুছ দিন বাদ এক ফোরেন (ফরেন) টিম লে কর ম্যায়

এক্সপেডিশান চলা গ্যায়া। উঁহাপে এক সাধু সে মুলাকাত হুই। ও মেরেকো পেড় কা কুছ পাত্তি দিয়া। ঔর বোলা পাত্তি কা রস উস জাগাপে লাগানে কে লিয়ে। এক্সপেডিশান খতম হোতে হি ম্যায় তুরন্ত লওট আয়া উত্তর কাশী। উস দিন সে হি ঘা-ও পর পাত্তি কা রস লাগানা শুরু কিয়া। তাজ্জব কি বাত, এক মাহিনা কে বাদ ও বিলকুল আচ্ছা হো গ্যায়া, চলনে ভি লাগা। কুছদিন বাদ সে ও কামকাজ ভি শুরু কিয়া।''

মঙ্গল সিং একটানা বলার পর কিছুটা থেমেছে। অন্যমনস্ক হয়ে তাকিয়ে থেকেছে সামনের দিকে।

— ''আভি তুমহারা দোস্ত ক্যায়সা হ্যায়? ওউর কোই প্রবলেম হুয়া?'' আমি সাগ্রহে জানতে চেয়েছি।

— ''নেহি উক্টর সাব, ওউর কোই প্রবলেম নেহি আয়া, আভি তো ও বিলকুল তন্দুরস্ত হ্যায়'', অন্যমনস্কতা থেকে ফিরে মঙ্গল সিং উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠেছে।

তারপর প্রায় না থেমেই আবার শুরু করেছে, ''ডক্টর সাব, ইস হিমালয় মে সবকুছ হ্যায়। জিন্দেগী জিনে কে লিয়ে যো যো চিজ্ কা জরুরত হোতা হ্যায়, ও সবকুছ ইসকে অন্দর হ্যায়। স্রিফ ঢুন্ডনা পড়তা।''

আমি নিশ্চিত নই মঙ্গলের বন্ধু লাখন সিং এর ক্যানসার হয়েছিল কিনা। হয়তো সিভিয়ার ইনফেকশন্ হয়ে ঘা-টা বাড়াবাড়ি পর্যায়ে চলে গিয়েছিল। দেরাদুনের ডাক্তারেরা হয়তো ভুল ডায়াগোনোসিস করেছিলেন। সেইজন্য ওই পাতার রসেই লাখন সেরে উঠেছিল। কিন্তু আজও মাঝেমধ্যে মনে হয়, সত্যিই ঘা-টা কারসিনোমা ছিল না তো? ওই পাতার রসের মধ্যে সত্যিই ক্যানসার সারানোর ভেষজ গুণ লুকিয়ে নেই তো? তাহলে যে সারা বিশ্বে কত মানুষ বেঁচে যাবে ওই করাল রোগের হাত থেকে। তবে মঙ্গলের দ্বিতীয় কথাটা নিয়ে আমার মধ্যে কোনো দোলাচল নেই। হিমালয়ের গহীনে মানুষের প্রাণধারণের জন্য প্রায় সবকিছুই আছে। শুধু খুঁজে নিতে জানতে হয়।

— ''ডক্টর সাব, তুম দোস্ত লোঁগোকে সাথ আও, ম্যায় থোড়া আগে বাড়তা হুঁ,'' মঙ্গল সামনে এগিয়ে গেছে।

বিশু, মলয়দা, শঙ্খদা, বউদি এখনও আসেনি। আমি পাথরের মাঝে একটু ঘাসজমি দেখে হাত-পা ছড়িয়ে বসেছি। রুকস্যাকের সাইড কেজ থেকে

জলের বোতলটা বার করে ছিটিয়েছি চোখেমুখে, ভিজিয়েছি শুকিয়ে যাওয়া গলাটা।

জায়গাটা কিন্তু দুর্দান্ত। আশেপাশে নানা ধরনের পাহাড়ি গাছ আর ছোটো ছোটো নানারঙের পাহাড়ি বনফুলের সমাবেশ। বোল্ডার নয় তবে নানা আকৃতির পাথর ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে চারদিক জুড়ে। এককথায় লাশ-গ্রিন যৌবন আর রুক্ষ কাঠিন্যের এক অনবদ্য সহাবস্থান। এরকম 'কেয়ার ফ্রি' বিউটি শুধু প্রকৃতির দরবারেই খুঁজে পাওয়া যায়। ঢালু হয়ে যাওয়া রাস্তাটা মিশেছে আড়াআড়ি বয়ে যাওয়া এক পাহাড়ি খরস্রোতায়। অদ্ভুত নির্জন জায়গাটায় পাথরে ছিটকে ওঠা খরস্রোতার বিরক্তি ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। মঙ্গলকে ধন্যবাদ এই জায়গায় আমায় ছেড়ে এগিয়ে যাওয়ার জন্য। নিজের সঙ্গে দু-দণ্ড কথোপকথনের মহার্ঘ সুযোগ করে দেবার জন্য। এতদিন ধরে তুষার, পাষাণের দাম্পত্য পেরিয়ে এই স্নিগ্ধ অরণ্যানীর কোমল উত্তাপ আমায় নিবিড়ে জড়িয়েছে। আমি একা তবু একাতীত্বের ক্লান্তি নেই। সবুজের ফিশফিশ, খরস্রোতার চাপল্য, মেঘেদের উড়ো চিঠি আর নির্জনতার নির্যাস, অন্তঃসলিলা হয়ে বয়ে গেছে গোপন অন্তঃপুরে। নিজের সঙ্গে থাকার জন্যও বোধহয় মাঝেমধ্যে একলা হয়ে যেতে হয়। শহুরে মানুষ কথায় কথায় ডিপ্রেশনের কথা বলে, মনোবিদ-এর কাছে দৌড়োয়। তাঁদের জন্য আমার একটা ছোট্টো প্রেসক্রিপশন। মাঝে মধ্যে পাহাড়ে হেঁটে আসুন, যার যতটুকু সামর্থ্য। আর সঙ্গে মনে রাখুন ডেভিড হেনরি থরো-র ওই অমোঘ কথাটা — "একা লাগবে কেন, আমাদের গ্রহটা কি ছায়াপথের মধ্যে নয়?"

ঝিরঝিরে দু-এক পশলা বৃষ্টি এসেছে। ছিটপিট শব্দে সে বোল তুলেছে গাছের পাতায়, ঘাসের গায়ে। নিটোল নিঃস্তব্ধতা ঘিরে বেজে উঠেছে গুন গুন বৃক্ষবন্দনা। মেঘ ছেঁড়া রোদ্দুরের পলিগোনাল বিম সোজাসুজি প্রেমে পড়েছে খরস্রোতার চঞ্চলতায়। রোদ্দুর প্রেমে মাতোয়ারা চপলা নির্ঝরিণী এখন আরও লাবণ্যময়ী। একটা নরম আলো এখন সারা বনাঞ্চল জুড়ে। বৃষ্টির বেগ অল্প বেড়েছে। ক্রমশ সবুজ বনানী সবুজতর হয়েছে 'হঠাৎ বৃষ্টি'-র প্রগলভতায়।

আমি নিঃশব্দে ভিজেছি। এক আদিম অসহায়তা ভিজিয়েছে আমায়।

— "এই ডাক্তার, আর কতটা রে?" মত্ত হস্তীর পঙ্কজ বনে প্রবেশের মতো মলয়দার মঞ্চে প্রবেশ।

— "মঙ্গল বলল আর কয়েকটা রিজ্ টপকালেই মদমহেশ্বর," আমার যতটুকু জানা ছিল বলেছি।

কথায় আছে পাঠানদের নাকি ঘোড়ার লাগাম নেই আবার জিভেরও লাগাম নেই, মলয়দার-ও সেই অবস্থা। মাঝখানে চুপ ছিল আবার বোধহয় জিভ সুড়সুড় করে উঠেছে। লাগাতার বকে চলেছে। নির্জন প্রকৃতির সঙ্গে আমার 'রোম্যান্টিক সিন্' মুহূর্তে 'কমিক সিন্' হয়ে গেছে। পুরস্কার স্বরূপ দাদাকে নিঃশব্দে একটা গালি দিয়েছি।

— "এই ডাক্তার ওঠ, মলয়দা আর দেরি করো না," বিশু তাড়া দিয়েছে।

মলয়দা গুছিয়ে বসতে গিয়েছিল। বিশুর তাড়নায় সেটা আর সম্ভব হয়নি।

— "এই বিশু আর সুমনটা না মাইরি, সবসময় তাড়া লাগায়," মলয়দার বসতে না-পারার আক্ষেপে চোয়ালঝোলা কাতরোক্তি।

অগত্যা আবার রুকস্যাক কাঁধে, দাদার বিখ্যাত বাইট শুনতে শুনতে পা চলেছে অন্তিম লক্ষ্যে, অবশ্য মলয়দার নানা উদ্ভাবনী বাইট পথশ্রমের ক্লান্তি দূর করতে মাঝেমধ্যেই সাহায্য করে এটা অনস্বীকার্য।

রিভার বেডে নেমে এসেছি। জল খুব বেশি নেই। তবে স্রোত আছে। একটা গুঁড়ি ফেলা আছে আড়াআড়ি। তাও আবার নড়বড়ে। তারওপর পা ফেলে তিনজনেই পেরিয়েছি। পিছন ফিরে দেখা মিলেছে শঙ্খদা আর বউদির। আমি যে জায়গাটায় বসেছিলাম। ওরা এখন ওই অবধি চলে এসেছে। দূরত্ব বেশি নয়। তাই নিশ্চিন্ত মনে এগিয়ে যাওয়াই যায়।

'The 3 rules of Mountaineering' বলে একটা কথা পাহাড়ের পথে চালু আছে। রুলসগুলো এইরকম —

"It's always further than it looks.
It's always taller than it looks.
And It's always harder than it looks."

রুলগুলো জানা ছিল। এরকম অনেক কিছুই জানা থাকে। হয় ছাপার অক্ষরে পড়ে বা কারুর মুখ থেকে শুনে। কিন্তু সবগুলোই উপলব্ধির স্তর অবধি পৌঁছয় না। পৌঁছয় তখনই যখন পরিবেশ পরিস্থিতি একপ্রকার বাধ্য করে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে। আজকেও হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি এই তিন 'পাহাড়ি রুল'-এর গুঁতো। পথ যেন আর শেষ হয় না। এক্সপেডিশনের অনেক

কঠিন পথগুলো পেরিয়ে আসার পর তুলনামূলক অনেক সহজ পথে শরীর আর মনজুড়ে একগাদা ক্লান্তি। তিনজনেই ধ্বস্ত। মঙ্গল সিং-এর কথামতো 'আর কয়েকটা রিজ টপকালেই মদমহেশ্বর,' ঠিক যে আর কটা রিজ পেরোলে কমপ্লিট হবে তা আমাদের জানা নেই। পা চলছে নিয়মিত তবু পথ শেষ হচ্ছে না। তিনজনেরই এখন কমন রিংটোন 'পথের শেষ কোথায়'। সুমন, স্বর্ণেন্দু-দের সাড়াশব্দ নেই। ওরা এখন অনেক এগিয়ে। প্রায় মদমহেশ্বর-এর দোড়গোড়ায়।

টু জি স্পিড-এ ইউ টিউব স্ট্রিমিং-এ যেমন দেরি হয় সেরকম আমাদের গুটি গুটি চলনের পিছনে, পুরোটা না হলেও কারণটা অনেকটাই মনস্তাত্বিক। জানি পথে আর কোনো 'রিস্কি জোন্' নেই, কিছুক্ষণ বাদেই মানুষের সাড়া পাব। এসব বুঝেই ভাবনা সুতোয় বাবুগিরির বিলাসী লাটাই-টা টান দিয়েছে। 'আরবান লাক্সারীর' বিরক্তিকর 'হ্যাঙ্গওভার'-টা আড়ালে নিঃশব্দে স্নিফার ডগ-এর মতো পিছু নিয়েছে। মন যে সেটা বুঝছে না তা নয়। মন বড়ো সেয়ানা। সব বুঝছে। তবু একটা কঠিন এক্সপেডিশান শেষ হবার প্রচ্ছন্ন গর্বে মুখ লুকিয়ে শরীরকে ভুল বোঝানোর এক অলীক সুখে মেতে থাকার লোভটা কিছুতে সংবরণ করতে পারছে না। আর সেখানেই মন আর শরীরের আজব দ্বৈরথ। ফলশ্রুতি অহেতুক গতিমন্থরতা।

চারপাশ জুড়ে ঘন সবুজের খামখেয়ালীপনা নিশ্চিন্তে ডানা মেলেছে। জানা অজানা নানা 'হিমালয়ান প্ল্যান্টস'-এর বসতি পেরিয়ে এগিয়ে চলেছি ব্যথাদীর্ণ পদক্ষেপে। 'বোল্ডার' হারিয়ে গেছে 'নরম মাটি'-তে। স্যাঁতস্যাঁতে ভিজে পিছল জমি ক্রমশ ভরসা দিচ্ছে অন্তিম লগ্নের নিশ্চিত পূর্ণতায়। তবু কুহকিনী আশা শুধুই ছলনাময়ী। আমার রোম্যান্সের শেষ কাঁথায় আগুন দিয়েছি। তবু ওই রিংটোন এখনও বাজছে — "পথের শেষ কোথায় ..."!

"Trekking" শব্দটা নাকি এসেছে একটা পর্তুগীজ শব্দ থেকে — 'TREKKEN! শব্দটার অর্থ হল — 'Travelling far and wide on bullok carts.' আজ আমাদের গতিও ওই 'bullok carts'-এর মতোই। সে দিক থেকে আমরা কিন্তু যথার্থ ট্রেকার, মানতেই হবে।

শেফার্ড-দের ব্যবহৃত রাস্তায় চলে এসেছি। শুনেছিলাম এখানে কস্তুরী মৃগ দেখা যায়। তবে এতটা পাহাড়ি জঙ্গুলে রাস্তা পেরিয়ে এসেও তাদের

দেখা মেলেনি। শেফার্ডদের দু-একটা আস্তানা দেখা যাচ্ছে। ভেড়ার পাল নিয়ে দু-চারজন ভেড়াওয়ালাও পাশ দিয়ে চলে গেছে গন্তব্যে অবাক চাহনি মেলে। বৃষ্টি কিন্তু এখনও থামেনি। ঝিরঝির করে পড়েই চলেছে। পথঘাট পিছল। কাঁচা মাটির রাস্তায় দু-একবার হড়কেছি মনঃসংযোগের অভাবে। তবে তাই দেখে শেফার্ড রমণীদের হাসির অভাব হয়নি। তাদের সম্মিলিত হাসির লহরা, চুড়ির রিনরিনে বোলের সঙ্গতে হারিয়ে গেছে ভেজা বিকেলের উন্মুক্ত আকাশে।

— "বোধহয় ওটাই মদমহেশ্বর, বুঝলি," দুরে অস্পষ্ট কিছু ঘরবাড়ির দিকে আঙুল দেখিয়ে বিশু বলে উঠেছে।

বিকেলের আলো কমে এসেছে। খুব ভালো বুঝতে পারিনি। তবে শেষ যে আর খুব দূরে নয় তা মালুম হচ্ছে পথঘাট আর পারিপার্শ্বিক-এর চালচিত্রে।

পথে এক জায়গায় গাছের ভাঙা গুঁড়ির ওপর বাঁ পা তুলে ডান কোমরে হাত রেখে মলয় দেবনাথ আবদার করেছে, "ডাক্তার, একটা ছবি নাও দেখি"। বৃষ্টির জন্য ক্যামেরাটা স্যাকে চালান করেছিলাম। দাদার অনুরোধ ফেলা যায় না। আবার বের করেছি। তার আগেই অল্প বিরতির সুযোগ নিয়ে বিশু উদাসী মুখে একটা বিড়ি ধরিয়েছে।

ছবিটা তুলেছি। উঠেছেও চমৎকার। তবে শাটার পুশ করা ছাড়া ছবির ব্যাপারে আর কোনো কৃতিত্ব আমি দাবি করছি না। প্রথমত 'ম্যানুয়াল' নয়, পরিষ্কার 'অটো মোড'-এ রেখে নেওয়া ছবি। যাতে 'এক্সপোজার'টা ক্যামেরাই ঠিক করে দিচ্ছে। আর দ্বিতীয়তঃ গাছের ফাঁক দিয়ে শেষ বিকেলের হলদে মায়াবী আলোটা দাদার মুখে পড়ে এক অদ্ভুত আলোছায়া তৈরি করেছে। এবং তৃতীয়তঃ, ওই শেষ আলোয়, এক্সপিডিশান সাফল্যের সঙ্গে শেষ করার পূর্ণতায়, দাদার উজ্জ্বল ঝকঝকে দুটো চোখের ভাষা। জানি না, ব্যাকড্রপে ভেজা জঙ্গল সমেত দাদার 'ম্যানলি' ছবিটা মলয়পত্নী দেখেছিলেন কিনা? তবে দেখলে আর একবার হনিমুনে যাবার বাসনা জেগে ওঠা স্বাভাবিক।

এখন পা চলছে দ্রুত। জঙ্গলের ঘেরাটোপ হারিয়ে গেছে পিছনে। বড়ো বড়ো গাছের সংখ্যা কমে ঘাস আর বুশ-এর আধিক্যই বেশি। উন্মুক্ত চরাচরের অবাধ ক্যানভাসে 'র-সিয়েনা'র অভিজাত তুলি জুড়ে সৃষ্টি সুখের মুখর উল্লাস। এ যেন এক নতুন পৃথিবী। আমার স্পাইনাল কর্ড ছোঁয়া শীতঘুম কেটে গেছে। পাহাড়ের কোমল ঠান্ডা হাত পরশ বুলিয়ে গেছে চেতনার অন্তিম স্বত্তায়।

ঈগলের ডানার মতো নিশ্চিন্ত নিরাপত্তার এক অব্যক্ত ভালোবাসায় নিজেই নিজেকে জড়িয়েছি পাকে পাকে। যে অব্যক্ততার প্রতিটি ভাঁজে ভাঁজে নীরবে উচ্চারিত হয়েছে —

"তোমাকে পাবার প্রস্তুতি আনে বোধ,
দুঃখকে তাই শাসাই রুক্ষ স্বরে,
বেদনাকে তাই মোড়াই কাফনে সাদা —
তোমাকে রাখার পরিসর গড়ি প্রাণে।

তোমাকে রাখার প্রস্তুতি বাড়ে বোধে।
তোমাকে পাবার প্রেরণায় জাগি রাত,
নৈরাজ্যের খড়্গের তলে মাথা,
ঘাড় কাত করে তবু দেখি রোদ
কতটা পেরোলো অমা।"

"ওই তো! চলে এসেছি," মলয়দার উল্লাস ভেসে এসেছে।

শেফার্ডদের পায়ে চলা সরু পথটার বাঁ দিকে ফার পাইনের ঠাস বুনোট পেরিয়ে কোণাকুণি দেখা যাচ্ছে ছোট্টো গ্রামটা — মদমহেশ্বর। একটু দূরে দিকচক্রবালের দিক থেকে গড়িয়ে আসা পাহাড়টার মাঝামাঝি একটা সবুজ সমতল জায়গা। সেখানেই নামমাত্র কয়েকটা ঘর আর মন্দির নিয়ে পঞ্চকেদারের এক কেদার। অস্তগামী সূর্যের শেষ প্রশান্তিটুকু অকৃপণ মাধুর্যে ছড়িয়ে রয়েছে ওই ছোট্টো পাহাড়ি জনপদের আনাচে কানাচে। গ্রামটা নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছে পাহাড়ের সবুজ কোলের নিশ্চিন্ত আরামে। মলয়দা ঠিক এই অ্যাঙ্গেল থেকেই মদমহেশ্বরের একটা দুর্দান্ত ছবি নিয়েছিল। ছবিটা আমার দারুণ প্রিয়।

আর আধঘণ্টা মতো ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে হাঁটার পর পাথুরে রাস্তাটা একটা ছোট্টো লেফট সাইড ডজে ছুঁয়েছে ৩২৬৫ মিটার উচ্চতার মদমহেশ্বরে।

সুমন, স্বর্ণেন্দু আর সলিলদা প্রায় ঘণ্টা দেড়েক আগেই পৌঁছেছে। অলরেডি একটা হোম স্টে ঠিক করে ফেলেছে ওরা। আমাদের দেখেই এগিয়ে এসেছে।

সুমন একে একে জড়িয়ে ধরেছে সবাইকে।

— "রাস্তায় ঘুমিয়ে পড়েছিলে নাকি বিশুদা?" বিশুকে বুকে জড়িয়ে স্বর্ণেন্দুর রসিকতা।

গ্লাস ভরতি চা-ও এসে গেছে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। গরম চা-এ তৃপ্তির চুমুক দিতে দিতেই দেখেছি শঙ্খদা আর বউদিকে দেখা যাচ্ছে। আমি এগিয়ে গিয়ে দাদার স্যাকটা কাঁধে তুলেছি। পরিশ্রমে ক্লান্ত মুখটা ভরে আছে ফোঁটা ফোঁটা ঘামে। আমাকে জড়িয়ে ধরেছে আমার প্রিয় হিলারী।

"ডাক্তার ..." শঙ্খদার শরীরটা আমার বুকের ভেতর থরথর করে কাঁপছে।

শঙ্খদা হয়তো আরও কিছু বলতে গিয়েছিল। আবেগে কথাগুলো আর মুখের বাইরে আসেনি। ভালোই হয়েছে। এসব মুহূর্তে কথা যত কম হয় ততই ভালো। শব্দ কোথাও উপভোগ্যতা নষ্ট করে। পারস্পরিক অনুভব এখানে লক্ষ কথার চেয়ে বেশি।

মন্দিরের সামনেই সবুজ ঘাসজমিটা পেরিয়ে শঙ্খদা আর বউদি এসে পৌঁছেছে হোম স্টে-র সামনের পাথুরে রাস্তাটায়। আর ঠিক এরপরেই যা ঘটেছে সেটা না ঘটলে এক্সপেডিশানের পরিসমাপ্তিটা যেন ম্যাড়ম্যাড়ে থেকে যেত।

নীল আর হলুদ উইন্ডচিটারে ঢাকা দুটো অবয়ব অক্লেশে আঁকড়ে ধরেছে একে ওপরকে। রোদে পুড়ে ঝলসে কালো হয়ে যাওয়া মুখদুটো জুড়ে এখন খুশি, আনন্দ, ভরসা, পূর্ণতা আর তৃপ্তির এক হিরন্ময় কোলাজ। বৃষ্টিভেজা মদমহেশ্বর থেকে দিনান্তের শেষ আলো চলে যাবার আগে লাজুক রক্তিমতা ছড়িয়ে গেছে ওদের ক্লান্ত চোখে মুখে। পাহাড় হয়তো এভাবেই সম্পর্কের পূর্ণতা আনে।

আমাদের সোল্লাস হাততালি আর খুশির চিৎকারে ঘাবড়ে গিয়ে মদমহেশ্বর-এর সারমেয় কুল যৌথ প্রতিবাদ জানিয়েছে।

সন্ধে নেমেছে। নিঃস্তব্ধতা আরও জমাট বেঁধেছে। মন্দির থেকে ভেসে আসছে ঘণ্টাধ্বনি। সন্ধ্যারতি শুরু হয়েছে।

সামনের উঁচু পাহাড়টা যেখানে মাটি ছুঁয়েছে প্রায় সেখানেই গড়ে উঠেছে উত্তর ভারতীয় স্থাপত্যে তৈরি মন্দিরটি। মূল মন্দিরে তিনটে মূর্তি রয়েছে। কালো মার্বেলের 'ন্যাভেল শেপড্' মূর্তিটি সবচেয়ে বড়ো, স্বয়ং শিবের। পাশে আরও দুটো কালো পাথরের একই আকৃতির মূর্তি রয়েছে — পার্বতী ও অর্ধনারীশ্বরের (অর্ধ শিব, অর্ধ পার্বতী)। মূল মন্দিরের সামনে আরও একটা ছোট্ট মন্দির আছে — দেবী সরস্বতীর।

আজ আর টেন্ট নয়। তক্তপোষের ওপর বসেছে আমাদের জমাটি সান্ধ্যকালীন আড্ডা। মদমহেশ্বরে ঠান্ডা খুব একটা নেই। তা ছাড়া অতটা ঠান্ডা গায়ে নিয়ে গত কয়েকদিন কাটিয়েছি। এ ঠান্ডা গায়ে লাগছে না সেরকম। ফুলহাতা গেঞ্জিতেই চলে যাচ্ছে দিব্যি। চা, মুড়ি, চানাচুরে কেটে গেছে একটা মুচমুচে সন্ধে।

সুমন হিসাবপত্র নিয়ে বসেছে। মঙ্গল সিংকে বাকি টাকাপয়সা মিটিয়ে দিতে হবে। সুমনের নির্দেশে ওর হিসাবের খাতায় আমাকেও চোখ বোলাতে হয়েছে। সব ঠিকঠাকই হিসাব রেখেছে ছেলেটা। এক্সপেডিশানের পথে এইসব হিসাব রাখা বেশ ঝক্কির ব্যাপার অন্তত আমার কাছে। সুমন কিন্তু দিব্যি সামলায়।

একসময় বন্ধ ঘরটায় আর ভালো লাগেনি। চটি গলিয়ে বেরিয়েছি বাইরে। ঘরের মধ্যে বোঝা যায়নি, বাইরে কিন্তু ঠান্ডাটা গায়ে লাগছে। দু-একটা টিমটিমে আলো ছাড়া পুরো অঞ্চলটা অন্ধকার, আর অসম্ভব নির্জন। আকাশতলায় এখন হাজার জোনাকীর ফুলঝুরি। পাথুরে এবড়ো খেবড়ো রাস্তাটা ধরে পা টিপে টিপে এগিয়েছি আমাদের ঘরটা থেকে কিছুটা দূরে একটা চাতালের দিকে। ওখানের জ্বলে থাকা টিমটিমে আলোটাই আমার পথনির্দেশিকা। দলবীর, রাজু মহাবীরদের আজ ওটাই রান্নাঘর।

আজ আমাদের মেনু রুটি আর আলুরদম। বউদি রন্ধন পটীয়সী। ওদের সঙ্গে বসে থেকে নানা নির্দেশ দিয়ে আলুর দমটা তৈরি করিয়েছে। বউদি যাবার পর ওরা এখন রুটি তৈরি করছে। সঙ্গে চলছে প্রাণখোলা গান। আমি যেতেই ওদের আড্ডাটা হঠাৎ থেমেছে।

— "আও দাদা বৈঠো," বিজেন্দ্র সরে গিয়ে জায়গা করে দিয়েছে।

— "গানা কিঁউ বন্ধ কিয়া? আচ্ছা লাগ রাহা থা," আমি উৎসাহ দিয়েছি।

প্রথমিক জড়তাটুকু কাটিয়ে দলবীর শুরু করেছে। দেশোয়ালি গান। সুরটা মন্দ লাগেনি। চেনা নয় তাই কথাগুলো আজ আর মনে নেই।

— "দাদা, ম্যায় এক গাঁউ", আগুনে রুটি সেঁকতে সেঁকতেই মহাবীরের লাজুক জিজ্ঞাসা।

আমার সোচ্চার সমর্থন নিয়ে শুরু করেছে ছেলেটা। চোখ বন্ধ করে ধরেছে গান। মাঝে মধ্যে চোখ খুলে উলটে পালটে দিচ্ছে রুটিগুলো। সুর কাটছে, গলা আহামরি নয় তবু আন্তরিকতার অভাব নেই। মনে পড়েছে আমার

ছোটোবেলার কথা। রান্না করতে করতে মা এভাবেই চোখ বুজে কত রবীন্দ্রসংগীত গাইতেন। আমি চৌকাঠে বসে হাঁ করে শুনতাম। পরিবেশ, পরিস্থিতি সব আলাদা। তবু সময় কেমন ফিরে ফিরে আসে। পাহাড় এভাবেই অতীতের পাতা উলটে দেয়।

— "আচ্ছা লাগা দাদা?" মহাবীর জানতে চেয়েছে।

— "বহত আচ্ছা লাগা," আমি মন থেকে বলেছি। ওকে কীভাবে বোঝাব ওর কাছে আমি কতটা ঋণী।

— "আপ ভি এক শুনাইয়ে না দাদা," মুখচোরা সুমন বলে উঠেছে।

ওরা আজকালকার ছেলে। সেটা ভেবেই হিন্দি ফিল্‌মের একটা বাজার চলতি গান ধরেছি। — 'ইয়ে কালি কালি আঁখে'।

মুহূর্তে যে যা হাতের কাছে পেয়েছে তা বাজিয়েই সঙ্গত শুরু করেছে। সঙ্গতকারীদের বেসুরো তালে গান মাথায় ওঠার জোগাড়। তবু স্বীকার করতে বাধা নেই পাহাড়ের তাজা হাওয়ার মতো এরকম দিলদার কিছু বাজনদার পেলে আমার সারারাত গলা সাধায় কোনো আপত্তি নেই।

— "থোড়া খা লিজিয়ে দাদা, বলিয়ে ক্যায়সা লাগা," গানবাজনার মাঝেই মহাবীর আমার দিকে একটা থালা বাড়িয়ে দিয়েছে।

বাড়িয়ে দেওয়া থালায় দুটো রুটি আর গ্রেভি সমেত খানতিনেক আলু। জানি রুটি গোটনাগুনতি, যাতে ফেলা না-যায়। তবু ও যে কার মুখের অন্ন মেরে আমার মুখে তুলে দিল কে জানে? ডিনার তো এখনও বাকি। তখন তো খাব।

আমি ফেরানোর যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। কিন্তু সম্মিলিত বাধার কাছে নতিস্বীকার করা ছাড়া উপায় ছিল না। আমি নিশ্চিত জানি টিম মেম্বারদের কারও কম পড়বে না, ওরা বঞ্চিত করল নিজেদেরকেই।

রুটি ছিঁড়ে গ্রেভি মাখিয়ে মুখে তুলেছি। এত ভালো আলুর দম আর কখনও খেয়েছি কি?

জীবনে হঠাৎই পড়ে পাওয়া চোদ্দো আনার মতো প্রাপ্তির চেয়ে বাড়তি কিছু মিলে যায়। যার নেপথ্যে থাকে কিছু 'মানুষ'। সারা পৃথিবীতে মানবতার অপুষ্টি নিয়ে, যখন হাহাকার তখন অ্যাগনেস গোনজা বোনজিউ-র চিরকালীন হাসিতে মদমহেশ্বরের নিস্তব্ধ তারাভরা রাতের পাশে ধীরে অথচ দৃঢ় ছন্দে ফুটে

উঠেছে মানবতার সিল্যুয়েট।

নিজের 'সো-কল্ড' শহুরে শিক্ষা আর বোধের গালে সপাটে দুটো চড় মেরে একসময় নেমে এসেছি অন্ধকার পাথুরে রাস্তায়। এতক্ষণ আলোয় থাকার কারণে চোখ ধাঁধিয়ে আছে। সাবধানে পা ফেলেছি। পিছন থেকে সুমনের সাবধান বাণী ভেসে এসেছে — "সামহালকে যানা দাদা"। আমি ঘাড় না ঘুরিয়েই ওকে হাত তুলে আশস্ত করেছি। তখনও জানতাম না আর কয়েকমাস পরেই উত্তর কাশীতে ওর নিজের অঞ্চলে পা ফসকে খাদে পড়ে যাবে ছেলেটা। সেখান থেকে ওর ফরসা শরীরটা আর কোনোদিনও উঠবে না।

মাও সে তুং বলতেন, "কোনো কোনো মৃত্যু পাখির পালকের মতো, কোনো মৃত্যু আবার পাহাড়ের মতো ভারী।"

জানি বরফ আর মৃত্যুর রং বড়ো শীতল।

আপশোশ একটাই। সুমনের পা ফসকে যাবার ঠিক আগের মুহূর্তটায় বলতে পারিনি, "সামহালকে সুমন"।

ফেরা

"The hills are alive with the sound of music
With songs they have sung for a thousand years ..."

সময়টা যেন ২০১২-র ২১ জুন নয়। পিছিয়ে গেছে ১৯৩৮-এ। জায়গাটাও যেন মদমহেশ্বর নয়, অস্ট্রিয়ার সালজবুর্গ। সেই তথাগত সম বরফ ঢাকা স্থানু পাহাড়ের গাম্ভীর্য, চিরসবুজ অরণ্য আর আদরের উপত্যকা, সবকিছুতেই যেন কত মিল। গির্জার জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে মদমহেশ্বরের মন্দির। সামনে ঝোলানো ঘণ্টাটাও যেন অবিকল। সকালের মায়াবী সোনাটুপ রোদ-টা বিছিয়ে আছে দুই সময়ের সরণী হয়ে। এক্ষুণি যেন দু-চোখে নীল স্বপ্ন নিয়ে একহাতে স্ট্রাইপড ব্যাগ, অন্যহাতে গিটারের কাঠের বাক্সটা হাতে সামনের ওই অরণ্য উপত্যকার প্রান্তর বেয়ে রুপোলি ঝরনার মতো ছুটে আসবেন জুলি অ্যানড্রুজ। এক একটা সকাল এক একটা 'সময়' ফিরিয়ে দেয়।

তখন বয়স নেহাতই অল্প। বাবা মায়ের হাত ধরে ধর্মতলার এক সিনেমা হলে বসে দেখেছিলাম 'সাউন্ড অব মিউজিক'। প্রেমে পড়েছিলাম এক এবং অদ্বিতীয় জুলি অ্যানড্রুজের থুড়ি 'মারিয়া'-র। সে সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামায় ইউরোপ একটু একটু করে ছন্দ হারাচ্ছে। বোমারু বিমান আর বারুদের রক্তাক্ত ঝলসানিতে টুকরো টুকরো হচ্ছে জনজীবনের স্বাভাবিক হারমনি। সে সময়ই আল্পসের টিরোল অঞ্চলের অসামান্য পার্বত্য লাবণ্যের মাঝে মারিয়া'র অফুরান প্রাণশক্তি, স্বতঃস্ফূর্ততা, ছেলেমানুষী আর গান হয়ে উঠেছিল এক মূর্তিমান 'প্রতিবাদ'। যেন 'মিউজিক' এগইনস্ট 'ভায়োলেন্স', 'ক্রিয়েশান' এগইনস্ট 'ডেসট্রাকশান'। ওই বয়সে অতশত বুঝতাম না। বোঝার কথাও নয়। তবে আল্পসের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আর তার মাঝে সুরেলা মারিয়া, এই দুই-এর জলছাপ আজও ভীষণ ভাবে ভেজা।

আজকের গহন, মোহক, মেদুর সকালটা যেন সেই জলছবি। ডানদিকে তুষারাবৃত চৌখাম্বা, বাঁ দিকে গ্রিন অ্যালপাইন মেডো আর ব্যাকড্রপে ঘন জঙ্গলের নিবিড় হাতছানি ঘেরা মদমহেশ্বর যেন সেই জলছবি থেকে উঠে আসা সালজ্‌বুর্গ।

ভোরবেলা কিছুটা বৃষ্টি হয়ে গেছে। বৃষ্টির জল ভাঙা কাঁচের টুকরোর মতো ছড়িয়ে আছে ঘাসে, পাথরে, মন্দিরের পেতলের ঘণ্টায়। বৃষ্টিধোয়া মদমহেশ্বর এখন আরও সবুজ, আরও ঝকঝকে। শঙ্খদা রেডি হয়ে বারান্দায় বসে আছে। বউদি গেছে মন্দিরে পুজো দিতে। বাকিরা কেউ রেডি কেউ বা শেষবেলার প্রস্তুতি সারছে। এই অবসরে আমি গ্রামটা একটু ঘুরতে বেরিয়েছি।

নামমাত্র কয়েকটা কাঁচা পাকা ঘর-আর কয়েকটা শেফার্ড হাট নিয়ে মন্দির সংলগ্ন গ্রামটা অদ্ভুত শান্ত। পাহাড়ের এইসব অঞ্চলের মানুষগুলো শহুরে মানুষের সামনে এখনও কিছুটা জড়সড়। শুধু অবাক চোখে চেয়ে দেখে আর চোখাচোখি হলে প্রত্যুত্তর দেয় লাজুক হাসিতে।

মদমহেশ্বর-এর কিমি দুয়েক ওপরে বুড়া মদমহেশ্বর। বেরিয়ে পড়ার তাড়ায় আর যাওয়া হয়নি। যাবার যে খুব ইচ্ছে ছিল তাও নয়।

মন্দির চত্বরে চাঁদা নেওয়ার জন্য দু-তিনজন ঘুরঘুর করছে। গতকাল চাঁদার খাতা বাড়িয়ে টাকা চেয়েছিল। আজও চেয়েছে। আমরা দিইনি। দাঁত মুখ খিঁচিয়ে তাদের বিরক্তি ভরা বক্তব্যের জবাব আমরা তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতেই দিয়েছি। সারা ভারতবর্ষের এরকম প্রচুর মন্দির চত্বর জুড়েই ধর্মের নামে এই ধরনের ব্যবসা চলে। পাত্তা দেওয়া অর্থহীন।

যে পথ ধরে মদমহেশ্বরে পৌঁছেছি সেই পথই উলটোদিকে সোজা চলে গেছে মদমহেশ্বর ছেড়ে, এঁকেবেঁকে গোন্ডার গ্রামের পথে। আমাদের ফেরার পথ।

'ফেরা' ব্যাপারটার মধ্যে কোথাও একটা 'দ্বৈত সত্তা' কাজ করে। একদিকে যেমন এসব জায়গা ছেড়ে যাবার সময় হলেই অভিমানী মন ঘাড় গোঁজ করে দাঁড়িয়ে থাকে আবার উলটো দিকের অর্বাচীন আমি-টাকে হ্যাঁচকা টান দেয় আমার জন্মস্থান। জানি বাবা নেই, মা নেই, তবু ফাঁকা বাড়িটা আছে। কিছু স্মৃতির শ্যাওলা আছে, আর আছে কিছু প্রিয়মুখ। পাহাড়কে ভালোবাসায় ঘাটতি নেই আবার এটাও ঠিক বছরের পর বছর পাহাড়ে পড়ে থাকতে বললেও পারব না। অবচেতনে একটা নাগরিক বীজ পোঁতা আছে তো। তার আবার ভারী পছন্দ ডিপ্রেশন, আমাশা আর পলিটিক্যাল তামাশা ভরা — কলকাতা। আজ সকাল থেকেই দুই মনের টানাটানি চলেছে। মীমাংসার চেষ্টা করে একসময় হাল ছেড়েছি। পরের ছেলে নিত্যানন্দ, যত গোল্লায় যায় তত আনন্দ, আমার কী?

গতকালই আলাপ হয়েছে তিলক পণ্ডিতের সঙ্গে। এখানকার পুরোহিতের বংশধর। ছটফটে ফরসা ছেলেটা এখনও কৈশোরে পা দেয়নি। গালভরা হাসি নিয়ে অপাপবিদ্ধ মুখটা সকালে এসে ধরেছে ছবি তুলে দেওয়ার জন্য। সঙ্গে আবার এক সাকরেদ-কেও জুটিয়ে এনেছে। মন্দিরের সামনের ঘাসজমিটায়

নামমাত্র কয়েকটা কাঁচা পাকা ঘর·আর কয়েকটা শেফার্ড হাট নিয়ে মন্দির সংলগ্ন গ্রামটা অদ্ভুত শান্ত। পাহাড়ের এইসব অঞ্চলের মানুষগুলো শহুরে মানুষের সামনে এখনও কিছুটা জড়সড়। শুধু অবাক চোখে চেয়ে দেখে আর চোখাচোখি হলে প্রত্যুত্তর দেয় লাজুক হাসিতে।

মদমহেশ্বর-এর কিমি দুয়েক ওপরে বুড়া মদমহেশ্বর। বেরিয়ে পড়ার তাড়ায় আর যাওয়া হয়নি। যাবার যে খুব ইচ্ছে ছিল তাও নয়।

মন্দির চত্বরে চাঁদা নেওয়ার জন্য দু-তিনজন ঘুরঘুর করছে। গতকাল চাঁদার খাতা বাড়িয়ে টাকা চেয়েছিল। আজও চেয়েছে। আমরা দিইনি। দাঁত মুখ খিঁচিয়ে তাদের বিরক্তি ভরা বক্তব্যের জবাব আমরা তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতেই দিয়েছি। সারা ভারতবর্ষের এরকম প্রচুর মন্দির চত্বর জুড়েই ধর্মের নামে এই ধরনের ব্যবসা চলে। পাত্তা দেওয়া অর্থহীন।

যে পথ ধরে মদমহেশ্বরে পৌঁছেছি সেই পথই উলটোদিকে সোজা চলে গেছে মদমহেশ্বর ছেড়ে, এঁকেবেঁকে গোন্ডার গ্রামের পথে। আমাদের ফেরার পথ।

'ফেরা' ব্যাপারটার মধ্যে কোথাও একটা 'দ্বৈত সত্তা' কাজ করে। একদিকে যেমন এসব জায়গা ছেড়ে যাবার সময় হলেই অভিমানী মন ঘাড় গোঁজ করে দাঁড়িয়ে থাকে আবার উলটো দিকের অর্বাচীন আমি-টাকে হ্যাঁচকা টান দেয় আমার জন্মস্থান। জানি বাবা নেই, মা নেই, তবু ফাঁকা বাড়িটা আছে। কিছু স্মৃতির শ্যাওলা আছে, আর আছে কিছু প্রিয়মুখ। পাহাড়কে ভালোবাসায় ঘাটতি নেই আবার এটাও ঠিক বছরের পর বছর পাহাড়ে পড়ে থাকতে বললেও পারব না। অবচেতনে একটা নাগরিক বীজ পোঁতা আছে তো। তার আবার ভারী পছন্দ ডিপ্রেশন, আমাশা আর পলিটিক্যাল তামাশা ভরা — কলকাতা। আজ সকাল থেকেই দুই মনের টানাটানি চলেছে। মীমাংসার চেষ্টা করে একসময় হাল ছেড়েছি। পরের ছেলে নিত্যানন্দ, যত গোল্লায় যায় তত আনন্দ, আমার কী?

গতকালই আলাপ হয়েছে তিলক পণ্ডিতের সঙ্গে। এখানকার পুরোহিতের বংশধর। ছটফটে ফরসা ছেলেটা এখনও কৈশোরে পা দেয়নি। গালভরা হাসি নিয়ে অপাপবিদ্ধ মুখটা সকালে এসে ধরেছে ছবি তুলে দেওয়ার জন্য। সঙ্গে আবার এক সাকরেদ-কেও জুটিয়ে এনেছে। মন্দিরের সামনের ঘাসজমিটায়

দাঁড় করিয়ে কয়েকটা ছবিও তুলে দিয়েছি। কলকাতায় ফিরে প্রিন্ট করে পাঠানোর প্রতিশ্রুতিও দিলাম। কিন্তু এমনই গর্দভ আমি ঠিকানাটা নিইনি। বাড়ি ফিরে মনে পড়তে কপাল চাপড়ানো ছাড়া আর অন্য অপশন ছিল না। সরি রে তিলক, এতদিনে হয়তো আশাও ছেড়ে দিয়েছিস।

মদমহেশ্বর ছেড়ে বেরোনোর রাস্তাটা চমৎকার। খান দুয়েক শেফার্ড হাটের পাশ দিয়ে পাথর বাঁধানো রাস্তাটা এঁকেবেঁকে ঢুকে গেছে জঙ্গলের সবুজে। একটু দূরে গিয়েই রাস্তাটা আবার হয়ে গেছে মাটির। মদমহেশ্বরের খোলামেলা চারপাশ বদলে গিয়ে এখন চারদিক জুড়ে অরণ্যের ঘেরাটোপ।

বেলা বেশি হয়নি। রোদের সেরকম তেজ-ও নেই। হাঁটতে মন্দ লাগছে না। কিছুদূর এগোনোর পরই দেখি ডানদিকের জঙ্গল থেকে বাঁ দিকের জঙ্গলে আড়াআড়ি রাস্তা ক্রশ করছে একটা বেশ রংচঙে মোটাসোটা সাপ। খুব সম্ভবত চন্দ্রবোড়া। দুলকি চালেই চলছিল। মানুষের সাড়া পেয়ে সড়সড় করে ঢুকে গেছে জঙ্গলে। তার আগেই প্রায় সবাই ক্যামেরার শাটার টিপেছে। সাপটা ফুট পাঁচেক, নিদেনপক্ষে ছয় ফুট হবে। স্বর্ণেন্দু পরে মোবাইলের টাওয়ার পেয়ে বউকে ফোন করে বলে বসল সাপটা নাকি তিরিশ ফুটের। গড়িয়াহাট বা হাতিবাগানের হকার-রাও জিনিসপত্রের দাম এত বাড়িয়ে বলে না। আবার ১১,৪৭৩ ফুটের মদমহেশ্বরে কারোর হ্যালুসিনেশন্, ডিলিউশন্ বা ইলিউশন হবে এটাও মেনে নেওয়া বাড়াবাড়ি।

ছায়ামাখা জঙ্গলের পথ ছেয়ে আছে নিরবচ্ছিন্ন নির্জনতায়। আড়াল আবডাল থেকে নানা পাখির ডাক, ঝিঁঝির গুঞ্জন আর গাছের ডাল থেকে মাঝেমধ্যে খসে পড়া শুকনো পাতার আর্তিতে ভরে আছে পুরো অঞ্চল। এই আওয়াজগুলোই যেন জাগিয়ে রেখেছে পুরো জায়গাটাকে। প্রায় নিভে যাওয়া ধুনুচির ধোঁয়ার মতো উঠে আসা হালকা মেঘ আবছা করে দিচ্ছে কালচে সবুজ গাছ, ঝোপঝাড় আর গাঢ় লতা। সব মিলিয়ে সমস্ত অরণ্যই যেন এক বিশাল প্রার্থনাগৃহ।

চলতে চলতে মাঝেমধ্যেই একা হয়ে গেছি। যে যার নিজের ছন্দে চলেছে। দুজন শেফার্ড ভেড়ার পাল নিয়ে হেঁটে গেছে মদমহেশ্বরের দিকে। ভেড়ার গলার ঘণ্টার আওয়াজ মুখর করেছে এ 'জনঅরণ্য'। পথে মহাবীর, সুমন, বলবীর-দের সঙ্গে দেখা। কিছুটা পথ হেঁটেছি ওদের সঙ্গে বকবক করতে করতে।

ঘরে ফেরার আনন্দে ওরা মশগুল।

জঙ্গলের পথ একসময় মিলিয়ে গেছে। মানুষজনের দেখা মিলছে মাঝে মাঝেই। এখন পথ ক্রমশ উৎরাইয়ের পথে। ডান পায়ের বুড়ো আঙুল-টা এতদিন ধরে জুতোর ঘষা খেতে খেতে বেশ ফুলে ব্যথা হয়েছিল। আজ হাঁটতে প্রচণ্ড লাগছে। জুতোটা খুলতে দেখলাম বেশ রক্ত পড়ছে। আরও কিছুটা পথ খুঁড়িয়েই হেঁটেছি। কিন্তু একটা সময় প্রত্যেক স্টেপিং মরণ যন্ত্রণা দিয়েছে। শুকতলা ভিজে চটচট করছে রক্তে। দেরি না করে জুতো খুলে পায়ে গলিয়েছি চটি। এ পথে চটিতেই দিব্যি কাজ চলে যাবে।

সূর্য প্রায় মধ্যগগনে। রোদের তাপ বেড়েছে। পাকদণ্ডী বেয়ে যথাসম্ভব দ্রুত নামতে শুরু করেছি নীচে। পথে দেখা কয়েকজন গোণ্ডার গ্রামের মহিলার সঙ্গে। পিঠে বিরাট বিরাট ঘাসের বোঝা। ওরা জানতে চেয়েছে আমি কোথা থেকে আসছি। কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর ওদের থেকেই জেনে নিয়েছি পথনির্দেশ। নামতে নামতেই কানে এসেছে গোণ্ডার নদীর গর্জন।

একটা টানা উৎরাইয়ের ঠিক আগেই ডানদিকে চেয়ে দেখা মিলেছে খরস্রোতার। ভীমবেগে পাথরে আছড়ে চলেছে গোণ্ডার নদী। দুপুরের রোদে সবুজ জলের গোণ্ডার-কে দেখতে অসাধারণ লেগেছে। স্রোতের কারণে সবুজের মাঝে সাদা স্রোতের ফেনা। আমি আর দেরি করিনি। উৎরাইটা একটানা নেমে এসে ডানদিকে বেঁকেছি। সামনেই একটা সেতু। আর তারপর কয়েকটা সর্পিল বাঁকের পরেই পাহাড়ি রাস্তাটা ছুঁয়েছে গোণ্ডার গ্রামের ঘরবাড়ি।

রাঁশি থেকে যাঁরা মদমহেশ্বর আসেন তাঁদের অনেকেই এই গ্রামে রাত্রিবাস করেন। কয়েকটা ছোটোখাটো হোটেল তৈরি হতেও দেখলাম। সলিলদা, সুমন আর বিশু আগেই পৌঁছেছে। ঘি মাখানো রুটি আর তরকারিতে জমে গেছে মধ্যাহ্নভোজ। ক্লান্তি আর ভুরিভোজের কারণেই একসময় চোখ জুড়ে নেমেছে ঘুম। তবে আলস্যকে প্রশ্রয় দেওয়া যায়নি। আবার নামতে হয়েছে পথে।

বাঁ দিকে গোণ্ডার-এর উদ্দাম মুক্তধারাকে রেখে এগিয়েছি সবাই। মঙ্গল-রা একটু আগেই বেরিয়ে গেছে। ওরা সামনে রাঁশি-র জিপস্ট্যান্ডে ওয়েট করবে।

রাস্তাটা মধ্যেমধ্যেই প্রায় রিভারবেড ছুঁয়েছে আবার আনমনে উঠে গেছে ওপরে, পাহাড়ি পথের চরিত্র বজায় রেখে।

অভিযানের শেষ পর্বে এসে গোণ্ডার নদীর সান্নিধ্য অন্তত আমার কাছে এক অনন্য প্রাপ্তি। সাধারণত অভিযানের সমাপ্তি পর্বে মন টানে বাড়ির দিকে। ফেলে আসা এক কষ্টকর পথের নানা রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার স্মৃতি মেদুরতায় আচ্ছন্ন থাকে তৃপ্ত মন। তখন আর অন্তিম আরামদায়ক পথের আশেপাশে ছড়িয়ে থাকা মণিমুক্তোগুলোর দিকে নজর পড়ে না সেভাবে। গোণ্ডার কিন্তু বারেবারে মুগ্ধতা ছড়িয়েছে তার স্পর্ধিত ছন্দ আর অনায়াস লাবণ্যে।

এই পাহাড়ি নদীগুলো যখন দেখি, তখন সৌন্দর্যের পাশাপাশি আরও একটা কথা আমার বড়ো মনে হয়। এদের তো কোনো দেশ নেই, গণ্ডি নেই। নিজের ইচ্ছেমতো বয়ে যায় এ দেশ থেকে সে দেশ। পারাংলা ট্রেক-এ পাস-টা ক্রশ করার পর, পারে চু (নদী) রূপসু ভ্যালি ঢোকার মুখ অবধি আমাদের সঙ্গী ছিল। তারপর আমরা বাঁ দিকে রূপসাভিমুখী হলাম আর পারে চু ডানদিকে মোড় নিয়ে চুমুর হয়ে চলে গেল চিনদেশে। সেখান থেকে চিনপর্ব সমাপ্ত করে আবার ঢুকে এল ভারতে। এদের পাসপোর্ট, ভিসা লাগে না, এরা কোনো 'বর্ডার' মানে না। অথচ আমরা? আজও কাঁটাতারের বেড়া-তেই আটকে রইলাম।

পথে একটা ঝুপড়িতে দু-গ্লাস রডোড্রেনড্রনের রস খেলাম। গাঢ় লালচে রসটা অদ্ভুত এলার্জি দিল। সঙ্গে বেদাতী বউদির সৌজন্যে জুটল আরও একগ্লাস হলুদ রঙের জুস। সেটা যে কীসের তা ভুলে গেছি। তবে স্বাদটা দারুণ। ঝুপড়ির বেঞ্চেই টিম মেম্বারদের রসসিক্ত আড্ডা চলেছে কিছুক্ষণ।

আবার পথে নেমেছি। এবার ঘরে ফেরার শেষ অঙ্ক। বিকেলের খেয়ালি রোদ তার উদাসী আলো ফেলেছে পাহাড়ের আনাচে কানাচে। ঝুপড়ির পিছন দিকের রাস্তাটাই এঁকেবেঁকে ছুঁয়েছে রাঁশি জিপ স্ট্যান্ড। মাটির রাস্তাটা পিচ করা হবে। তারই প্রক্রিয়া সুগম হচ্ছে। খোয়া বিছোনো রাস্তার দৃশ্যপট আর রোড রোলারের গর্জন যেন শব্দ আর দৃশ্য দূষণের বিরক্তিকর যুগলবন্দী। এতক্ষণের মন ছেয়ে থাকা নিশ্চিন্ত ভালোলাগা-টা মুহূর্তে বিস্বাদ হয়ে গেল। একগাদা ধুলোর ধোঁয়া ভরতি এবড়োখেবড়ো পথটা যেন এতদিন ধরে দেখা পাহাড়ের অনাবিল সুষমার মাঝে সভ্যতার কদর্য দাদাগিরি। মনখারাপের জানলাটা আপনা থেকেই খুলে গেছে বিরুদ্ধতার প্রবল হাওয়ার ঝাপটায়।

এইপথে ঘোড়াওয়ালাদেরই দাপট ছিল। তারাই রাঁশি থেকে মদমহেশ্বর

অবধি বয়স্ক বা অক্ষম লোকজনকে ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে নিয়ে যেত। পাকা রাস্তা হওয়ার প্রস্তাবেই তাদের রুটি রুজিতে টান পড়বে। এই আশঙ্কাতেই সরকার পক্ষের সঙ্গে লেগেছে ঝামেলা। যদিও শুনলাম বিস্তর ঝামেলার পর ঘোড়াওয়ালা-দেরই মাথা নোয়াতে হয়েছে।

এভাবেই ক্রমশ পাহাড়ি রাস্তার স্বাভাবিক চরিত্র যাবে বদলে, পাহাড় হয়ে যাবে পাথরখাদান, নদীর বুকের ওপর চেপে বসবে বাঁধ, জঙ্গলের পর জঙ্গল উচ্ছেদ করে বেজে উঠবে কারখানার সাইরেন। আমরা আরও 'প্রগতি'-র খোঁজে ছুটব। ভুলে যাব এঙ্গেলস-এর কথাটা — "প্রকৃতির ওপর মানুষের প্রভুত্ব বিজিত জাতির ওপর বিজয়ী জাতির প্রভুত্ব করার মতো নয়। প্রকৃতিকে জয় করার আসল অর্থ হল তার সঙ্গে আরও ভালোভাবে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেওয়া।"

মাঝেমধ্যে ভাবি, প্রকৃতির তো একটা নিজস্ব চলন আছে। জঙ্গল, নদী, পাহাড় সবারই নিজস্ব সংস্কৃতি আছে। কেন তাকে আমরা মর্যাদা দিতে পারব না? সেই সংস্কৃতির সঙ্গে প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ সন্তান বলে কথিত মানুষের এত আড়াআড়ি ঝগড়া কেন? প্রকৃতির সংস্কৃতি প্রকৃতি না হয় নিজেই লালন পালন করুক। আর তার সঙ্গে মিলেমিশে থাকি আমরা। কিন্তু না, সে সব ভাবনা ভুলে আর্থিক সমৃদ্ধিকেই আমরা এখন পাখির চোখ করেছি। 'সভ্যতা' কখনও চিন্তার চেয়েও দ্রুতগামী।

দূরে রাঁশি দেখা যাচ্ছে। বেশকিছু ঘরবাড়ি, বাস, জিপের সারির মধ্যে আবার নাগরিক স্বাচ্ছন্দের হাতছানি। এখান থেকেই আজ আমরা চলে যাব কুন্ড-এর পথে।

এলোমেলো ভাবনায় অন্যমনস্ক পদক্ষেপে আধঘণ্টার মধ্যেই ছুঁয়েছি রাঁশি। জিপস্ট্যান্ডে সলিলদা, সুমন দাঁড়িয়ে ছিল। বিশু পাশের চায়ের দোকানটায় বসে মঙ্গল সিং-এর বাকি পাওনাগণ্ডা মিটিয়ে দিচ্ছে। চায়ের গরম গ্লাসটা নিয়ে আমি বাইরে এসেছি। হালকা একটা ঠান্ডার আমেজ পায়চারী করছে রাঁশির বাতাসে। মহাবীর, দলবীর, রাজু-রা একজায়গায় জড় হয়েছে। আমি পায়ে পায়ে ওদের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছি।

— "ফির মিলনা দাদা," মহাবীর জড়িয়ে ধরে বলে উঠেছে।

ওর পাশে দাঁড়ানো সুমন, দলবীর, বিজেন্দ্র-রা আন্তরিকতার প্রলেপ

বুলিয়েছে আমার দুই হাতে। আমি রাজুর লালচে চুলগুলো হাত দিয়ে এলোমেলো করে দিয়েছি। খুব চেনা লাজুক হাসিটা ফেরত আসতে দেরি হয়নি।

— "ইধার আনা দাদা," জিপের পিছনদিকে একান্তে আমাকে ডেকে নিয়েছে মহাবীর।

— "মেরা হোনেবালা বিবি, সাল গিরতে হি শাদী করেঙ্গে," একখানা সাদাকালো পাসপোর্ট ছবি আমার দিকে বাড়িয়ে রেখেছে ছেলেটা।

ছবিজুড়ে দু-দিকে বেণি করা ফরসা সরল এক কিশোরী মুখ।

— "আচ্ছা হ্যায় না দাদা? যব ছোটা থা তব খেলতে থে একসাথ।" প্রত্যয়ী এক কর্মঠ যুবা আমার সামনে দাঁড়িয়ে, মুখজুড়ে শেষ বিকেলের আবীর।

— "বহৎ আচ্ছা হ্যায়, খুশ রহেনা একসাথ," মহাবীরের চওড়া দু-কাঁধে আমার আঙুলগুলো চেপে বসেছে।

মনে মনে চেয়েছি ওদের খেলাঘর পাহাড়ের কঠিন গ্র্যানাইটের মতোই চিরস্থায়ী হোক।

বিকেলের শেষ রক্তিম অস্থিরতাটুকু মুছে গিয়ে নেমে এসেছে গাঢ় সন্ধে। একটু আগেই মঙ্গলদের নিয়ে জিপ হারিয়ে গেছে পাহাড়ি বাঁকে। এখন আমরাও কুন্ড-এর পথে। হেডলাইটের সুতীব্র পথনির্দেশিকায় পাহাড়ি পিচরাস্তার বুক চিরে সগজর্নে ছুটে চলেছে যন্ত্রযান। সাফল্যের মাদকতায় মেতে ওঠা টিম মেম্বারদের এতক্ষণের উচ্ছ্বাস প্রায় স্তিমিত। আমি জানলার বাইরে চোখ ফিরিয়েছি। অন্ধকার আকাশের গ্যালারি জুড়ে এখন ঝাঁক ঝাঁক তারাদের অবারিত ইচ্ছে উড়ানের খামখেয়ালী প্রদর্শনী। ঝাপসা হয়ে আসা দিকচক্রবাল জুড়ে সারি সারি সব পাহাড়ের মূক অবয়ব মৃত্যুর মতোই নিশ্চিত। আর তারই কোলে উপত্যকার ডানা জুড়ে জোনাকির মতো ভেসে আছে পাহাড়ি ঘর বাড়ির জেগে থাকা আলো। অল্প ঠান্ডা হাওয়ার লাগামহীন ঝাপটা লাগছে চোখে মুখে। আমি চোখ বুজেছি এক নিশ্চিত অসহায়তায় ...।

... ফিরতে হচ্ছে ঘোলাটে কুয়াশার মতো আলস্যের মেদ মেখে বেড়ে ওঠা সেই 'জীবন'-এর কাছে। যে আমাকে ঘাড় ধরে বাধ্য করে প্রফেশনাল গ্যাস চেম্বারের দমবন্ধ করা পরিবেশে কলুর বলদের মতো ফিরতে। যার উদ্ধত তর্জনী মেনে আমাকে পরতে হয় গতানুগতিক 'রুটিন লাইফ'-এর অবাধ্য শৃঙ্খল। যার নিত্য চাহিদার 'শপিং মল'-এ আমি নিতান্তই দলছুট। চারদিকের ইট, কাঠ

আর কংক্রিটের ভিড়ে 'আশ্চর্য নীল' আকাশ যেখানে অনেক দূরের বন্ধু। তবু আমি তো ফিরবই, এক নির্মোহ মন নিয়ে। ততদিন এই স্মৃতিগুলো থাক, আমার একান্ত আনাচে-কানাচে, আর থাক 'তোমার' আমার নিজস্ব 'কথোপকথন'।

ঝিমধরা দুপুর, হলদে বিকেল, বাড়ি ফেরা সন্ধে কিংবা নির্জন রাতে 'তুমি' এভাবেই স্মৃতি হয়ে এসো — "হিমালয়"। 'তোমার' চোখে চোখ রাখলে এখনও যে একটু ভরসা পাই।

All the birds have flown up and gone;
A lonely cloud floats leisurely by.
We never tire of looking at each other
Only the mountain and I.

Li Po

Route Map — Panpatia Glacier Expedition
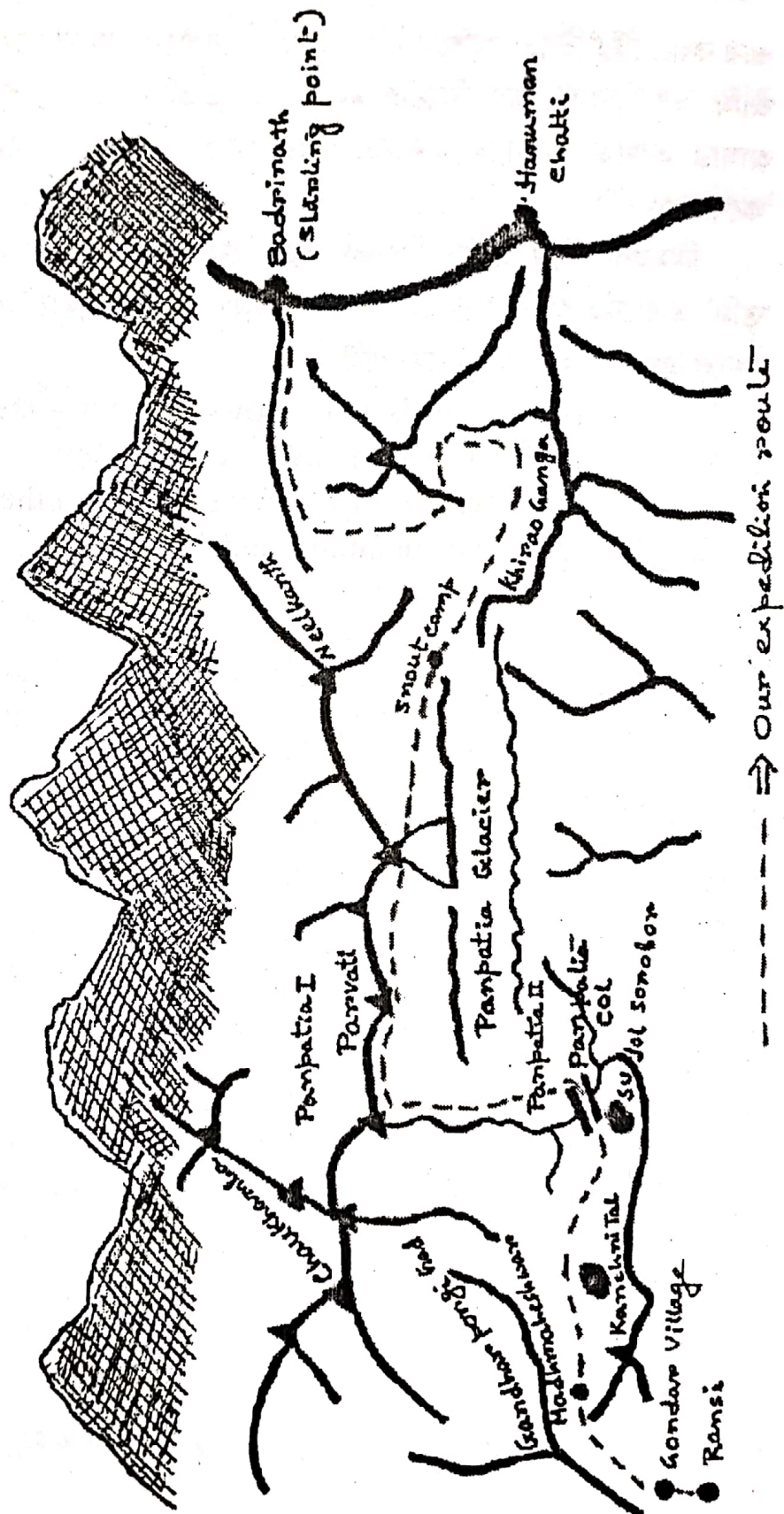
Day	Date	From	Through	To	Camp No.	Transport/ Trek
1.	8/6/12	Howrah				Train
2.	9/6/12			Haridwar/ Rishikesh		
3.	10/6/12	Rishikesh		Badrinath (3096 m)		310km/bus
4.	11/6/12	Badrinath	Rishiganga Valley	Dumkal Kharak (3725m)	C1	Trek 1
5.	12/6/12	Dumkal Kharak		Base of Holdsworth Pass	C2	Trek 2
6.	13/6/12	Base of Holdsworth Pass	Holdsworth Pass (4895 m)	Dhamling Dhars (4500 m)	C3	Trek 3
7.	14/6/12	Dhamling Dhar	Khirao Valley	2 km before Khiraoganga Snout	C4	Trek 4
8.	15/6/12	Khirao Ganga Snout	Panpatia glaciers morain	Panpatia lower icefield (4300 m)	C5	Trek 5
9.	16/6/12	Panpatia lower icefield		Panpatia upper icefield (4900 m)	C6	Trek 6
10.	17/6/12	Panpatia upper icefield		Panpatia upper icefield (5160 m)	C7	Trek 7
11.	18/6/12	Panpatia upper icefield	Cross the col	Below the col	C8	Trek 8
12.	19/6/12	Below the col	Sujol Sorobor & Nandabarari Dhass	Meadow Camp	C9	Trek 9
13.	20/6/12	Meadow Camp	Kachni Pass	Madhmaheswar (3265 m)	C 10	Trek 10

Route Chart from Badrinath to Madhmaheswar
Via : Holdsworth Pass, Panpatia Col & Kachni Pass

জীবনে অতি সফল একজন মানুষও কখনও একান্তে সমর্পণের ক্ষেত্র খোঁজেন। যেখানে নিজের 'আমি'-কে নিশ্চিন্তে খুঁজে পাওয়া যায়। যেখানে কান্না, অভিমান, যন্ত্রণা সব জমা রেখে আমরা ফিরে আসি এক নতুন মানুষ হয়ে। মনের আয়না হয়ে ওঠে আরও ঝকঝকে। লেখকের কাছে সেই সমর্পণের ক্ষেত্র — হিমালয়। বই জুড়ে হিমালয়ের এক দুর্গম অঞ্চলে অভিযানের বর্ণনার সঙ্গে জড়িয়ে আছে লেখকের আত্মকথনও।

PANPATIAR DIURNAL
A TRAVELOGUE
BY SOUMEETRA CHATTOPADHYAY
RS. 200

AVAILABLE ON WWW.DOKANDAR.IN

ISBN 9789380197791